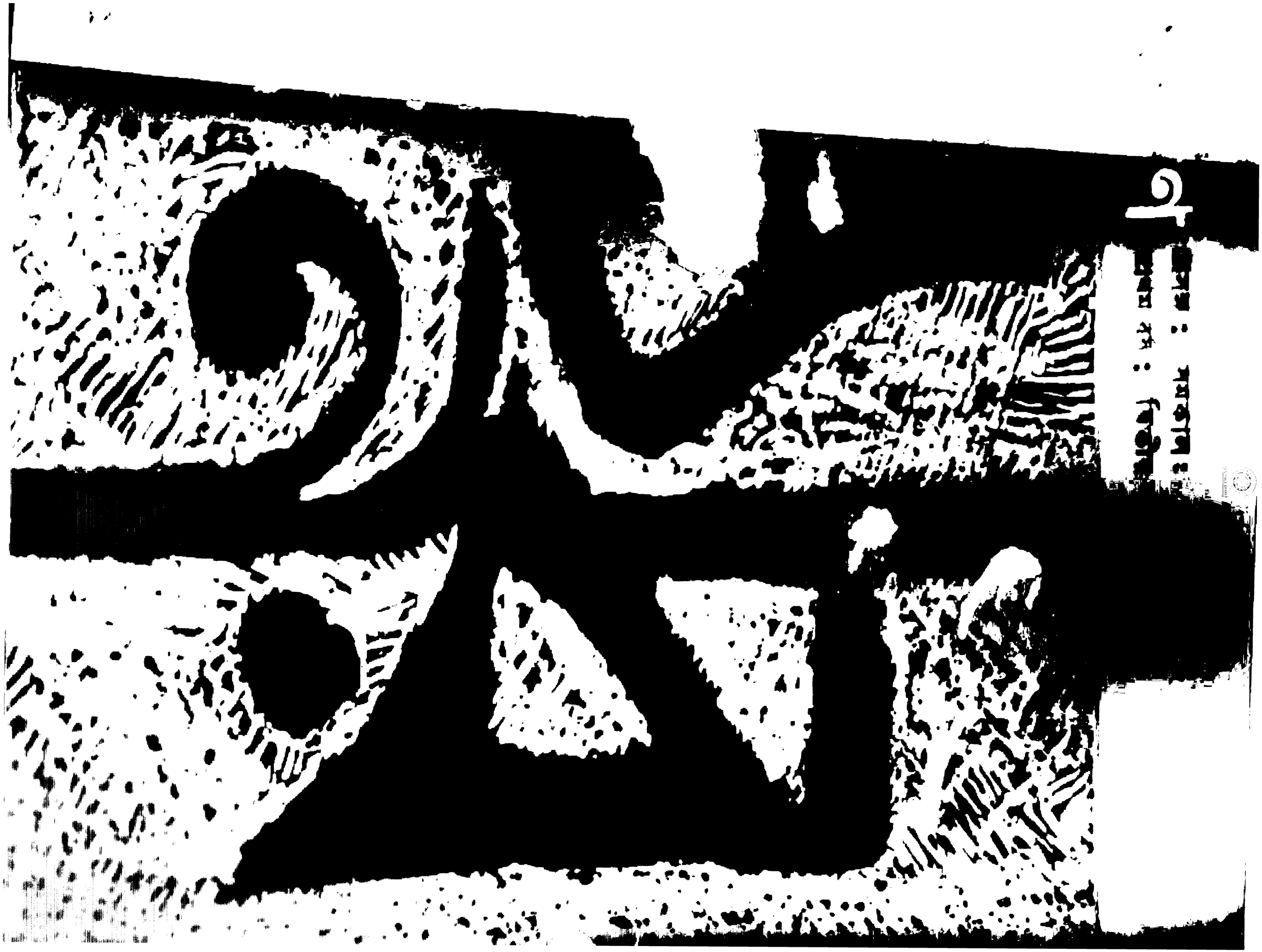

CENTRAL LIBRARY

ড° উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু—
তুষারকান্তি মহাপাত্র
২৪.১০.১৩

চারণ

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রসঙ্গ : সমকাল : সংস্কৃতির সঙ্কট

সম্পাদনায়
বাসব সরকার

চারণ
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৩ আগষ্ট, ১৯৯০ ; ৬ ভাদ্র, ১৩৯৭
প্রসঙ্গ : সমকাল : সংস্কৃতির সঙ্কট

মুদ্রক ও প্রকাশক :
বাসব সরকার
চারণ সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
৬৮/১ বাগমারী রোড
ঈশ্বর চন্দ্র নিবাস
ব্লক : বি/৫/৭
কলকাতা-৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : ১২.০০

মুদ্রণে : মধুসূদন মাইতি
মিণ্টু প্রিণ্টার্স
১১২, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : সমরেন্দ্র মৈত্র
ব্লকম্যান
৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে ... i

ডঃ সুকুমার সেন

বিচারের বানী ... ৫

ডঃ আহমদ শরীফ

কমিউনিস্ট বিশ্বে হুজুগে দ্রোহ ও মার্কসবাদ ... ৯

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ... ১৮

ডঃ প্রশান্তকুমার ঘোষ

গণতান্ত্রিকতা— পূর্বে ও পশ্চিমে ... ৩৩

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

সমাজতন্ত্রের সংকট—বিপর্যয় না অগ্নিশুদ্ধি ... ৪৪

ডঃ শোভনলাল দত্তগুপ্ত

সমাজতন্ত্রের পটপরিবর্তন ও মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ ... ৫১

ডঃ পূরবী রায়

সমকাল ও বল্টিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সংকট ... ৫৯

শিবাশিস দত্ত

সমাজতন্ত্রের সংকট, সম্ভবনা ও মানবপ্রকৃতি ... ৭৮

আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক

পূর্ব ইউরোপে বিপ্লব ১৯৮৯ ... ৮৭

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

সময়ের সন্তাপ ও অস্তিত্বের বন্ধন ক্ষয় ... ১১৪

ডঃ দীপেন্দু চক্রবর্তী

ইংরেজী সাহিত্য ও মার্কসবাদ ... ১৩৫

দেবেশ রায়

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বদল ... ১৪৫

বাসব সরকার

শাসনতন্ত্রের কালচার ... ১৫৭

চারণ সম্পাদকমণ্ডলী

বাসব সরকার

ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

নির্বাহী সম্পাদক :

শিবাশিস দত্ত

সহ-সম্পাদক

দেবল গঙ্গোপাধ্যায়

রঞ্জন পাল

প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাম বুক স্টল

পুস্তক বিপণি

সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে

সমকাল, সমাজ, আর সংস্কৃতি, ব্যক্তি মানুষের জীবনবৃত্তে এই তিনের সম্পর্ক নিবিড়। মানুষের অনুভবে অবশ্য এই সম্পর্ক-চেতনার তারতম্য থাকে। কোন দেশেই সমাজ বা কালচেতনা সুলভ নয়। আর সংস্কৃতি-চেতনা হয়তো বা আরো কম। তাই সমাজ বলতে স্বজন-পরিজন বড়ো জোর পরিচিতের পরিধি, কাল বলতে তাৎক্ষণিকতা, আর সংস্কৃতির নামে ফ্যাশন থেকে ফাংশান, মোটামুটি এই চৌহদ্দির মধ্যেই চিন্তাভাবনার, মনের আনাগোনা চলে। এর বাইরেটা অপরিচয়ের জগৎ। এটা কেবল আমাদের পোড়া দেশের ছবি নয়, দুনিয়ার সব দেশ না হলেও বহু দেশেরই এই ছবি। তবে জীবনমানে বিস্তর ফারাক আছে বলেই, এই চেতনায় আপেক্ষিক তারতম্য আছে। কিন্তু মৌলিক ভেদ খোঁজা গবেষণার ব্যাপার। বিকাশমান তৃতীয় দুনিয়ার দিকে চেয়ে হয়তো কোথাও এই হিসেবের গরমিলটা চোখে পড়বে একটু প্রকট ভাবেই। তাদের বোধহয় ব্যতিক্রম বলাই ভালো। কিউবা কিম্বা ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক কিম্বা নামিবিয়াকে অনেকেই হয়তো এই হিসাবের বাইরে রাখতে চাইবেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক যে দুনিয়ার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বেশি, তারা কতদিন সেই পার্থক্য বজায় থাকতে দেবে, সেটাও ভাবার বিষয়।

অথচ মানুষকে প্রাণী জগতের সেরা জীব, সর্ব অর্থে সামাজিক বলাটাই রেওয়াজ। সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো একসঙ্গে চলা। একসঙ্গে চলতে গেলে একটা মোটামুটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে চলতে হয়। তাই কোন সার্বিক, সাধারণ লক্ষ্যের দিকে নিরন্তর চলাটাই সমাজের বৈশিষ্ট্য। সমাজভেদে লক্ষ্যগুলি আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এই লক্ষ্যগত তারতম্য মানবিক নয়, মূলতঃ সামাজিক। যেমন মানুষ হিসাবে একজন রুশী, একজন মার্কিনী, একজন ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী কিম্বা চৈনিক অথবা ভারতীয়র মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? তাদের সামাজিক বাস্তবতাই পার্থক্যের ভিত গড়ে তোলে। এই সামাজিক বাস্তবতা নানা উপাদানের মিশ্রণ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঠাস বুনোনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সমকালে, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা রকমফেরে এই ধারণাটাই ফিরে ফিরে আসে।

বিশ শতকের শেষ দশকে সংস্কৃতি ও তার সংকট একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

তবে সংস্কৃতির সংকট সাধারণ ভাবে বলতে গেলে দু'রকমের, তার বিকাশ ও বিস্তারের সংকট ; এবং তার অস্তিত্বের সংকট। সমকালে সংস্কৃতির সংকটের প্রথম রূপটি যেমন ক্ষেত্র বিশেষে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, তার দ্বিতীয় রূপটি তুলনায় ব্যাপক ও বিরাট আকারে মানুষের বিশ্বাস ও অভ্যাসে ভাঙ্গন ধরাতে চেষ্টা করেছে। এই বিশ্বাস কথাটি বিশেষ কোন প্রবণতা, সংস্কারের তাৎপর্য বহন করে না। তাই তাকে faith about faith না বলে faith about fact হিসেবেই ভাবা দরকার আছে। বিশ্বাস সম্পর্কে বিশ্বাসের মধ্যে একটা অন্ধতা, কিছুটা মূঢ়তা কাজ করে। সেটা হলো মনের বাস্তব থেকে সরে থাকার অবস্থা, কোন কিছু আঁকড়ে থাকার অবস্থা। কিন্তু বিশ্বাস যেখানে তত্ত্ব নয়, তথ্যে বিন্যস্ত যার পরিচয় দুনিয়ার দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষের রক্তে, কর্মে, ধর্মে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছে সেখানে তো বস্তুনিষ্ঠতায় সংশয় নেই। সেই বিশ্বাসই হলো সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।

সমকালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট একটা বিশ্বজোড়া আলোড়ন তুলেছে যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রতিপক্ষ যারা তাদের খুশি ভাব লাগাম ছেঁড়া উদ্দামতায় প্রকাশ পাচ্ছে না। সমাজতন্ত্রের অধীনে বাস করুক বা না করুক, দুনিয়ার বহু দেশে যে সব মানুষ নিজেদের যন্ত্রণাজর্জর জীবনে একটা বিকল্পের আভাস পেত, তার ভগ্ন দশা দেখে উল্লসিত বোধ করবে, মানুষ সম্পর্কে এই ধারণাও অমানবিক। সোভিয়েতে গোর্বাচেভীয় নীতি সমাজতন্ত্রে 'অপচিত সত্তর বছরের' যে তত্ত্ব তুলে ধরতে চাইছে, সেই প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের সংকট সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির সংকটের রূপ নিতে চলেছে।

প্রথমেই বলা দরকার সমাজতন্ত্রের 'অপচিত সত্তর বছর' আজ যতো ধিক্কৃত হোক না কেন, বিশ শতকের সমাজ মানস দুনিয়ার সব দেশেই তারই response হিসাবে গড়ে উঠেছে। সেই সমাজতন্ত্রই যদি আলেয়া হয়ে থাকে তহলে তার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা বিরুদ্ধবাদী সংস্কৃতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। সমকালে সংস্কৃতির সংকটের এটা একটা বিশেষ দিক।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার যে সব দেশের মানুষ সমাজতন্ত্রমুখীন হতে বিগত কয়েক দশক ধরে নিরন্তর সচেষ্ট হয়েছে, তারা রুশ, চীন কিম্বা পূর্ব ইউরোপের কোন দেশকে মডেলরূপে নিয়ে থাক বা না থাক, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই দৈন্য হঠাৎই তাদের রিক্ততা, শূন্যতার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। তেল, নুন, লকড়ি, ভাত, কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই, চাকরি, বেকারত্ব দূরীকরণের লড়াইয়ের চেয়ে এর ধার ও ভার কোন অংশে কম নয়।

তৃতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যেসব মানুষ গোর্বাচেভীয় নীতি ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় পোষণ করে, তাদের পরিচিত দুনিয়া চোখের সামনে, ভেঙ্গে পড়তে থাকলেও অস্তিত্বের বিপর্যয় সামলাতে হাতের কাছে ধরার কিছু নেই। Social permissiveness সেখানে উগ্র মদের মতো জনগণের একাংশকে আচ্ছন্ন করতে পারে, ভোগবাদ সাময়িক ভাবে কিছু মানুষকে আত্মমগ্ন, স্বার্থপর, লোভী প্রাণীতে পরিণত করতে পারে, নেশার শেষে তীব্র অবসাদ আর ব্যর্থতা ও রিক্ততার ছবি তাদের হতাশ ও বেপথু করবে না, সে কথা বলা যায় না। গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকার জমানা এরই মধ্যে সোভিয়েত সমাজের যে ছবি তুলে ধরেছে অচিরে যদি তা পশ্চিম দুনিয়ার চরম অবক্ষয়ের বিশ্বজনীন ধিকৃত রূপটি ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

একটা ভেঙ্গে পড়া মূল্যবোধ আরেকটা হঠাৎ বিপর্যস্ত মূল্যবোধের আশা ভরসার স্থল হতে পারে না। একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সমাজতন্ত্র তার কদর্যতা এতকাল কেবল মনোরম পোষাকে ঢেকে রেখেছিল। তার চেপে রাখা, আড়াল করা হতদরিদ্র চেহারাটা প্রকাশ করে দিয়ে গোর্বাচেভ মানবতার কাছে বিবেকের ঋন শোধ করেছেন। নির্মম সত্যকে এড়িয়ে না গিয়ে তিনি পেরিয়ে যেতে চান বলেই এই আয়োজন। কিন্তু সেখানে তো প্রশ্ন থাকে যে পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে তার কুল, গোত্র কি? পরিবর্তন ঘটানোটাই নিয়ম, আর তার চরিত্র বিচার করে সেটা আকাঙ্খিত মনে হলে তার বিরোধিতা করা বেনিয়ম, রক্ষণশীলতা, এই জাতীয় মনোভাব গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার সমর্থক অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

সংস্কৃতির সংকট কথাটার অর্থ এই নয় যে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত রাতারাতি সব বন্ধ হয়ে যাবে। কোন দেশেই তা হয় না এবং হয় নি। জার্মানীতে ন্যাৎসীবাদ, ইউরোপে ফ্যাসিবাদ কায়েম হলে, কিম্বা পঞ্চাশের দশক থেকে মার্কিন দেশে অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতা সুরু হলে সেখানে তথাকথিত সাংস্কৃতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে যায় নি। কিন্তু যা ভেঙ্গে পড়েছিল সেটা মানুষের মনে নিজেকে ছাপিয়ে, ছাড়িয়ে যাওয়ার আগ্রহ, বিশ্বাসের, মূল্যবোধের কাঠামো। একজন কবি, সাহিত্যিক জীবনযন্ত্রণায় নিয়তবিদ্ধ হয়েও বারংবার সৃজনশীলতার তাড়নায় জীবনব্রতে আত্মস্থ হতে হতে নিজেকে প্রশ্ন করেন, কি লিখি কেন লিখি, কার জন্য লিখি? এই জিজ্ঞাসাই হলো সংস্কৃতির বনিয়াদ।

মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে যে মানুষ তার সব কাজ না হলেও

অধিকাংশ কাজের অর্থবহতা খুঁজতে চায় সেই হলো সংস্কৃতিবান। এই দিক থেকে বর্তমান দশকে যদি মানুষ সম্পর্কে ধারণা বদলে দেওয়ার ব্যাপক আয়োজন কোন দেশে সুরু হয়, তাহলেই সংকটের আভাস ফুটে ওঠে। পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের দুনিয়া সেই আশংকাকেই প্রবল করে তুলেছে। দক্ষ না হলেও, নীল নক্সা ভালো হলেও, অপটু হাত কোন কিছুর তাগিদে যখন মানুষ কিছু তৈরী করে তখন তাকে বলা যায় নির্মাণ। আর প্রাণের স্বকীয়তায়, প্রকাশের তাগিদে মানুষ যা কিছু গড়ে সেটা সৃষ্টি। কাব্য সাহিত্যে হয়তো তার আরো পরিশীলিত কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে কিন্তু সমাজ জীবনে ও তত্ত্বে নির্মাণ ও সৃষ্টিকে এই দৃষ্টিতেই দেখা হয়। তাই সেখানে গড়ার জন্য ভাঙা হলেও সেই পরিবর্তন সদর্থক। কিন্তু যেখানে ভাঙ্গনপর্ব সুরু করার তোড়জোড় চলে অথচ গড়ার লক্ষ্য অনির্দিষ্ট সেখানে পরিবর্তন নঙর্থক। সমাজতন্ত্রে সংস্কৃতির সংকট আজ সেই নঙর্থক ধারণা সম্বল করেই অগ্রসর হচ্ছে। তা না হলে পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের জন্য এত সংশয়, উদ্বেগ কেন? গোর্বাচেভ যাকে সমাজতন্ত্রের নবায়ণ বলতে চান, যাকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলছেন, দুনিয়ার মানুষ দূরে থাক সোভিয়েতেও ব্যাপক সংখ্যার মানুষ উজ্জীবিত বোধ করছে না কেন?

অথচ ইতিহাস বলে বিশ শতকের যে কোন মহৎ পরিবর্তনে সেটা রুশ, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা এমন কি পূর্ব ইউরোপে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিবর্তনেও যতো মানুষ সোচ্চারে সমর্থন জানিয়েছিল, গোর্বাচেভীয় দ্বিতীয় বিপ্লব সেই সাড়া জাগাতে পারছে না কেন? অনেকে হয়তো পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের ভাঙনপর্বে রোমানিয়া পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ডে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন উদ্বেল মুখগুলি লক্ষ্য করে বলতে চাইবেন যে, এটা যদি সমাজতন্ত্র উচ্ছেদে গণ সমর্থন না হয় তাহলে কাকে গণ সমর্থন বলা হবে? বস্তুতঃ এই মানসিকতা থেকেই সমাজতন্ত্রের দিন শেষ বলা চলেছে। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে।

আমাদের দেশে কোন নির্বাচনে এই সেদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের পরাজয়ে কতোটি নেগেটিভ ফ্যাকটর কাজ করেছে তার হিসাব দাখিল করে বলা হতো মানুষ কংগ্রেসকে নয়, তার নেতৃত্বের কিছু নীতি ও পদ্ধতি বাতিল করেছে। তাই কংগ্রেস হেরেছে ঠিকই কিন্তু যারা জিতেছে তারা ইতিবাচক গণসমর্থন পায়নি। যদি এই বিশ্লেষণে কংগ্রেসের পরাজয়কে কিছুটা সহনীয় এবং বিরোধীদের জয়কে কিছুটা খাটো করার প্রবণতা না থাকে, তাহলে পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক

পরিবর্তনে সেই ব্যাখ্যা মানা যাবে না কেন? মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বহুদিন গুমড়ে থেকে যদি ভোটের বাক্সে "নীরব বিপ্লব" ঘটাতে পারে, তাহলে যে দেশে মানুষের রাজনৈতিক মত ও চিন্তা ভাবনাগুলি এতোকাল অন্তরা বলে ও করে দিত, তাদের প্রতি প্রবল অনীহায় মানুষ যদি সমাজতন্ত্রকেই এই অনাচারের প্রতীক বলে মনে করে, আপাতত তাকে কোণঠাসা করে, তাহলে সেটাকেই বা সমাজতন্ত্রের অনেপনেয় ত্রুটি ও ব্যর্থতা মনে করা হবে কোন যুক্তিতে?

সমাজতন্ত্র ও তার সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের নামে এযাবৎ যা ছিল, ধিক্কারে, সমালোচনায়, প্রচারে ও অপপ্রচারে তার বিরুদ্ধে কম কিছু বলা বা করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন এক মহত্তর প্রাণশক্তি তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল। সেটাই হলো একটা বিকল্প ব্যবস্থার শক্তি। সেই শক্তিতে ত্রুটি দুর্বলতা যাই থাক, এমন কি অত্যাচার অনাচারের শত কাহিনীও যদি সত্য হয়, তবু নতুন মনুষ্যত্বের প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিল বলেই মানুষ তার ভুলে, ত্রুটি স্বীকার করে, অসম্পূর্ণতা জেনেও তাকে বাতিল করতে চায়নি। গোর্বাচেভীয় নীতি সমাজতন্ত্রের শক্তির এই ভিত্তিটাতেই আঘাত করেছে। কারণ একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সোভিয়েতের NEP পর্বের নীতি ও কর্মসূচীতে সত্তর বছর পরে ফিরে যাওয়ার ধ্বনি তুলে গোর্বাচেভ কার্যতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদারনীতি ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ধারণার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

কল্যাণ ব্রতী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর যাই হোক সমাজতন্ত্র নয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আর যে স্বাধীনতাই থাক দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, বেকারত্বের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার স্বাধীনতা নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জীবন মান উন্নয়নে পুঁজিবাদের সঙ্গে সাফল্যে তুলনা মূলক ব্যর্থতা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সেই ব্যর্থতার কাল ও বিশ্বপরিস্থিতিগত কারণের মধ্যে না গিয়ে শুধু ব্যর্থতাকেই সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের এক মাত্র মাপকাঠি বলে তুলে ধরে গোর্বাচেভীয় নীতি কার্যতঃ এক সাজানো প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে তাঁর নীতির সার্থকতা প্রমাণ করতে চাইছে। তার ফল হলো পুঁজিবাদকে কার্যতঃ অপরিবর্তনীয় natural order বলে মেনে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা। তাই স্তালিন প্রসঙ্গ, হুকমদারী ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা এতো সোচ্চারে বলার দরকার হচ্ছে সত্যকে আড়াল করা নয়, ত্রুটিকে এমন কি কোন অন্যায়, অপরাধকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিরপেক্ষ ভাবে বিরাট আকারে দেখানোর চেষ্টাও উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হলে দোষের কিছু হবে না।

সমকালে সংস্কৃতির সংকটের উৎস এই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের engineered crisis থেকে অদ্ভুত বলেই মনে হয়। মানুষ মনুষ্যত্বের স্ফুরণের তাগিদেই পরিবর্তন চায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের দাবিও স্বাভাবিক নিয়মে উঠে। কিন্তু যা বহুকাল আগে অতিক্রান্ত, কেঁচে গণ্ডুষ করে সেখানে ফিরে যাওয়ার সমূহ আয়োজনকে বিপ্লব বলে আর মানুষের অতৃপ্ত ব্যক্তিগত কামনা বাসনার যথেচ্ছ প্রকাশকে ছাড়পত্র দিয়ে বিপ্লব কিম্বা কোন মহৎ বিপ্লবের নবায়ণ ঘটানো যায় কিনা, ইতিহাস তার বিচার করবে।

পশ্চিম দুনিয়ার ভোগবাদী জীবনে যে সংকট তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে আর মানবিকতার সমুচ্চ মানে স্থাপন করতে পারছে না, তাকেই সাংস্কৃতিক বিকাশের পরাকাষ্ঠা মনে করে সেই জীবনধারাকে শ্রেয় ও প্রেয়বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখানোর মধ্যেই সমকালের সাংস্কৃতিক সংকটের বীজ নিহিত। সোভিয়েত দেশের গণ্ডী পেরিয়ে তা যদি মনোহারী নানা নামে, কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও স্বাধীনতা, কোথাও মুক্তির ধুয়া তুলে মানুষের চেতনাকে অসাড় করে দিতে চলেছে। সমাজতন্ত্রের দোষ ত্রুটি, অনাচার, অত্যাচার স্বীকার করে নিয়ে, সমকালের পটভূমিতে তার নিজস্ব মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে পরিবর্তনের তাগিদের দোহাই দিয়ে এই অবক্ষয়ের গতি বন্ধ করা যাবে না। সংস্কৃতির সংকটকে তাই চিহ্নিত করার তাগিদ খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে।

বিচারের বাণী

সুকুমার সেন

ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেকগুলিই আজ অবলুপ্ত ; সেগুলির স্মৃতিমাত্র আজ সার হয়ে আছে। আবার কিছু কিছু প্রাচীন সভ্যতার ছাপ বর্তমানেও দেখা যায়। সেগুলির স্বাভাবিক গতি নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন কাল থেকে অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তা মাঝে অন্তঃসলিল হয়েছিল বটে তবে তাতে কোন ছেদ অথবা অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায়নি। ভারতীয় সংস্কৃতির এটি একটি লক্ষণীয় ও গৌরবময় বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় তথা বঙ্গ সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা বিভিন্ন সময়ে নানা সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে ভারত-সংস্কৃতি ও বাংলা সংস্কৃতি মূলত পৃথক না হলেও বাঙালী আর্যাবর্তের মৌল সংস্কৃতিকে স্বীকার ও আত্মসাৎ করে তাকে নতুনতরভাবে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শিথিল ছিল বললে যথেষ্ট বলা হবে না, অনেকটা নিষিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দের দিকে ব্রহ্মাবর্তের নিষ্ঠাবান আর্যগণের পক্ষে সদানীরা অর্থাৎ গণ্ডক নদ পার হয়ে পূর্বদিকে আসা দুঃসাহসের কাজ ছিল। এই নদ পার হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত নতুবা সমাজচ্যুত হয়ে ব্রাত্য হয়ে থাকতে হত। এই সামাজিক গণ্ডির প্রধান কারণ ছিল এই অঞ্চলের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও ভাষার ঠাটে প্রাক্-বৈদিক জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য। বৈদিক অর্থাৎ ঋগ্-বেদাশ্রিত ধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে পৌঁছানর আগেই এখানে প্রাক্-বৈদিক অর্থাৎ ঋগ্বেদপূর্ব আর্যদের বুনিয়াদ পোক্ত হয়ে উঠেছিল। বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্থলে প্রাচ্য ভারতের প্রাক্-বৈদিক এবং অবৈদিক আর্যদের অসুর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অসুর অনার্য নয়, প্রাচীন আর্য, ইন্দো-ইরানীয়। তাই পৌরাণিক ঐতিহ্যে দেব ও অসুর বৈমাত্রেয় ভাই। বৈদিক আর্যরা এদেশের প্রাচীন অধিবাসী আর্যভাষীদের 'ব্রাত্য' নাম দিয়ে অপাংক্তেয় করে দেয়।

'ব্রাত' শব্দের অর্থ দল। বৈদিক পরবর্তীকালে প্রাচ্যভারতে এমন অনেকগুলি ব্রাতের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন, শাক্য, বৃজি, লিচ্ছবি, যারা অবৈদিক আর্য অথবা আর্যীভূত অনার্য ব্রাত হলেও যেগুলির ব্যক্তিবিশেষ বারবার ভারতের

ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেবের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জৈন ও বৌদ্ধমত পূর্বভারতেই উদ্ভূত হয় এবং প্রথমে প্রচার লাভ করে। চিন্তার অবাধ স্বাধীনতার জন্য প্রাচ্যভারতে প্রাচীনকালের বিশিষ্ট গণতন্ত্রীয় tribal রাষ্ট্রগুলি—যেমন, বৃজি শাক্য লিচ্ছবি ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। উচ্চারণের বিশিষ্টতার জন্য সংস্কৃত ভাষার প্রাকৃত রূপান্তর প্রথমে শুরু হয়েছিল এই পূর্ব ভারতেই। ভাষার এই স্বতন্ত্রতার ফলে বাংলাভাষা আজ ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিপক্ক, উন্নত এবং শক্তিমান এবং বাংলাসাহিত্য আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, এমন কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও অন্যতম।

ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। মধ্য-যুগে ভারতীয় তথা বঙ্গ সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ঐস্লামিক সংস্কৃতি। মুসলমান শাসকেরা প্রথমে লুঠেরা হিসেবেই এদেশে প্রবেশ করে। তাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন। পরবর্তীকালে অবশ্য তুর্কী-পাঠান-মোগলেরা বসবাস করার উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশে পদার্পণ করে। এই বসবাস করার সূত্রে ভারতবাসীদের সঙ্গে তারা মিশতে পেরেছিল বলে ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলা ভাষার উন্নতিতেও তুর্কী প্রভাব কম নয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও বাংলাভাষা যে আরবী-ফারসী ভাষার শব্দভাণ্ডার দ্বারা পুষ্ট হতে পেরেছিল তার কারণ মুসলমানদের এদেশে স্থায়ী বসবাস।

অন্যপক্ষে পর্তুগীজরা ভারতীয় সংস্কৃতির উপর যে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি তার কারণ তারা আমাদের কাছে কেবল লুঠেরা 'হার্মাদ' হিসেবেই পরিচিত হয়েছে। পর্তুগীজরা এ দেশকে আপন দেশরূপে গ্রহণ করে এখানে বসবাস করতে আসেনি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার চালিয়ে এদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন।

পক্ষান্তরে, ইংরেজদের মনোভাব ছিল বন্ধুভাবাপন্ন। পর্তুগীজদের মত তারা শুধু এদেশের ধনসম্পদ হস্তগত করতেই ব্যস্ত ছিল না, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতি সকল কিছুর প্রতিই তারা সমধিক ঔৎসুক্যের পরিচয় দিয়েছে। উইলিয়ম কেরী এদেশে আসেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এদেশে তাঁর প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় ভাষার চর্চা ও সাধ্যমত সেগুলির উন্নতির চেষ্টা। উইলকিনস্, উইলকিনসন্, জোনস, হ্যালহেড, উইলসন, কোলব্রুক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। ভারতীয় সভ্যতার লুপ্ত সূত্র উদ্ধারে ইংরেজ প্রাচ্যবিদেরা কম পরিশ্রম করেন নি। সুতরাং ইংরেজদের ক্ষেত্রে 'বণিকের

মানদণ্ড' ভারতবর্ষে 'রাজদণ্ড' রূপেই শুধু দেখা দেয় নি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ইংরেজদের শ্রদ্ধাবোধ ইংরেজ ও ভারতবাসীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে সাহায্য করেছিল। সেই সূত্রে ভারতীয় তথা বঙ্গ সংস্কৃতির উপর ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখা দেয়। তার ফলেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। বাঙালীর নবজাগরণ তাঁদের দ্বারাই ঘটে।

ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর বাঙালীর অন্তরের অন্তঃপুরে আত্মশক্তি সঞ্চয়ের যে আয়োজন চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাতে যথার্থ সমিধ্ জোগান দিলেও তা পুরোপুরি সফল হতে পারে নি। তার প্রধান কারণ পোলিটিক্যাল আন্দোলনের উচ্ছ্বাস। পায়ে জোর পাওয়ার আগেই যেন শিশুকে দৌড়ের পাল্লায় নামতে হয়েছিল। পোলিটিক্যাল আন্দোলন একের পর এক পদক্ষেপে জাতীয় চরিত্রের সংগঠন দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ঘটনা আজও চলেছে।

স্বদেশী আন্দোলন বাঙালীকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত ও একতাবদ্ধ করে তুলতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ একত্রিত হওয়ার পর এক নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম, সমাজ ও অশিক্ষার জালজঞ্জালগুলিকে মহীয়ান করে দেখে আঁকড়ে ধরার পুনশ্চেষ্টা এক কথায় বিগত শতাধিক বর্ষকালের অগ্রগতি থেকে পশ্চাদপসরণ। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে চাইলেও ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বরং তিনিই বিনা কারণে সমালোচিত হতে থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং নূতন কিছু করার বাসনা বাংলার নবীন সাহিত্যিকদের প্রধান প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজীনবীশ কবিরা বাঙালী পাঠকের কাছে নূতন ইংরেজী কবি এবং নূতন ইংরেজ কবিদের গুরুস্থানীয় ফরাসী ও জার্মান কবিদের রচনার পরিচয় দেওয়া এবং নূতন নূতন বিদেশী গ্রন্থের সংবাদ টাটকা টাটকা জানানোকে কর্তব্য বিবেচনা করেন। গল্প-উপন্যাসের বিষয়ে 'বাস্তবতা' 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর রচনায় প্রথম দেখা দিয়েছিল। তবে ভারতীর আসর ভেঙে যাওয়ার আগেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং পরবর্তী কালে অন্যান্য কথাসাহিত্যিক নূতনতর বাস্তবতার পথ খুলে দেন। এই সময়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মার্কসপন্থার নীতি কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন ভারতবাসীকে খাঁটি দেশপ্রেমে দীক্ষিত করলেও

জাতিগঠনে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। একথা সত্য অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনশক্তির সংহতরূপের ক্ষণিকস্থায়ী হলেও একটি অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মনে অ-বিনয়ের, বিধি-উল্লঙ্ঘনের মনোবীজ উপ্ত হল আর দেশের অন্তঃস্থলে যে গঠনক্রিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে চলছিল তাতে ব্যাঘাত ঘটল। স্বাধীনোত্তরকালে দেশে শিক্ষার 'প্রগতি' অর্থাৎ সংখ্যার প্রসার ঘটলেও দেশের লোকের চিত্তের প্রকৃত শিক্ষা, তার কর্মিষ্ঠতা আরও হ্রাস পেতে থাকে। যতদিন যেতে লাগল দেশে পোলিটিক্যাল অবস্থার অনিশ্চয়তা ততই বাড়তে থাকে। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার প্রতি তরুণেরা দলে দলে আকৃষ্ট হতে থাকেন।

এই রাজনৈতিক উত্তাপ ও উত্তেজনা এবং বিদেশী রাজনৈতিক মতবাদ ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের সংস্কৃতিকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করছে তা এই উত্তেজনার কাল উত্তীর্ণ না হলে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে 'সবুজপত্রে'র বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৪০, রচনাকাল ২ ফাল্গুন ১৩২৪) যা লিখেছিলেন বর্তমান শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতা বিচারেও তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

> "আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই 'আমার জন্ম-ভূমি'তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেকজনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভাবতে বলে আমাদের রাগ হয় —এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা, তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, ডস্‌টয়েভস্কি, বার্ণার্ড শ, কোট কর তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর।"

এই মনোভাব নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক নয়। তবে আমি রবীন্দ্রনাথের মতই আশা-বাদী এবং সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই স্বস্তিবোধ করি—'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে।'

---

* অনুলিখন তুষারকান্তি মহাপাত্র

কমিউনিস্ট বিশ্বের হুজুগে দ্রোহ ও মার্কসবাদ

—আহমদ শরীফ

কোন বিষয়ের বা ঘটনার অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে কোন স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ়মত, মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে বিষয়ের ক্রমানুসরণ, ঘটনার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। কিন্তু আমরা তেমন কোন তথ্যসূত্র রাশিয়ার বা ওয়ারশচুক্তিভুক্ত পূর্বইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করতে পারিনি। কাজেই আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তথ্যের অসম্পূর্ণতাজাত তত্ত্বের ও অনুমানের ভেজালে ত্রুটিমুক্ত না হওয়ারই কথা। সবকথা জানা-বোঝা না থাকলেও নিজের ও সমাজের প্রয়োজনে একটা মত গড়ে তুলতে ও পোষণ করতে হয় এবং কখনো কখনো গরজে পড়ে মন্তব্য পরিব্যক্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়।

কমিউনিস্ট জগতের ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত মন-মনন এবং জীবনযাত্রার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা দুঃসাধ্য ছিল বাইরের লোকের পক্ষে। য়ুরোপ-আমেরিকা হয়ে যেসব খবর আসত, তাতে কতটুকু তথ্য আর কতটুকুইবা চমক তা নিরূপণ করা ছিল সাধারণের সাধ্যাতীত। যাঁরা বামপন্থী তাঁরা ওই সব খবরে কান দিতেন না, যাঁরা পুঁজিবাদী-মৌলবাদী তাঁরা সানন্দে উপভোগ করতেন সে-সব সংবাদ। এ করেই দিন, মাস, বছর কাটছিল বিগত সত্তর বছর ধরে। আকস্মিক-ভাবে কালান্তক খবর পাওয়া গেল ১৯৮৮ সনে যখন ওয়ার্সচুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক তথা লালক ও পোষক রাশিয়া ন্যাটোজোটের পালক-পোষক যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্বার্থে দুই শিবিরের রাষ্ট্রগুলোর স্থিতি-স্বস্তি প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বিবেচনা না করেই অস্ত্রহ্রাসের ও বর্জনের নীতির অঙ্গীকারে চুক্তিবদ্ধ হল। এর পরিণাম পরে আলোচিত হবে।

তার আগের কথাগুলো আগে বলি। আমরা জানি ১৯১৭ সনে পরাজিত পর্যুদস্ত রাশিয়ায় সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিষ্ঠা নির্বিবাদ ও নির্বিঘ্ন ছিল না। নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শোনা যায় অন্তত দুলক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এর মধ্যে জার-সাম্রাজ্যভুক্ত পুরোনো তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোত্রীয় দেশগুলো রাখার প্রয়াসে প্রায় ১৯২৩ সন অবধি মধ্য এশিয়ায় সন্ধি-

বিগ্রহ চলতে থাকে। ১৯২৪ সনে নায়ক লেনিনের মৃত্যুতে কঠিন ও দৃঢ়চিত্তের, ধীরবুদ্ধির ও স্থির সঙ্কল্পের স্ট্যালিন পেলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকার। তাঁকে সর্বসম্পদ পণ করে সর্বপ্রকার ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে খাদ্যসঙ্কট কবলিত হয়েও এক রক্তক্ষয়-প্রাণহরা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল উপায়ন্তর ছিল না বলেই। যুদ্ধান্তে ভাগ বাঁটোয়ারায় পেয়ে গেলেন বা নিয়ে নিলেন কয়েকটি দেশ এবং দেশের খণ্ডাংশ। দুনিয়া জুড়ে গড়ে উঠল এক কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য, যার দায়িত্বে ও অভিভাবকত্বে রইল রাশিয়া। এদের অর্থে-সম্পদে পালন ও রক্ষার জন্যে অস্ত্র-সজ্জিত সেনা পোষণ, বাণিজ্য-বাজারের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি নানা দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়েছে রাশিয়াকে এবং নৈতিকপ্রেরণায় বা বাণিজ্যিক স্বার্থে পৃথিবীর নানা আঞ্চলিক যুদ্ধেও যোগাতে হয়েছে—অর্থ, অস্ত্র, শক্তি ও সাহস। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই শুরু হল বিত্তবান জিগীষু যুক্ত-রাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়ের অভিযান। অর্থে-সম্পদে হীন হয়েও রাশিয়া দাঁড়াল আকাশজয়ে গ্রহবিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী হয়ে। এসব আপাত দৃষ্টিতে গরীবের ঘোড়া রোগ বলে প্রতীয়মান হলেও বিরূপ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় নির্বান্ধব রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্যে আবশ্যিক ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নানা ক্ষয়ক্ষতির—সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়েও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মামলায় জড়িয়ে পড়তেই হয় আত্মমর্যাদা বা সম্পদরক্ষার প্রয়োজনে, রাশিয়ার অবস্থাটাও ছিল তেমনি। একে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে নিন্দা করার আগে তার অবস্থা ও অবস্থানটাও বিবেচনা করা আবশ্যিক।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে যেমন আমরা ঘরের কথা বাইরে বলি না, বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করি, পরিবারের সম্মান রাখা ও নিন্দা এড়ানোর জন্যে, তেমনি রাশিয়াও তার ঘরের কথা কাউকে জানতে দেয়নি। কিন্তু আমরা তো দেখছি, বিগত সত্তর বছরের মধ্যে সামান্য সামান্য খণ্ড সমগ্র পরিসরের শান্তি-স্বস্তিব্যতীত প্রায় সবসময়েই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে অর্থ-সম্পদ-জনশক্তি ব্যয়ে যুদ্ধ করতে অস্ত্রযোগাতে, খাদ্যের চাহিদা মেটাতে মঙ্গোলিয়া, কিউবা থেকে পূর্বয়ুরোপীয় দেশগুলোকে সর্বপ্রকারে পালন-পোষণ করতে নিরুপায় মস্কো সরকারকে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর থাকতেই হয়েছে। এভাবে গত সত্তর বছর ধরে বঞ্চিত রাখতে ও থাকতে হয়েছে রাশিয়ার অধিবাসীদের। এ সত্তর বছর ধরে কৃচ্ছ্রতা তাদের বুকে-ঘাড়ে-মাথায় জগদ্দলের মতো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোনদেশেই সাধারণ মানুষের চেতনায় রাষ্ট্রের স্বার্থের গুরুত্ব ঠাঁই পায় না, সরকার

দায়ে পড়েই যে জনগণকে তাদের প্রাপ্য নিম্নতম সুখ-স্বস্তি-আরাম-আনন্দ থেকে আর্থিক ও মানসিকভাবে বঞ্চিত রেখেছে তা তারা অনুভব উপলব্ধি করেনি। তারা তাদের ভয়-ত্রাসের হুকুম-হুমকির কারাবদ্ধ বিড়ম্বিত জীবনের বোবাকান্নায় প্রজন্মক্রমে গুম্‌রে মরেছে।

মানুষ যন্ত্র নয়, একঘেয়ে জীবনে সে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট হয়, ধৈর্য হারায়। সে মাঝে মধ্যে অবসর চায়, চায় আর্থিক সঙ্গতি এবং মানসিক ছুটির বা মুক্তির আনন্দ। তার এই material and mental relaxation-এর আবশ্যিকতা ক্রুশ্চেভ-বুঝেছিলেন। তিনি কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অভাবে অন্যরা তা অনুধাবণ করতে পারেনি। তাই ভেতরে তা' অনুসৃত হয়নি। আর বাইরের কমিউনিস্ট সমাজে তা 'সংশোধনবাদ' বলে নিন্দিত হয়েছে।

কয়েক বছর আগে (১৯৮৬-৮৭) যান্ত্রিক জীবনে Relaxation-Relief-এর আর্থিক ও মানসিক ব্যবস্থা করেছিলেন চীনের নায়ক 'ডেঙ-শিয়াও পিঙ'। তিনি মহৎ উদ্দেশ্যে শুরু করলেও প্রয়োগে করেছিলেন মারাত্মক ভুল। তিনি মিত্রের ছদ্মবেশী চিরশত্রু যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি, প্রযুক্তি প্রকৌশলী ও পরামর্শ নির্ভর হলেন, ওরা ঘরে প্রবেশ করেই ইঁদুরের মতো ঘরের বেড়া কাটা নয় খুঁটি ভাঙা শুরু করে ছিল। এখানে তা প্রাসঙ্গিক নয় বলে আলোচ্যও নয়। তবে ছাত্রদ্রোহ মার্কিন ষড়যন্ত্রের ও প্ররোচনারই যে ফল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমাদের।

গর্বাচেব আদল পেয়েছিলেন চীনথেকেই।

নায়কতন্ত্রে ক্ষমতায়স্থিত থাকার এবং প্রশাসনে সাফল্যের ভিত্তিই হচ্ছে বিশ্বস্ত ও অনুগতজন খুঁজে বের করার ও দলভুক্ত করার যোগ্যতা। সেজন্যে নায়করা এবং 'ক্যু' করে ক্ষমতায় আসা সেনানীশাসকরা অনুরাগী-অনুগত আস্থাভাজনদের দোষত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখে এবং তাদের সভয় প্রশ্রয় দিয়ে হাতে রাখে আর নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে। এ অবস্থায় শাসন-প্রশাসনের স্তম্ভরূপ আমলারা দুর্নীতিদুষ্ট হয়। রাশিয়ায় এবং অন্যত্র তা-ই হয়েছিল পালন-পোষণ-শাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

পরিণাম দেখে মনে হচ্ছে, গর্বাচেবের উচিত ছিল ধীরে সন্তর্পণে বন্দিত্বের বাঁধনখোলা-বাঁধন শিথিল করে করেই মুক্তির আশ্বাস দেয়া। যেমন ঘোষণা করতে পারতেন, এখন থেকে ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা-অভাব-নির্যাতনের কথা লেখার বা চিঠির আকারে পত্রিকার মাধ্যমে বা অফিসে নিবেদন করা যাবে। এখন থেকে পারিশ্রমিক বাড়ানোর চেষ্টা করবে সরকার বিভিন্ন উপায়ে। এসব না করে আকস্মিক বিস্ময় ও উল্লাস জাগানো লক্ষ্যে উচ্চকণ্ঠে অকস্মাৎ ঘোষণা

করলেন 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা ; আশা করেছিলেন অকারণে হঠাৎ কারামুক্ত কয়েদীদের মতো আনন্দে-উল্লাসে অভিভূত কৃতজ্ঞ দেশবাসীর সরকারের প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যাশিত ফল মিলল না, রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডেও, সেখানেও একনায়কত্বের অবসানের, গণতন্ত্রের এবং জীবনে আশু স্বাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি উঠল, পেরেস্ত্রৈকার আশুফল পাওয়ার জন্যে জনগণ অস্থির-অধৈর্য হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞতা বোঝা গেল না, কিন্তু ঔদ্ধত্য বাড়ল।

অন্যসব রিপাবলিকে কথা বলার অধিকার পেয়েই ফেরুপালের মতোই চিৎকার করে একটি দাবিই উচ্চারণ করল, তা হল 'স্বাধীনতা চাই।' বোঝা গেল এদের কমিউনিজমে তথা সমাজবাদে কখনো দীক্ষা দেয়া হয়নি, উপনিবেশ-শাসকদের মতোই কেবল অস্ত্রবলে ভয়-ত্রাসের শাসন চালিয়েছে। সমাজবাদের সাম্যতত্ত্বের প্রভাবে প্রচারে দেশ জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-গোত্র চেতনা বিলোপ করে নির্বিশেষ মানুষ ও মনুষ্যসমাজবোধ-নির্দেনপক্ষে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধও জাগানো যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের মতো। জানা গেল, দীক্ষা দেয়া-নেয়া হয়নি। ১৯৮৮ সনের পরে এ ফাঁকির ফাঁক প্রকট হল, বাস্তব কারণ হয়ে তা এক রাষ্ট্রিক মানবিক ট্র্যাজেডী ঘটাচ্ছে। আর ভাগে বিজয়ে পাওয়া ও হুমকি যোগে সমাজতন্ত্র চালু করা রাষ্ট্রগুলোর হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ সনে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ১৯৬৮ সনে দ্রোহ দেখা দিয়েছিল যা অস্ত্রবলে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। পোল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র প্রয়াস চালাচ্ছিল অর্থসাহায্যের নামে বহু বছর ধরে। সে-ভাঙার প্রয়াস সফল হল পোলাণ্ডেই। তারই প্রভাবে ভাঙার ও দ্রোহের প্ররোচনা পেল পূর্বজার্মানী থেকে পূর্বয়ুরোপের সব রাষ্ট্রগুলো। সে-হুজুগেরই তরঙ্গাভিঘাত লেগেছে মঙ্গোলিয়ায়, আলবানিয়ায়, কিউবায়।

একে হুজুগ বলছি এ জন্যে যে এরা কেবল পরিবর্তন চেয়েছে অস্থির-অধৈর্য হয়ে, সে পরিবর্তন কি ও কেমন, তার লক্ষ্য ও পরিণতি কি, তা কোন্ কল্যাণ বয়ে আনবে, সে জিজ্ঞাসা এ মুহূর্তে তাদের মনে নেই, তারা এখন কেবল দ্রোহে, ভাঙার গানে, ভাঙতে পারাতেই তুষ্ট এবং তৃপ্ত। এখন দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ যান্ত্রিক আবর্তনে ছেদ সৃষ্টির সাফল্যে আনন্দিত ও গর্বিত এবং নির্লক্ষ্য। দূর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার চেলা ন্যাটোজোট বলছে—ভাঙ ভাঙ, কোন ভয় নেই, অর্থ-সম্পদ যাই লাগে আমরা দেব। আমরা তো রয়েছি মানবমুক্তির দিশারী ও সহায় হয়েই। আমরা চিরকাল মুমুক্ষুর পক্ষেই। পুঁজিবাদী দেশগুলো কমিউনিজম, কমিউনিস্ট ও সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোকে জেনেছে 'জানি-দুশমন' রূপে। এরাই

রাশিয়াকে বলেছে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'। মুখ্য আপত্তি কি? সেখানে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা নেই, অধিকার নেই স্বাধীন চিন্তার ও নতুন চিন্তা প্রকাশের। যেন দুনিয়ার অন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এসব মানুষের অবাধ অধিকারভুক্ত। শাস্ত্রের সমাজের, রাষ্ট্রের, প্রচলিত বিশ্বাস সংস্কারের, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে কেউ কোন যুক্তিসঙ্গত কথা উচ্চারণ করলে দুনিয়ার সর্বত্র অতীতে ও বর্তমানে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে শাস্ত্রী, সমাজ সর্দার, সরকার এবং জনগণ এগিয়ে আসেই। ওই নতুন চিন্তা-চেতনা-সত্য বা তথ্য প্রকাশককে লাঞ্ছনায়, দৈহিক নির্যাতনে, নির্বাসনে কিংবা হত্যায় চরম শাস্তি দেয়া হয়েছে ও হয় এবং ভবিষ্যতেও বহু বহু কাল দেয়া হবে। কাজেই কমিউনিস্ট দেশের অপবাদ দেয়া স্থূলবুদ্ধিলোকের জন্যে মতলববাজদের অপপ্রচারমাত্র।

গোটা পৃথিবীর সাক্ষর-নিরক্ষর বিদ্বান-মূর্খ নারী-পুরুষের যা জানা বোঝা ও মানা বাঞ্ছিত ছিল, উচিত ছিল তা' তারা সব সময়ে এড়িয়ে যায়, না জানার, না বোঝার ভান করে। মার্কসবাদই দুনিয়াতে এই প্রথম মানব-মহিমা বুঝে মানব-মুক্তির পথ জানিয়েছে। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে বলবান কিছু মানুষ বাহুবলে ক্ষীণ এবং বুদ্ধিতে হীন মানুষকে দাস ও ভূমিদাসরূপে সর্ব অর্থেই গৃহপোষ্য প্রাণী করে রেখেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। কত নবী-অবতার-সন্ত-শ্রমণ কত কত মহৎবাণী শুনিয়েছে যুগে যুগে দেশে দেশে। কিন্তু নরাকৃতির এ দীন-দুর্বল প্রাণীগুলো কখনো মনুষ্য মর্যাদায় মালিক-প্রভু সমাজে ঠাঁই পায়নি। মার্কসবাদীরাই মানবিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে মানুষ নির্বিশেষের সত্তার সাম্য, মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে। এবং দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা এবং আঁধা-কানা-খোঁড়া-বোবা প্রথম আর নারী-পুরুষ অবিশেষে মানুষ মাত্রেই স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করে, কারো কৃপা-করুণায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে নয়, জন্মগত দাবিতেই মানুষ হিসেবে মৌল মানবিক অধিকারের স্বীকৃতিতে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার অঙ্গীকার ও আশ্বাস পেল মার্কসবাদে। নীতি-নিয়ম কিছু কড়া হলেও এই প্রথম দেহে মনে দাসত্বমুক্ত কিন্তু সম-স্বার্থেই যৌথ জীবনে সামাজিক-প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রিক নিয়মানুগত্যে বাধ্য বা নিষ্ঠ নাগরিক পেলাম বা দেখলাম আমরা কমিউনিস্ট শাসিতরাষ্ট্রে।

এমন জন্মমুহূর্ত থেকে প্রতিটি মানুষের স্বাধিকারের স্বীকৃতিরূপে তার সারা-জীবনের অশন-বসন-নিবাস নিদান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের নিশ্চিত ব্যবস্থা আর কবে কারা কোথায় রেখেছিল-বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্যসমাজে? এ পরম ও চরম মানব-স্বীকৃতি কার্ল মার্ক্সের পূর্বে এমন বাস্তব ও প্রায়োগিক ভাবে কে কবে কোথায় ভেবে ছিল?

আমাদের অঞ্চলে কথায় বলে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।' কমিউনিস্ট বিশ্বের হুজুগে জনগণেরও হয়েছে সে-খেয়াল, সে-অবস্থা। না হলে সে-সব রাষ্ট্রের শিক্ষিত সচেতন বিদ্বান-বুদ্ধিমান-মননশীল যুক্তিপ্রবণ লোকেরা কি দেখে না, জানে না, বোঝে না, যে অতীতের কথা বাদ দিলেও আজো তৃতীয়বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে, অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ভোগে, আজো দুই তৃতীয়াংশ লোক নিম্নতম মানবিক স্তরে বা মানবেতর স্তরে অমানবিক জীবন যাপন করে? তারা কি জানে না, শিশু থেকে প্রৌঢ় অবধি দরিদ্র মানুষেরা পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে এবং অনাহারে ও অর্ধাহারে চিকিৎসার অভাবে অকালে অসময়ে অপমৃত্যুর শিকার হয়। আজো দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের অন্তত তেয়াত্তর থানা রাষ্ট্রের সাংবাৎসরিক সমস্যা-আজো ঝড়-খরা-বন্যায় মানুষ কীট-পতঙ্গের মতো, হাঁস-মুরগী-গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো অসহায়-ভাবে করুণ অপমৃত্যু কবলিত হয়। কোন্ বুদ্ধিতে যুক্তিতে, কোন্ শ্রেয়োবোধে, কোন্ সর্বনাশ ঠেকানোর, এড়ানোর জন্যে তারা আজ 'কমিউনিজম' নামটা পর্যন্ত শুনতে নারাজ? পুঁজিবাদী সচ্ছল ও কৃষি শিল্প সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলোতে ওয়েলফেয়ার বা কল্যাণরাষ্ট্র হল কমিউনিজম ঠেকানোর জন্যেই। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে ঋণ-দান-ত্রাণ সামগ্রী নিয়েও কি কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা খাদ্যের বিনিময়ে কাজ দেবার এবং বেকার সমস্যা ঠেকানো সম্ভব হবে কখনো? দরিদ্র দেশে গণতন্ত্র কি মানুষের অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে কিংবা পারবে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি স্বীকার করে? এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী সমাজে অসম্ভব-অসাধ্য জেনে মেনেই তো সমাজবাদ কাম্য হয়েছিল। রক্তঝরা-প্রাণহরা সংগ্রামে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চীনে-রাশিয়ায়।

পূর্বয়ুরোপের ও রাশিয়ার রিপাবলিকগুলোর হুজুগতাড়িত দ্রোহে মাতাল হলেও ইতোমধ্যেই তাদের কর্তা ব্যক্তিদের টনক নড়েছে, নড়ছে। পোল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসাহায্যের জন্য মিনতি জানিয়ে এসেছে। পূর্বজার্মানী বিশলক্ষ বেকারের ভয়ে শঙ্কিত-চিন্তিত। পূর্ব য়ুরোপের সব দেশই এখন মার্কিন-অর্থ সাহায্যের আশ্বাসে প্রতীক্ষারত। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. প্রভৃতি কোন অর্থপ্রতিষ্ঠানই ওদের প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ কখনো যোগাতে পারবে না। ন্যাটোজোটেরও তেমন অর্থ-সম্পদ নেই,—তারাও বাঁচার তাগিদেই পুঁজি-পণ্য-বাজার-বাণিজ্য সাম্যপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সমবায়ী হচ্ছে। এমন কি একক মুদ্রায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রস্তাবও উঠেছে।

রুমানিয়ায় নগ্ন-ন্যাটো-মার্কিন ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার এবং গুণ্ডা-মুৎসদ্দি নিয়োগে বিচারের নামে চসেস্কু-দম্পতি হত্যাও আমরা দেখলাম। আসলে স্বয়ং গর্বাচেবই মার্কিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, মার্কিন-পাতা ফাঁদে নির্বোধের মতো জড়িয়ে পড়েছিলেন। ধূর্ত রেগনের মতলব না বুঝে সরল মনে তিনি ওয়ার্স চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবকত্ব তাদের না জানিয়েই ছাড়লেন। তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বও ত্যাগ করলেন, অস্ত্র বর্জনের, সীমিতকরণের চুক্তিবদ্ধ হয়ে। সবকিছু তিনি করলেন ব্যয় হ্রাস করে স্বদেশের ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অস্থির অসহিষ্ণু জনগণকে আর্থিক সাচ্ছল্য দিয়ে তুষ্ট ও তৃপ্ত করার লক্ষ্যে। গর্বাচেবের এ আকস্মিক নীতিবদলের ফলে রাশিয়ার প্রতি ওয়ার্সভুক্ত পূর্বইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আস্থা ও ভরসা উবে গেল জাগল তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ, ন্যাটোজোট যুক্তরাষ্ট্র তাদের এ ক্রোধ-ঘৃণা উসকিয়ে দিল,-বল-ভরসা-শক্তি-সাহস যুগিয়ে। দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ বছরে অনভ্যস্ত জনগণ দ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে রাস্তায় নামল অকুতোভয়ে। তাদের সম্মুখে কিন্তু কোন নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন বা নক্শা ছিল না। কেবল এ ব্যবস্থা চাইনে, এ ব্যবস্থা মানব না—এই ছিল স্লোগান—'গণতন্ত্র' মানে তাদের কাছে শাসন শৈথিল্য ও ভয়মুক্তি। মুক্তি অনুভব-উপলব্ধি সাপেক্ষ। মুক্তি মুদ্রা বা অন্ন যোগায় না। তাঁরা কি পুরোনো রীতি-নীতি-নিয়মে ধনতন্ত্রী হবে, না নতুনতর কোন নীতি-নিয়ম পদ্ধতি চালু করবে! তা এখনো তাদের চিন্তা-চেতনার বিষয় নয়। এ মুহূর্তে তারা নির্লক্ষ্য। আমাদের ধারণায় মার্কসবাদের চেয়ে নতুনতর, উৎকৃষ্টতর, উন্নততর কোন তথ্য, তত্ত্ব ও পন্থা আজো আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়নি। যেদিন হবে, সেদিন 'মার্কসবাদ' গুরুত্ব হারাবে, বাজার হারায় যেমন পুরোনো যন্ত্র উন্নততর যন্ত্রের কাছে।

তাই আমাদের মনে হয় এ উত্তেজনা প্রশমনে ধীরবুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাস বশে কমিউনিস্ট জগৎ আবার মত ও মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিদলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা সাপেক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও জেদংবাদ কিংবা ঈষৎ পরিবর্তিত বিধি-ব্যবস্থা অঙ্গীকার করে সমাজবাদ কায়েম করবে রাষ্ট্রে। ইতোমধ্যে ভাঙা-গড়ার, অনুধাবনে-অনুশোচনায় লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিচার-বিবেচনায় চার/পাঁচ / ছয় বছর লাগবে। এ অনুমান মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা কম। কেন না মার্কসীয় পদ্ধতি এখনো উৎকর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় নির্বান্ধব রাশিয়া টিকে থাকার দায়েই মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী হয়েছিল। ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি-ক্ষমতা-মর্যাদা পেয়ে বিশ্ব নেতৃত্বে

আসন সুদূর রাখার লোভে বা গরজে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্বপণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী হয়েই থাকতে হল। ফলে পুরো সত্তর বছর ধরে দেশের জনগণকে সর্বপ্রকারে অর্থ-সম্পদে ও সাধ-আহ্লাদে বঞ্চিত রাখতে হয়েছে। এ পরাশক্তি হওয়ার খেশারত অবশেষে দিতেই হল, রাশিয়া কিছু কালের মধ্যে কেবল মূল ভূখণ্ডে সীমিত থাকবে। গর্বাচেবের পুরো পাঁচ বছর টিকে থাকার সম্ভাবনা শ-তে চল্লিশের বেশি নয়। রাশিয়া ভাঙল, খুশি হল, জিতে গেল, নিশ্চিন্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভাঙার চালটা চেলেছিলেন রেগন।

আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ কমিউনিস্ট তত্ত্বে ও তথ্যে আগ্রহী নন। তারা মার্কসবাদ কিংবা লেনিনবাদ কিংবা মাও জেদঙ পরিব্যক্ত তত্ত্ব-তথ্য উপলব্ধির চেষ্টা করেন নি, যদিও এদের বাণী মোল্লা-পুরোতের মতোই সর্বক্ষণ উদ্ধৃত করেন কথায় ও লেখায়। মার্কসীয় তত্ত্বের এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্যের নির্যাস হল—রাষ্ট্রান্তর্গত জীবিত মানুষমাত্রেরই পালন পোষণের অবিকল্প দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের বা সরকারের। এ দায়িত্ব আক্ষরিকভাবে পালনের ব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সরকারের মুখ্য অপরিহার্য ও আবশ্যিক লক্ষ্য বা আদর্শ। এ চেতনা মনের মধ্যে থাকলে কেউ গুরুবাদী হয় না। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে দেখলাম ১৯০৮ সনে গর্বাচেবের ভাব-চিন্তা-কর্ম দেখে কেউ হচ্ছিলেন স্ট্যালিনপন্থী—তাঁর তসবির নিয়ে সভা-সেমিনার মিছিলের আয়োজন করেছিলেন, আর একদল গর্বাচেবের তাবিজে হচ্ছিলেন মুখর। কিন্তু এরাই আবার গর্বাচেবের মত-পথ-তাল-বাহানার দিশা না পেয়ে হতাশায় বোবা হয়ে রইলেন। পূর্বইউরোপের হাল দেখে এখন সবাই আপাতবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত।

এর মধ্যেই মার্কসবাদে প্রত্যয়ী কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে বলেছেন, 'মার্কসবাদে ভুল নেই'। গণমুক্তির একমাত্র পথ মার্কসবাদের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন। মার্কসবাদ ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হয়েছে অযোগ্য ও অদক্ষ শাসক-প্রশাসকরা। এ ধারণা আমাদেরও।

আমরা জানি ও মানি যে মানুষের মনন-চিন্তন মানুষের দেহের সম্মুখগতির মতোই এগিয়ে চলে নতুন নতুন অনুভব-উপলব্ধির এবং আবিষ্কার উদ্ভাবনের দিকে। সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশ পেয়েছে এভাবেই। কোথাও কোথাও স্থানিক ও সাময়িকভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা-মন-মনন বন্ধ্যা থাকে, অবক্ষয়গ্রস্তও হয়, কিন্তু সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে মানুষের প্রগতিশীলতা-অগ্রগামিতা কখনো থেমে থাকে না। তখন বন্ধ্যারাও, অবক্ষয়গ্রস্তরাও, অতীতাশ্রয়ী প্রতি-

ক্রিয়াশীলেরাও অবশেষে মানব-অবদান গ্রহণে ঋদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়, অতীত ছেড়ে ভবিষ্যতে ভরসা রাখে, বরণ করে দেশ-কালের প্রয়োজনে বর্তমানের শ্রেয়োকে। এই আমাদের দৃঢ় ধারণা-র মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রশ্ন প্রতিটি মানুষকে ভাতে-কাপড়ে বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে নিজের মতো করে ভোগ উপভোগের অধিকার দেয়ার যে দায়িত্ব মানববাদী মানুষ একবার অঙ্গীকার ও বাস্তবায়িত করেছে, তার থেকে মানুষ আর পিছু হঠতে পারবে না। কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ, কোন না কোন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী সমাজ বজায় রাখবে, আরো অনেক দরিদ্র-অনুন্নত দেশে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গড়ে উঠবে মানবাধিকার ও মানবমর্যাদার স্বীকৃতিধন্য বহু বহু রাষ্ট্র ভবিষ্যতে। কেন না, মানবিক সমস্যার সমাধানের এ মুহূর্ত অবধি এ-ই একমাত্র উপায়। বিজ্ঞানে ও প্রকৃতিতে গুণে, মানে, মাপে, মাত্রায় মানুষের অভাবিত-অসামান্য অধিকার বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে যে-সব সঙ্কট দেখা দেবে বলে কমিউনিস্ট চিন্তক-মনীষীরা প্রায় নিঃসন্দেহ অনুমান করেছিলেন, সে-সব ঘটেনি বটে, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং যন্ত্রের ও প্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষ তা ঘটাবেই। সে আলামত যে দুর্লক্ষ্য তা-ও নয়, স্যাটোজোটে তার উন্মেষ আভাসিত হয়েইছে: অতএব সমাজবাদ-সাম্যবাদ-জিন্দাবাদ।

———

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইউরোপীয় যুগ থেকে বিশ্বরাজনীতির যুগ ঃ

১৯১৭ সালে যেদিন আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশীদার হ'ল সেদিন থেকেই ইতিহাস একটা মোড় নিল। সেদিন থেকেই 'ইউরোপীয় যুগে'র অবসান হল; বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল বিশশতক। অন্য আর এক দিক থেকেও এই মোড় নেওয়া-টা লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ কমিউনিস্টরা ঐ দেশে "বিপ্লব" সম্পন্ন করে। বলা যায়, সেদিন থেকেই পৃথিবী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দুই শিবির বিভক্ত ছিল দুই বিরোধী মতাদর্শের ভিত্তি-তে। আমেরিকায় তখন প্রেসিডেন্ট উড্‌রো উইলসনের শাসন। পাশ্চাত্যে তখন বলশেভিজম্-বিরোধী জেহাদ ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। গোড়ায় প্রেসিডেন্ট হয়তো নীতি-নির্ধারণ করে উঠতে পারেন নি। দু-বছর যেতে না যেতেই তিনি-ও ঐ জেহাদে যোগ দিলেন। হয়তো প্রেসিডেন্ট উইলসন ও লেনিন—দু-জনই জানতেন যে, তাঁরা দুনিয়ার মানুষের সমর্থন যোগাড়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। হয়তো সেজন্যই, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চেহারা সম্পর্কে লেনিনীয় পরিকল্পনাকে রুখবার তাগিদে, ১৯১৮-র জানুয়ারী মাসে উইলসন তাঁর অতি পরিচিত 'চৌদ্দ দফা কর্মসূচী' (14 points) ঘোষণা করেন। কথাগুলি স্মরণযোগ্য এই কারণে যে, তখন থেকেই এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের সূত্রপাত —জিও-পলিটিকাল (geo-political) কারণে তো বটেই, তৎসহ মতাদর্শগত ও দার্শনিক কারণে। ফরাসী দেশের এক সমাজতন্ত্রী অ্যালবার্ট টমাস ঐ সময় বলেছিলেন—"হয় উইলসন নয় লেনিন; হয় গণতন্ত্র নয়তো বলশেভিকবাদ; এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে"। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক,—সম্পন্ন দেশের মানুষেরা দীর্ঘকাল "গণতন্ত্র" ও "কমিউনিজম"কে দুই মেরুতে বসিয়ে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিতে "বলশেভিজম" অর্থ-ই হোল গণতন্ত্রহীনতা ও স্বৈরাচার। অপরপক্ষে, বলশেভিকরা পাশ্চাত্যের 'গণতন্ত্র'কে বরাবরই বলেছে—"টাকার থলির গণতন্ত্র"—"ধনীদের গণতন্ত্র"—"বুর্জোয়া গণতন্ত্র।"

আধুনিক ইউরোপে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভবের একটা ইতিহাস আছে। ১৬৪৮-এ ইংলণ্ডের তদানীন্তন বুর্জোয়ারা অভিজাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হ'য়ে

রাজতন্ত্র ও সামন্ত-অভিজাতদের এবং গীর্জার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৭৮৯-এ ফরাসীদেশে বুর্জোয়ারা প্রজাসাধারণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হ'য়ে সংগ্রাম করেছিল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দু'টি বিপ্লবেই বুর্জোয়ারাই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। কার্ল মার্কস স্বয়ং বলেছেন ১৬৪৮ এর বিপ্লব এবং ১৭৮৯ এর বিপ্লবকে যথাক্রমে শুধু ইংরাজদের কিংবা ফরাসীদের বিপ্লব হিসাবে দেখলে ভুল হবে। তাঁর মতে, এগুলি ছিল 'ইউরোপীয় ছকে' বিপ্লব। এই সব বিপ্লবের মাধ্যমে কোন বিশেষ 'নির্দিষ্ট শ্রেণী'র জয় সূচিত হয়নি। এই বিপ্লবগুলি ছিল "আধুনিক", ইউরোপীয় সমাজেরই রাষ্ট্রীয় রূপ। এই সব বিপ্লবে বুর্জোয়ারা বিজয়ী হয়েছিল সত্য, কিন্তু বুর্জোয়াদের এই বিজয় এক 'নতুন', 'আধুনিক' সমাজ-ব্যবস্থার বিজয়ই ছিল। এই সব বিজয়ের ফলে ঐতিহ্যানুসারী, প্রথাবদ্ধ, শাস্ত্রবদ্ধ, মন্ত্রবদ্ধ সামন্ত সমাজের রূপান্তর ঘটে। প্রাচীনের বেড়া ভেঙ্গে অর্থনীতিতে, রাজ-নীতিতে, সমাজ সংগঠনে, দর্শনে, ভাবলোকে, মননে—ইউরোপ আধুনিকতার পথে পা বাড়ায়। এই ক্রম-অগ্রসরমান আধুনিক ব্যবস্থায় সামন্তসম্পত্তির স্থলাভিষিক্ত হয় পুঁজিবাদী সম্পত্তি ; গিল্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে প্রতিযোগিতা ও খোলা-বাজার। আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ক্রমশ দানা বাঁধে জাতি সত্তার ধারণা ও জাতীয়তাবোধ। কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ও মন্ত্রমুগ্ধতার বিরুদ্ধে ক্রমশ জয়লাভ ক'রে জ্ঞান ও বিচার। আধুনিক গতিশীল শিল্প-সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। আধুনিক ইউরোপের যন্ত্রবহুল ও যুক্তিপ্রধান সভ্যতা ও সাধনার মর্মবস্তু হয়ে ওঠে স্বাদেশিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও এক নৈর্ব্যক্তিক-মানবতার আদর্শ। অর্থ-নৈতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ঐতিহ্যানুসারী ইউরোপের সামন্তসমাজের 'গণতান্ত্রিক' রূপান্তরের ইতিহাস,-আজ অনেকেরই জানা। ইউরোপে যে পুঁজিবাদ বা ধনিকতন্ত্র ক্রমশ গড়ে উঠেছিল, সেখানে 'গণতন্ত্র' ছাড়াও ক্যালভিনের বিশিষ্ট ধর্মমত ও তৎ-সম্পর্কিত ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান,—পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের পথ সুগম করেছিল।

নিষ্ঠার সঙ্গে পার্থিব কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া এবং নিরলস প্রয়াসের দ্বারা এই বসুন্ধরাকে বাসযোগ্য করে তোলা, প্রভৃতি মূল্যবোধ,—ইউরোপীয় মানসিকতায় সঞ্চারিত হয়েছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ই ফলে। মোট কথা, সামন্তসমাজ থেকে 'আধুনিক ইউরোপে'র জীবনধারার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনের পিছনে ছিল নানা কারণ—অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় ও

বৈজ্ঞানিক। সবার উপর, সমাজের সচেতন অন্তঃকরণ। শাস্ত্রবদ্ধ, আচারবদ্ধ, মন্ত্রবদ্ধ, বিরলাঙ্গিক কৃষিপ্রধান সমাজের 'পুঁজিবাদী (ধনতান্ত্রিক) রূপান্তর' কিভাবে সম্ভব হ'ল, যন্ত্রসহায়ে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ক'রে পুঞ্জীভূত ধনকে ক্রম-বিস্তৃত ক'রে, কি ভাবে ইউরোপ পুঁজিবাদে উপনীত হল, অর্থনীতিবিদেরা তা আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। যে দু'টি কথা প্রাসঙ্গিক তা হ'ল—চারশ বছর ধরে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ইউরোপে "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্ররূপ হিসাবে, আর অর্থনীতি সংগঠিত হয়েছে 'পুঁজিবাদী' ('ধনতান্ত্রিক') ধাঁচে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ঃ

ক্যাপিটালিস্ট (বুর্জোয়া) গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? বৈশিষ্ট্য গুলি অকস্মাৎ, একদিনে গড়ে ওঠেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ছকটা তৈরি হয়েছে।

প্রথমতঃ, একটি দেশ তখনই "গণতন্ত্র" যখন তার এমন একটি সরকার (গভর্ণমেণ্ট) থাকে, যে সরকার অল্পাধিক সর্বজনীন ভোট দিয়ে গঠিত। দেশটিকে তখনই গণতন্ত্র বলা যাবে যদি তার প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাপুঞ্জ তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম থাকে, এবং যদি কিছুদিন পর পর সে সরকারকে অপসারণ করে এক স্বতন্ত্র সরকার বেছে নিতে পারে।

ইউরোপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখেছিল (বিশেষত উনিশ ও বিশ শতকে) যে এ'সব বৈশিষ্ট্য থাকলেই পুরোপুরি গণতন্ত্র হোল তা নয়। তবু-ও আধুনিক পুঁজিবাদী দেশের গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদানই হোল—"প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।" গণতন্ত্র আছে কিনা তা বিচারের অন্যতম কষ্টিপাথর হোল, এক ধরণের সরকারের বিরুদ্ধে অপর আর এক ধরণের সরকার গঠনের পক্ষে, সময়-সময়, অবাধভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক জনসাধারণ ভোট দিতে পারে কি,-না।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিনের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে গণতন্ত্র নিয়ে তার ফলে মানুষ বুঝেছে গণতন্ত্রকে ক্রমশ সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে হয়, গণতন্ত্রের-ও যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন, বিশেষত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। সমকালীন গণতন্ত্রকে কার্যকরী করতে হলে ভোটাধিকার ছাড়াও আরও নানা শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। যেমন চাই বাক্-স্বাধীনতা। একদিক থেকে বাক্-স্বাধীনতা কার্যকর গণতন্ত্রের পক্ষে হয়তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ঠিক অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ হোল

সংঘ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং দল গঠনের স্বাধীনতা। ইউরোপের গণতন্ত্রীরা ক্রমশ বুঝতে শিখেছেন যে, এই স্বাধীনতা বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের। স্বাধীনতা থাকলে তবেই, যারা বেতনভোগী তারা তাদের নিয়োগকর্তা কিংবা মালিকদের সঙ্গে দর কষাকষি করার জন্য, কাজের সময় ও শর্তাবলীর উন্নতি এবং ঐ সব উদ্দেশ্য সাধন কল্পে, শেষ অস্ত্র হিসাবে, ধর্মঘট করবার জন্য, সংগঠিত হতে পারে। এই স্বাধীনতাও সমকালীন বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অংশ। ট্রেড ইউনিয়ন ও সংঘ গঠনের অধিকারের সঙ্গেই থাকবে ঐসব সংঘের কর্মকর্তাদের নির্বাচনের-ও অধিকার। পুরনো লেসে-ফেয়ার (রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত, অবাধ) ক্যাপিটালিস্ট গণতন্ত্রের চরিত্র যে অধুনা পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে, কল্যাণ-রাষ্ট্রের ধারণা যে ক্রমশ দানা বেঁধেছে মানুষের মনে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলেই যে তা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়তঃ, তারপরে-ও রয়েছে এ সবের থেকেও মামুলি সব স্বাধীনতা। যেমন গণতান্ত্রিক সমাজে চাই—নিরপেক্ষ, স্বাধীন আদালত, আইনের শাসন, জুরির বিচার, হেবিয়াস কার্পাস, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ইত্যাদি। আইনের শাসন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এক বিশেষ জটিল ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারা।

কিন্তু সমকালীন গণতন্ত্রের এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য নীতি। এটা বলার প্রয়োজন নেই, যে, সব দেশে, —ফলিত গণতন্ত্রে,—এই সব আদর্শ ও নীতিই যে সর্বদা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়, তা নয়। কিন্তু এই আদর্শগুলি সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়েছে এবং সংগ্রাম করেই এদের রক্ষা ক'রে, পূর্ণতা-দান করতে হয়।

বুর্জোয়া-গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বলশেভিক কমিউনিজমের বক্তব্য

ইউরোপের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সামনে একদা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল বলশেভিক মতবাদ। বলশেভিক সাম্যবাদীরা বলতেন—

ক) একথা সত্য যে, মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক বন্ধসমাজের তুলনায় বুর্জোয়া-গণতন্ত্র এক বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতি ; তবু এ'গণতন্ত্র সর্বদাই সংকুচিত, মিথ্যা ও কপটতাপূর্ণ। "ধনতন্ত্রের অধীনে গণতন্ত্র" বক্তৃতামাতার মতোই অলীক। এই গণতন্ত্র ধনীদের জন্য স্বর্গ, কিন্তু গরীবের জন্য মস্ত ধোঁকাবাজি।

খ) বলশেভিক কমিউনিষ্টদের আরও বক্তব্য ছিল, গণতন্ত্র আলোচনাটা বিচ্ছিন্ন ভাবে করা যায় না ; আলোচনা-টা করতে হবে রাষ্ট্রতত্ত্ব (theory of

the state) এবং শ্রেণী-তত্ত্বের (class analysis) পটভূমিকায়। এই বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র হোল অমীমাংসা শ্রেণী-বৈরিতার ফল এবং এই বৈরিতার-ই বহিঃ-প্রকাশ। যখন, যেখানে, এবং যে পরিমাণে, এই বৈরিতা মিটিয়ে ফেলা অসম্ভব, সেখানেই রাষ্ট্রে-র প্রয়োজন দেখা দেয়,—রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। আর গণতন্ত্র তো রাষ্ট্রের-ই একটা রূপ ; অনেকগুলি রূপের অন্যতম। বলশেভিকদের মতে, যতদিন বিভিন্ন "শ্রেণী" বিদ্যমান থাকবে ততদিন খাঁটি-গণতন্ত্রের কথা বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, গণতন্ত্রকে বিচার করতে হবে "শ্রেণী-গণতন্ত্র" হিসাবে। বুঝতে হবে যে, গণতন্ত্র-ও এক "শ্রেণী" কর্তৃক অন্য "শ্রেণীর" এবং জনতার একাংশ কর্তৃক অন্য অংশের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর নিপীড়ন ও হিংসাত্মক কাজ চালাবার সংগঠন-ই। নানা দেশে বুর্জোয়া গণ-তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মূল প্রকৃতি একই রকমের। চূড়ান্ত বিচারে সব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ই অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্ব বা বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ-ই।

গ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানগুলি নাগরিকদের জন্য বেশ অনেক ধরনের স্বাধীনতার এবং অধিকারের কথা বলে। যেমন,—সর্বজনীন ভোটাধিকার। বহুদলভিত্তিক নির্বাচন, বক্তৃতাদানের, ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি। আসলে, এ সব-ই ফাঁকা বুলি। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, আনুষ্ঠানিক দিক থেকেও বুর্জোয়া-গণতন্ত্র খুবই সীমিত। বুর্জোয়া গণতন্ত্র "সম্পত্তির অধিকার" লোপ করেনি, "শোষণ" ও "অসাম্য"কে মেনে নেয়। ফলে, সমকালীন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সমাজে পুঁজির (Capital) শক্তি-ই সব কিছু ; স্টক এক্স্‌চেঞ্জ (stock Exchange) ই সব কিছু। পার্লামেন্ট-ই হোক্, নির্বাচনই হোক্—সবই—এদের হাতের খেলনা।

ঘ) বুর্জোয়ারা নির্বাচনের বড়াই করে। এ'সব ভোটরঙ্গের আসল তাৎপর্য-টা কি ? সেটা হোল, এই যে, কয়েকবছর পরপর ঠিক করা শাসকশ্রেণীর কোন্ গোষ্ঠী, কোন্ লোক,—পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে জনগণকে "দমন-পীড়ন" করবার অধিকার পাবে।

শুধু যে ইংলণ্ডের মতো পার্লামেন্টারি রাজতন্ত্রের-ই (monarchy) এই চেহারা, তা নয়। সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে-ও এটাই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার সারাৎসার। বলশেভিক পার্টির সর্বাধিনায়ক লেনিন তাই বলেছিলেন—

"বুর্জোয়া স্বাধীনতা প্রভৃতি এক ধরণের বিলাস। এটা শুধু যারা সুখে আছে

তাদেরই নাগালে থাকে। এটা এক প্রকারের জালিয়াতি—যার সাহায্যে পরাধীনতাকে স্বাধীনতা বলে চালানো হয়। অতি নগণ্য সংখ্যালঘুর জন্য, ধনীর জন্য—গণতন্ত্র,-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এটাই সারবস্তু।"

বলশেভিক কমিউনিষ্ট গণতন্ত্র তথা মেহনতী জনগণের গণতন্ত্র :

মেহনতী জনগণের গণতন্ত্র যার অপর নাম "dictatorsbip of the proletariat" (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব) আগে ছিল বই-এর পাতায় (প্যারী কমিউনকে মার্কস সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এই অভিধায় ভূষিত করেছিলেন)। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে তা বাস্তব রূপ নিল ১৯১৭ সাল থেকে। প্রথমে রুশ দেশে-তারপর পূর্ব-ইউরোপের নানা দেশে, পূর্ব জার্মানীতে এবং অন্যত্র বুর্জোয়া-গণতন্ত্রবিরোধী কমিউনিষ্ট পার্টির নায়কতাধীন শ্রমিকশ্রেণীর 'ডিক্টেটরশিপ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে বলা হোত 'মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র'। বলা হোত যে, রাশিয়া, চীন, পোল্যাণ্ড, হাংগেরী, বুলগেরিয়া, পূর্ব্ব জার্মানী ইত্যাদি—বস্তুত সব কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-ই এক একটি চমৎকার "গণতন্ত্র"; কমিউনিষ্টদের ভাষায়—"লোকায়ত্ত গণতন্ত্র" (people's democracy) অথবা "মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র" (proletarian democracy)।

বলশেভিক কমিউনিস্টদের যুক্তিগুলি ছিল এই ধরণের :

(ক) এ' সব দেশে "পুঁজিবাদ" উচ্ছেদ করা হয়েছে। খাজনাভোগী জমিদার, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, এ সব দেশে নেই। খনি, জমি, যন্ত্রপাতি, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি সবই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এ সব দেশে মুনাফার (profit) জন্য উৎপাদন হয় না, সমষ্টির স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন ক্রিয়া চলে। অতএব-এ সব দেশে 'শোষণ' নেই, 'নিপীড়ণ' নেই; অতএব এ সব দেশের সমাজই প্রকৃত "গণতান্ত্রিক" সমাজ।

(খ) এ' সব দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি-ই জনগণের রাজনৈতিক নেতা,-বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে। এ এমন এক "অভিনব" (party of a new type) পার্টি, যা জনগণের স্বার্থকে সর্বদা প্রকাশ করে ও রক্ষা করে, এবং এমন একটি সমাজ-গঠন করার কাজে এই পার্টি উৎসর্গীকৃত প্রাণ, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ সবার স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে, এ সব দেশে 'বহু দল' আছে কিনা, 'নির্ব্বাচন' আছে কিনা, 'স্বাধীন' শ্রমিক সংগঠন আছে কিনা,-তাদের "ধর্মঘট করবার অধিকার" আছে কিনা—এ সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ, ইতিহাসের

ধারায় ইউরোপে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে লক্ষণগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে সেগুলি "মেহনতী জনগণের গণতন্ত্রে" থাকতে পারে না এবং এসব বুর্জোয়া উপাদান না-থাকাটাই বলশেভিক কমিউনিস্টদের গৌরবেরই বিষয়। তাঁরা বুক ফুলিয়ে বলতেন "আমরা তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রী নই, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রী।"

মন্তব্য :

স্বীকার করা ভাল যে, কমিউনিস্টরা 'গণতন্ত্র' বলতে যা বুঝতেন তা "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" থেকে এতই ভিন্ন যে দু'পক্ষের ডায়ালগ অসম্ভবই ছিল। কমিউনিষ্টদের কথা ছিল—ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উচ্ছেদের নাম-ই "গণতন্ত্র"। এবং সত্যিই তো, এমন কোন বিশ্ববিধান বা আইন তো নেই, যে আইন বলে দেবে, কোন্ পক্ষের সংজ্ঞাটা ঠিক, কোন পক্ষের-টা ভুল। তাছাড়া, ইচ্ছামতো শব্দের ব্যাখ্যা করবার অধিকার তো সকলেরই আছে। তবু মনে হয়, বলশেভিকরা শব্দবিভ্রাট থেকে বিচার-বিভ্রাটে পড়েছেন। তাঁরা যদি বলতেন— "আমরা উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তি মালিকানা তুলে দিয়েছি—আমাদের রাষ্ট্র উৎপাদন করে সমষ্টির কল্যাণের কথা মনে রেখে, আমাদের সমাজ শোষণ-হীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ"—তবে এ সব বক্তব্য বোঝা যায়। যখন তাঁরা বলেন "আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক," তখনই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কেননা, প্রায় চারশ বছর ধরে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের মানুষ "গণতন্ত্র" বলে যা বুঝতে শিখেছেন, এবং যে সব সাধারণ লক্ষণ গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, বলশেভিক কমিউনিস্টদের গণতন্ত্রে তার একটি-ও নেই।

তার অর্থ কি এই যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে, 'নির্বাচন" ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তবে এ নির্বাচন ছিল নতুন কায়দার নির্বাচন। এ' নির্বাচনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের নির্বাচনে কোন-ও নির্বাচনকেন্দ্রে, একাধিক প্রার্থী থাকে না। অথচ "নির্বাচন" শব্দটির সঠিক অর্থ হোল "পছন্দ করা"। কিন্তু যে নির্বাচনে ভোটদাতারা দুই বা ততোধিক প্রার্থী-র পরিবর্তে মাত্র একজন সরকারী প্রার্থীকে ভোটদানের সম্মুখীন, তাঁদের আর "পছন্দ" বলে কিছু নেই। ভোটদাতারা যাই করুন না কেন, ঐ অদ্বিতীয় প্রার্থীটি নিশ্চিত নির্বাচিত হবেন, বিপুল ভোট পেয়ে কিংবা কম ভোট পেয়ে। ফলে কেউ যদি কমিউনিষ্ট দেশের নির্বাচনকে এক ঘোড়ায় ঘোড়-দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করেন, তবে তাকে নিন্দুক বলা যাবে না। আগেই বলা হয়েছে—বলশেভিক কমিউনিষ্টরা

বরাবরই বলেছেন, গণতন্ত্র একটি শ্রেণীগত ধারণা। তাঁরা গণতন্ত্রকে শ্রেণীর উর্ধ্বে, "অখণ্ড", এবং বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের পক্ষে "সমানভাবে প্রযোজ্য" বলে মনে করেন না। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সাধারণভাবে যেমন "স্বাধীনতা" বলে কিছু নেই, তেমনি "শ্রেণী"-র উর্ধ্বে অবস্থিত "গণতন্ত্র" বলেও কিছু নেই। প্রশ্নটা হল—কাদের গণতন্ত্র, কাদের জন্য গণতন্ত্র এবং কাদের বিরুদ্ধে এই মেহনতী জনগণের গণতন্ত্র! তাই বলশেভিকদের চিন্তাভাবনায় একাধিপত্যে (dictatorship) ও গণতন্ত্রে,—কোন বিরোধ নেই। বলশেভিক কমিউনিষ্ট "গণতন্ত্র"— মেহনতী মানুষের "সর্বোত্তম" গণতন্ত্র; বুর্জোয়াদের দিক থেকে যদিও এটা স্বৈরাচারই বটে (dictatorship)।

১৯৭৬ সালেও অধ্যাপক বোরিস দাৎস্যুক গর্বভরে লেখেন: "সমাজতন্ত্র,- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো শুধু "জনগণের সরকারে"র কথা ঘোষণা করেই শ্রমজীবী জনগণের জন্য গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলে না। বরঞ্চ সমাজতন্ত্র সর্বোপরি, এই গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের আমলেই উৎপাদনের উপায়সমূহ সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং সামাজিক গ্রুপের অস্তিত্ব নেই। সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে সমাজের সমগ্র সদস্যদের বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত মান উন্নয়নের গ্যারান্টি দেয় এবং লক্ষ লক্ষ জনগণকে তাদের বিষয় পরিচালনার কাজে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হচ্ছে **সমগ্র জনগণের জন্য গণতন্ত্র**; এটা **সম্পূর্ণ** এবং **সর্বজনীন গণতন্ত্র**।

বলশেভিক সাম্যবাদের অবক্ষয়, পশ্চাদপসরণ ও তরাডুবি :

আন্তর্জাতিক বলশেভিক কমিউনিজমের ভাঙনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালে, যেদিন "স্তালিনী" সাম্যবাদের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার সংঘাত শুরু হয়। তারপর থেকে নানা ঋজু-কুটিল পথে সাম্যবাদ কখনো এগিয়েছে, কখনো পিছিয়ে পড়েছে। গত ১৪ মাসে বলশেভিক দুনিয়ার চেহারাটাই গেছে পাল্টে। গোর্বাচেভী ঝড়ো হাওয়ায় সমাজতন্ত্রের দেশে দেশে "পালা বদলের পালা" আরম্ভ হয়েছে। পুরণো তন্ত্র, পুরণো মন্ত্র, পুরণো বিশ্বাস সবই ইতিহাসের আঁস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সাম্যবাদী—সমাজতান্ত্রিক,—সব দেশেই দাবি উঠেছে, "মুক্ত, বহুত্ববাদী সমাজ চাই", "বহুদলীয় সাংবিধানিক গণতন্ত্র" চাই; চাই "আইনের শাসন", চাই অর্থ-

নীতির ক্ষেত্রে পার্টি-একচেটিয়াবাদের অবসান ও নতুন চিন্তা, চাই "ফৌজী সাম্যবাদে"র অবলুপ্তি, চাই "গণতান্ত্রিক, মানবিক সমাজতন্ত্র", ইত্যাদি। আজ আর "বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন" নেই। বহু সাম্যবাদী দেশে বলশেভিক কমিউনিষ্ট পার্টি উঠে গেছে—নাম নিয়েছে—"গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী" দল; বহু দেশে সনাতনী কমিউনিষ্ট পার্টি ভোটে হেরেছে। খোদ সোভিয়েট ইউনিয়নে বহু দলের আবির্ভাব হতে চলেছে। এ'সব লক্ষণ দেখে যুগোশ্লাভিয়ার মিলোভান জিলাস্ বলেছেন, এ যুগে যা টিঁকে থাকবে তা হ'ল আন্তর্জাতিক সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তৃতীয় আন্তর্জাতিক আজ আর নেই, কমিনফর্ম-ও নেই; বলশেভিক সাম্যবাদ ক্রমশ বিলয়ের পথে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র আজও আছে, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক-ও আছে।

সমাজতন্ত্র মানে কি শুধুই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ?

অনেকের ধারণা, সমাজতন্ত্র মানেই "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ"। অথচ মার্কসের আগেও সমাজতন্ত্র ছিল এবং রুশবিপ্লবের পর যখন বলশেভিকবাদের রম-রমা অবস্থা, তখনও ইংরাজি ভাষাভাষী, উন্নত দেশে, স্কানডেনেভিয়ার দেশগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের প্রধান ধারাই ছিল বলশেভিজম-বিরোধী, হয়তো অংশত "নাস্তিক্যধর্মী মার্কসবাদী"—মূলত গণতান্ত্রিক।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ ছিলেন উনিশ শতকের মানুষ। তৎকালীন পুঁজিবাদী শিল্প-সমাজের চেহারা দেখে যে মতবাদ তাঁরা প্রচার করেন, এক যুগে নির্বিত্ত জনতার কাছে তা আশা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছিল। মার্কসবাদের নতুন অভিব্যক্তি ঘটে, কৃষক-প্রধান জার-শাসিত অনগ্রসর রুশ সমাজে—"বলশেভিজম" রূপে। মার্কসবাদের "রূপান্তর" ঘটে; মার্কসবাদ হয়ে ওঠে শুধু-ই ক্ষমতা দখলের রণনীতি ও রণকৌশল। ক্ষমতাসীন হলে, বিশেষত পিছিয়ে পড়া রুশ সমাজে, কমিউনিষ্টরা কিভাবে অর্থনীতি ও সমাজকে গড়ে তুলবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখে যান নি মার্কস। এই জন্যই গোঁড়া মার্কসবাদী মহলে মার্কসবাদের প্রয়োগ নিয়ে এত মত-পার্থক্য। উন্নত, প্রাগ্রসর সমাজে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ-রূপান্তরের কথা মার্কস-ও ভেবেছিলেন। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলস-ও পুরণো রণকৌশল, রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র ব্যারিকেড লড়াই-ইত্যাদি, পাল্টাবার কথা বলে গেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের সার্থক প্রয়োগের কথা, বলেছিলেন—"গণভোট প্রবর্তিত

হবার ফলে "সংগ্রামের শর্তের আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। সাবেকী কেতার বিদ্রোহ, ব্যারিকেড তুলে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, (১৮৪৮ পর্যন্ত সর্বত্র-ই যাতে ফয়সালা হয়েছে) তা এখন অকেজো হয়ে পড়েছে বহুলাংশে।"

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বার্ণস্টাইন এ সব কথার তাৎপর্য বুঝেছিলেন, বলশেভিকরা বোঝেন নি।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ঃ

বার্ণস্টাইন দেখেছিলেন মার্কসের ছক অনুযায়ী না হ'য়ে পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সমগ্র বিকাশই অন্যভাবে ঘটছিল। পুঁজিবাদে "একচেটিয়া ঝোঁক" ও "সংকটের উপাদান" থাকা সত্ত্বে-ও, সর্বহারাদের দুঃস্থতা ও নিঃস্বতা না বেড়ে তাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছিল, গণভোট-নির্ভর গণতান্ত্রিক সমাজে। উপরন্তু, বৃত্তি ও পেশাজীবী এক "নতুন শ্রেণীর" উদ্ভব শুরু হয়েছিল, যাতে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যেকার নগ্ন বৈপরীত্য ক্রমশ অপসৃত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি গঠিত হচ্ছিল এবং তারা "বাঁচার মতো মজুরি" ও অন্যান্য দাবি নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেছিল। দেখা যাচ্ছিল পুঁজিবাদ "জরাগ্রস্ত" ও "মরণোন্মুখ" নয়। পুঁজিবাদের মধ্যে নিত্যনতুন আর্থিক, সামাজিক ও আইনী পদ্ধতি-প্রকরণ আমদানী ক'রে, আয়ের 'বণ্টনে' উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব। গণতন্ত্র থাকায় পুঁজিবাদের উপর শিল্প এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি—এই উভয় দিক থেকে 'চাপ' সৃষ্টির ফলে পুঁজিবাদেরও ক্রমশ 'রূপান্তর' ঘটছিল, এবং এর প্রকৃতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। বর্ধিত আর্থিক ও রাজনৈতিক সুযোগ পেয়ে শ্রমিকশ্রেণী ইংলণ্ডে ও অন্যত্র সোশ্যাল-ডিমোক্রেটিক বা লেবার পার্টি-র মতো নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছিল এবং নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করেছিল। পার্লামেণ্টারি পথের যে 'অ-বিপ্লবী' ধারণা মার্কসের হেগ-ভাষণে মিলেছিল, এবং গণভোটের উপর এঙ্গেলস যে সব মন্তব্য করেছিলেন, সেই ধারণা ও মন্তব্যের বিস্তার করেন বার্ণস্টাইন। একদিক থেকে তিনি এ যুগের প্রথম 'শোধনবাদী'। তাঁর বিশ্লেষণই মোটামুটি গ্রহণ করেছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা। বার্ণস্টাইন ছাড়া অপর একজন বিখ্যাত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী—কার্ল কাউট্‌স্কি অবশ্য নিজেদের মার্কসবাদী-ও বলতেন। তবুও পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির গৃহীত

নীতি ছিল "পার্লামেণ্টারি পার্টি" গড়ে তুলে প্রধানত "নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি"তে সংগ্রাম করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, এই নীতির সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি তাদের নিজ নিজ দেশে হয় সরকার পরিচালনায় অংশীদার হয়, অথবা প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়। এরা এমন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় যে, জাতীয় রাজনীতিতে এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হোত।

'গণতন্ত্র' বর্তমান থাকায় এ সব দেশে রাষ্ট্রের উপর শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ইউরোপের বুর্জোয়া গণতন্ত্রগুলিকে "কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে" পরিণত করবার পথ সুগম করেছিল। উন্নত, গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তাই দেখা যায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জনকল্যাণের নানারকমের উদ্যোগ। উচ্চ জীবনধারণের মান এবং আপেক্ষিক বেকারী-হীনতা, বীমা জাতীয় স্বাস্থ্য-প্রকল্প, বার্ধক্যের পেনশন, বেকার ভাতা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, এবং প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি নিয়ে পুঁজিবাদ যে রূপ ধারণ করে, বিশ শতকের শেষার্ধে তা উনিশ শতকের সমাজতন্ত্রীদের, এমন কি মার্কস-এঙ্গেলসের কল্পনায় ছিল না। নীচের তলার শ্রমজীবী মানুষের 'চাপ' প্রকৃতই অনুভূত হোত ঐ সব দেশে। ঐ চাপের ফলেই গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ ক্রমশই সমাজ কল্যাণের আদর্শে বিস্তার লাভ করেছে; উনিশ শতকী পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হয়েছে অংশত 'নিয়ন্ত্রিত' সামাজিক কল্যাণাভিমুখী পুঁজিবাদে। এখন পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে যা করা গেছে তা কেতাবী সমাজতন্ত্র হয়তো নয়। কিন্তু মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে যে পুঁজিবাদের কথা বর্ণনা করেছেন, বা যার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, এ তাও নয়।

সমাজতন্ত্র স্থাপনের সংগ্রাম এখনও চলছে। কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলী দেখিয়েছে, এই সংগ্রাম যে দৃষ্টিভঙ্গীতে হবে তা "অ-বলশেভিক", অংশত মার্কস-বাদী, কিন্তু পদ্ধতিতে 'গণতান্ত্রিক'।

মার্কসের মার্কসবাদে যে মানবিকতার ও গণতন্ত্রের উপাদান আছে এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাধারায় যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আছে তার সমন্বয় ক'রে, গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র স্থাপনের সংগ্রামই এ যুগের কাজ। 'বিপ্লব', 'শ্রেণী-সংগ্রাম', 'হিংসা', 'রাস্তার লড়াই', এক পার্টিনায়কতাধীন "সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র"—সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এই সব পুরণো মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আজ আর কাজ হবে না। বস্তুত, দমনপীড়নমূলক, হিংসাশ্রয়ী, একনায়কী বলশেভিকবাদ সমাজতন্ত্রকে মসীলিপ্তই করেছে। ও দেশের মানুষই আজ বুঝেছে যে ঐ আসুরী

সমাজতন্ত্রকে 'সমাজতন্ত্র'-ই বলা চলে না ; কারণ, এতে সমাজতন্ত্রের অবশ্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিস্বরূপ "স্বাধীনতা", "সমতা" ও "মানবিকতা" নেই।

বর্তমান যুগ ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

যে সামাজিক-রাজনৈতিক ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আজ মানুষ চলেছে এবং নিত্যনতুন যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে, তাতে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও আচার আচরণে মৌলিক পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। ২১ শতকে আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। সত্যই যুগটা প্রযুক্তি নিবিড় (technology intensive) ও বার্তা সমৃদ্ধ (information rich)। পৃথিবী-টা আজ এক এবং অখণ্ড। ইদানীংকালের যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক বিপ্লব, কম্প্যুটার বা যন্ত্র-গণকের অবিশ্বাস্য জগতের উদয়, মহাকাশ-বিজ্ঞান, যন্ত্র-মানব (robot) ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবির্ভাব, জৈব-প্রযুক্তি (bio-engineering) ইত্যাদি।

এই সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ফলাফল কি হবে, আজই তা বলা শক্ত। যেমন, তাপ-পারমাণবিক যুগে মানব-সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারে। এ যুগে তাই জাতীয় রাষ্ট্রপ্রণালীতে যুদ্ধ ও শান্তি-র প্রশ্নে পুরণো ধাঁচে চিন্তা সম্ভব নয়। হয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও লেন-দেন, অস্ত্রশূন্য অহিংস পৃথিবী, অথবা মহতী বিনষ্টি :—আজকের মানুষের সামনে বোধ হয়, এ দুটিই বিকল্প। যন্ত্র-গণক, রোবোট এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (automation) শুধু মানুষের উৎপাদিকা শক্তিকে যে বাড়াবে, শ্রমকে মুক্তি দেবে, কষ্টসাধ্য, বিপজ্জনক ও নোংরা কাজ থেকে তাই নয়, বরং উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তির ও বিশ্লেষণের কাজও করবে। যেখানে শিল্প আগে ছিল, কায়িক শ্রমনির্ভর, তা ক্রমশ হবে মানস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল। আগামী দিনে অধিকাংশ মানবিক কাজই করবে যন্ত্রগণক। একঘেয়ে শ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষের জুটবে 'অবসর'। তাতে-ও নানারকম সমস্যা দেখা দেবে, ঠিকই। কিন্তু মানুষ যে অর্থে আজ শ্রমবিভাগের দাস, সেই দাসত্ব লাঘব হবে বহুল পরিমাণে, সাইবারনেটিক বিপ্লবের যুগে।

জৈব-এঞ্জিনিয়ারিং-এ মানুষের অঙ্গসমূহের দেহান্তরীকরণের চেষ্টাও চলেছে। একদিন এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যে, অন্যের কাছ থেকে পাওয়া অঙ্গসমূহ নিয়ে একটি ব্যক্তি যা হয়ে জন্মেছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সমকালীন বিপ্লবের তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য হল, এ' যুগে গোষ্ঠী-বাৎসল্য, শ্রেণী-বাৎসল্য, জাতি-বাৎসল্য, সঙ্কীর্ণ 'ইজম' (মগ্ন) প্রভৃতির গণ্ডি ভেঙ্গে ধন-ধান্য, ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-ধ্যান, তন্ত্র-মন্ত্র সমস্ত কিছুকেই আজ বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের উপযোগী করে তুলতে হবে। ফলে, অনেক দীর্ঘ লালিত সংস্কার, অনেক মানস-প্রতিমাকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু উপায় নেই।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কতকগুলি সুবিধা ছিল এবং আছে। গুরুবদ্ধ, শাস্ত্রবদ্ধ, আচার-বদ্ধ 'মতবাদ' না হওয়ায় নতুন যুগের সঙ্গে এর খাপ খাওয়ানো সহজতর।

এরা 'শ্রেণী সংগ্রাম' তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নি। কিন্তু এই তত্ত্বটিকে সর্বোচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে বিশ্ব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াসও পায়নি কোনদিন। এরা স্বীকার করেনি যে, সব যুগে সব সমাজে, অর্থনীতিতে-রাজনীতিতে, সমাজে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ভাবলোকে শ্রেণী-সংগ্রামই—"কেবল সত্য"। এরা বলেছে—মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পারস্পরিকতা, সহযোগিতা, মেল-বন্ধন, mutual aid, এ' সব-ও আছে। যাকে "শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস" বলে তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে "মানুষের ইতিহাস" বলে তা বহুদূর প্রসারিত।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আর একটা বড় গুণ ছিল : তিনটি অপদেবতার সজ্ঞানে বিসর্জন। একটি হল—শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। অপরটি হল—একপার্টিনায়কতাধীন "সর্বগ্রাসী" রাষ্ট্র দেবতার পূজা। তৃতীয়টি হল—ব্যক্তি মালিকানা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে (একপার্টিনায়কতাধীন) রাষ্ট্র মালিকানার পূজা। অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি - অর্থাৎ রাষ্ট্র-সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে "একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকার" স্থাপন করতে যদি পারে তবেই মানুষের আত্যন্তিক "মোক্ষলাভ"। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এই সব ভুয়া দেবতার পূজায় কোনদিনই সম্মত হয়নি।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র জানে যে, ইউরোপের শিল্প-সভ্যতা (অধুনা নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী) "সম্পন্ন সমাজ" গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও এমন সমাজ-নির্মাণ করতে পারেনি যেখানে কোন শোষণ ও বঞ্চনাই নেই। আদিতে এই সভ্যতায় শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজাই ছিল প্রবল। এই সভ্যতার সঙ্গে মিশে আছে অতি লোভ এবং অতি-ভোগ। এই সভ্যতায় নানাভাবে মানুষের ঐক্য পীড়িত, এবং সেজন্যই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র-ও বুঝেছিল যে, এই সভ্যতার অন্তঃস্থলে বিনাশের বীজ লুকিয়ে আছে। এবং নিরন্তর এর সংস্কার প্রয়োজন।

কিন্তু তাই বলে যন্ত্রবহুল, শিল্পসভ্যতাকে নির্বাসিত ক'রে প্রাচীন সমাজে ফেরবার কথা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ভাবেনি। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে সম্মিলিত কর্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বহুগুণিত ক'রে, জীবনের পথে, জয়যাত্রায় এগিয়ে গেছে, সেজন্যই মানুষ 'আধুনিক'। শক্তিকে খর্ব করা নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নির্বাসিত করা নয়; সেই শক্তিকে মিলিত করে সর্বসাধারণের (devolution of power) জন্য লাভ করে, মানুষকে এবং সমাজকে 'মানবিক' ক'রে তোলার দায়িত্ব মানুষেরই। শিল্প-সভ্যতা সমাজের বেড়া-দেওয়া নানা ক্ষেত্রে মানুষের প্রবেশপথ নির্মাণ করেছে। কিন্তু এও সত্য যে গত শতবর্ষব্যাপী যে অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিকাশ সাধারণ, ভাবে মানুষের জীবনে এত সুখ সমৃদ্ধি এনেছে (তুলনায়) পরিণামে আধুনিক জীবনকে তা আরও অসহনীয় করে তুলছে। আধুনিক জীবনের উৎকর্ষের মাপকাঠি যদি হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও আস্থা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষ, পরিবেশ সংরক্ষণ, আরও স্বাস্থ্যসম্পন্ন গ্রাম ও নগর, সামাজিকতা, সংহতি, তবে কি এককথায় বলা চলে যে, আধুনিক শিল্পায়িত, যন্ত্রবহুল, গণ-সমাজ অতীতের গ্রাম-সমাজের তুলনায় শ্রেয়োতর?

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এ সব সমস্যার কথা জানে। জানে অকস্মাৎ, একদিনে, বা দশদিনে বসুন্ধরাকে সর্বাঙ্গসুন্দর, "সব পেয়েছির দেশ" করা যাবে না। দুঃসাধ্য তীর্থের সোজা, সুখগম্য পথ খোঁজাটা ইউটোপিয়া-ই। তবুও পথ খুঁজতে হবে নিরন্তর। লক্ষ্য—বিশ্বপ্রকৃতির (সমাজসহ) "মানবিকীকরণ", স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে— 'পথনির্ণয়'। পদ্ধতি-প্রকরণ—"গণতন্ত্র"।

পরিশেষে কার্ল কাউট্স্কির দু'টি মূল্যবান মন্তব্য তুলে দিয়েই শেষ করছি।

"Force is therefore, not a method by which a working class party can advance in a democracy or achieve results that cannot be achieved by democratic methods. Democracy is the shortest, surest and least costly road to socialism just as it is the best instrument for the development of the political and social pre-requisites for socialism: Democracy and Socialism are inextricably entwined." [Social Democracy Versus Communism—The Rond School Press, 1946]

অর্থাৎ—

"গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কি ভাবে অগ্রসর হবে, কি করে তারা সাফল্য লাভ করবে—জোর জুলুম ও জবরদস্তি খাটিয়ে? একেবারেই নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে তারা বেশ অগ্রসর হতে পারে, সাফল্যলাভও করতে পারে।

সমাজতন্ত্রে যাবার সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, নিশ্চিত এবং কম-দামী পথই হল গণতন্ত্র : এবং গণতন্ত্র-ই সমাজতন্ত্র-নির্মাণের পূর্ব-শর্তাদি তৈরীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক, —সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র—একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোত বিজড়িত।"

কার্ল কাউটস্কি সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশা পোষণ করেন নি। তবে বলেছেন, রাশিয়ায় স্বৈরাচারের অবসান হ'য়ে যদি "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এক মিলিত গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে, তবে নিরাশার কোন কারণ নেই।

"The re-establishment of a united Socialist and Labour movement is impossible so long as Russia is ruled by a dictatorship seeking to subordinate to itself the working-class of the whole world. A united front will come of itself as soon as the dictatorship has vanished, for without it, the Communists will be deprived of their life-force. They will speedily dis-integrate as soon as slogans and money cease to come from Russia and the iron and golden ring that is holding them together has been removed. Not the collapse of the dictatorship in Russia but its further continuance in power constitutes the gravest menace and causes the greatest danger to the struggle of the modern working-class for liberation."

সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক-আন্দোলনের পুনঃস্থাপন ততদিন হতে পারে না, রাশিয়া একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারের দ্বারা যতদিন শাসিত হবে ; কেননা এই শাসনের লক্ষ্যই হোল সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে এর পদানত করা। সম্মিলিত ফ্রন্ট স্বতঃই জন্ম নেবে যখন এই স্বৈরাচারী-শাসনের অবসান হবে। কারণ, এই স্বৈরাচার না থাকলে কমিউনিস্টদের সঞ্জীবনী-শক্তি নষ্ট হবে। অতি সত্বর তাদের মধ্যে দেখা দেবে ভাঙন, —ভাঙন দেখা দেবে যে মুহূর্তে রাশিয়া থেকে স্লোগান আর টাকা আসা বন্ধ হবে। তখনই যে লৌহ ও স্বর্ণ চক্র তাদের ধরে রেখেছে— তার অপসারণ সম্ভব হবে। রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের পতন নয়, এর ক্ষমতায় টিঁকে থাকাটা সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ। সমকালীন শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদই এই স্বৈর-শাসন।"

সেই স্বৈরশাসনের অবসানের চিহ্ন আজ দিকে দিকে। কাজেই, বলশেভিক-বাদ অবলুপ্ত হবে, সমাজতন্ত্র নয়। নিরাশার কারণ নেই।

গণতান্ত্রিকতা—পূর্বে ও পশ্চিমে

প্রশান্ত কুমার ঘোষ

গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ নিয়ে যে কোন আলোচনার প্রারম্ভে দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই সংজ্ঞা-নির্ধারণের সমস্যা-সংক্রান্ত,—গণতন্ত্রের দেশকালনিরপেক্ষ সর্বসম্মত কোন অভিধা আছে কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জড়িত। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বজনগ্রাহ্য একটি ব্যাখ্যা আছে তাহলেও তার বাস্তব রূপায়ণের পরিধি ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পঞ্চাশের দশকে C. D. Burns-এর Political Ideals বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির তখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতক পর্যায়ে অধীতব্য বিষয় বলে স্বীকৃত হয়নি—অর্থনীতির সঙ্গে তা যুক্ত ছিল। সাম্মানিক স্নাতক-স্তরে অবশ্য পাঠ্য ছিল। লেখক গণতন্ত্র সম্বন্ধে অধ্যায়টি আরম্ভ করেছিলেন একটি চমদপ্রদ বাক্য দিয়ে—"Democracy is not yet achieved"[১] গণতন্ত্র আজও উপলব্ধ হয় নি। পৃথিবীর কোন দেশেই (বার্নসের মতে) গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

গণতন্ত্রের ব্যবহারিক সাফল্য সম্বন্ধে এই অভিমত পূর্বে ও পশ্চিমে গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ-নির্ধারণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করার আগে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শগত দিকটি সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে ১৯৪৯ সালে UNESCO একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক দেশেই প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়েছিল মণীষী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে। যেসব উত্তর পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

১) গণতন্ত্র-বিরোধী কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয় নি। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাই "আদর্শ" বা "কল্যাণকর" বলে উত্তরদাতাদের মনে হয়েছে তাকেই তাঁরা 'গণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করেছেন।

২) গণতন্ত্রের ধারণা-কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে,—এ মত যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁরাও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থবোধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার

করেন নি। অনেকে এ কথাও বলেছিলেন যে সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পটভূমি অনুযায়ী গণতন্ত্রের ধারণা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়।[২]

বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাম্য (এবং অনিবার্য) এই ধারণা যেমন এই শতকে অধিকাংশ তাত্ত্বিকের স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনই গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ নিয়ে বিতর্কও তীব্রতর হয়েছে। এই বিতর্কের উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের পশ্চিমী দুনিয়ার "উদারনৈতিক" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখ্য উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে পশ্চিম ইয়োরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় যে-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষণীয়, তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এবং পরিস্থিতিতে তিনটি ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে, কখনও মিলিতভাবে কখনও বা নিজস্ব গতিপথে। প্রথম ধারাটির উৎস প্রাচীন গ্রীসে ; Bertrand de Souvenel[৩] এর ভাষায় এর মূল উপজীব্য 'self-government'-স্বশাসন, যা সম্ভব হয় "By the concourse of Everybody"—সকলের সম্মিলিত যোগদানে। গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিতেও এই ধারণার প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ক্রীতদাস, বিদেশী এবং নারী-রা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শরিক হতে পারতেন না। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে এই ধারণার প্রয়োগ করার প্রায় অসফল প্রয়াসে এবং গণভোট বা গণউদ্যোগের সীমিত ব্যবহারে গণতন্ত্রের এই 'সকলকে-নিয়ে-চলার' আদর্শ সক্রিয়। কয়েকটি লিখিত সংবিধানের প্রস্তাবনায় "আমরা জনগণের" ঘোষণাকেও এই সর্বাত্মক গণতন্ত্রের ধারণার প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিবর্তনে সক্রিয় দ্বিতীয় ধারাটি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার আদর্শে কেন্দ্রীভূত। ১৬৮৮র "গৌরবময়" বিপ্লব, ১৭৭৬ এ মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ফরাসী বিপ্লবে মানবাধিকারের (এবং নাগরিক অধিকারের) প্রথম সনদে এই আদর্শ স্বীকৃত এবং পরিস্ফুট। শাসন-ব্যবস্থায় সকলের যোগদানের চেয়ে এই আদর্শে প্রত্যেকের (এমন কি ইংলণ্ডে তৃতীয় জর্জের রাজত্বে John Wilkes এর মতো 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিরও) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্ব অনেক বেশী।

গণতন্ত্র বিকাশে তৃতীয় ধারাটির মূল অবলম্বন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব। মধ্যযুগীয় Estate বা সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থেকে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের

প্রাপ্তবয়স্কের সংজ্ঞাও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে। প্রতিনিধিত্বে উত্তরণের মধ্যে গণতন্ত্রের রূপান্তর ঘটেছে এই শতকে।[৪]

দুই.

পশ্চিমের দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যে পরিমণ্ডলের মধ্যে তার মৌল লক্ষ্য ছিল "The concern for the protection of Anyone ৫ **যে-কোন ব্যক্তির** স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য শাসকবর্গ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে রাখার একটা সচেতন প্রয়াস উদার-নৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের অবাধ অগ্রগতির পক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য এই আকুতি সহায়ক হয়েছে। তবু বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার আগ্রহ স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অলিভার ওয়েন্ডেল হোমসের মতো বিচারক আইনের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রক্ষণশীল শাসক গোষ্ঠীর চাপকে অগ্রাহ্য করে। গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে 'Civil Liberties'-এর প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম পশ্চিমী গণতান্ত্রিক মডেল অনুসারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে-ও পরিবর্ত্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ভারতে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জরুরী অবস্থার সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে অনেক মত ও পথ এসে মিশেছিল পরিবর্তনের দাবীতে। এক অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সেদিন অন্য সব চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী মনে হয়েছিল।

গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শের মধ্যে এ-ধরণের সংঘাত বারে বারেই দেখা গেছে। Acton এর বিখ্যাত উক্তি "The passion for equality makes vain the hope of freedom"—এই দ্বন্দ্বের স্পষ্টতম স্বীকৃতি। উনিশ শতকে Tocqueville এবং John Stuart Mill ভিন্নভাবে এই দ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন; সমস্যার যে সমাধানের কথা তাঁরা বলেছেন তাতেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ধরা পড়ে।

Dennis Smith[৬] এর ভাষায়:

"The work of both men is a response to a feeling of political and social danger. However, they perceived different threats. Tocqueville judged that the democratic revolution was an irresitible tide, and saw the need for democracy to become civilized. He could not envisage such a prospect occurring unless industrial capitalism was held in check..."

মিল কিন্তু বিপদ দেখেছিলেন অন্যত্র। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনিবার্য ভাবেই এসেছে এবং তা স্থায়ী হবে। তবে বুর্জোয়া 'বাণিজ্যিক' মূল্যবোধ সমাজ-কে যাতে গ্রাস না করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। "His plan was to civilise capitalism. This strategy entailed placing very strict limits upon urban democracy"[৭]

মনে রাখতে হবে যে মিল্ 'সভ্যতা' এবং অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধিকে সমার্থক বলে মনে করেন নি। শিক্ষিতদের মধ্যে নির্বাচনের অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখার যে-অভিমত তিনি যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রেরণা ছিল এক 'আনন্দিত, মহৎ, জ্ঞানদীপ্ত আদর্শ সমাজে'র কল্পনা। "Eqality was one value to be built into such a society. However, it had to be balanced against other equally important values, including liberty, diversity and individuality."[৮]

মিল্ এবং ভিন্নভাবে হলেও তক্‌ভিনের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল অভীপ্সা ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়। এই অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পশ্চিমী গণতন্ত্র সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় কখনও ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে বিগত দশকগুলিতে। কিন্তু তবু বার্ণসের সতর্কবাণী প্রাসঙ্গিক থেকেই গেছে : "Democracy is not yet achieved." কোথাও কোনসময়েই গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে নি।

তিন.

এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব দিগন্তে গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ও তার সাম্প্রতিক সংকটের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের বিজয় একদিকে যেমন অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল সারা বিশ্বে, তেমনই নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি, বিশেষতঃ একনায়কতন্ত্রের ধারণা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই। State and Revolution গ্রন্থে লেনিনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল এই যে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র অন্যসব রাষ্ট্র ব্যবস্থার চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক—"more *democratic* than other forms of government" ; তিনি একথাও বলেছিলেন যে "Dictatorship of the Proletariat is democracy for ninety nine per cent of the people." উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে সেই প্রসঙ্গে লেনিনের অভিমত

খুবই স্পষ্ট : "Democracy is of great importance to the working-class in its struggle for emancipation from the capitalists. But democracy is by no means a boundary that must not be overstepped."[৯]

গণতন্ত্রের সীমানা অলঙ্ঘনীয় নয়—লেনিনের এই মত অভিব্যক্ত হয়েছিল এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি-তে ; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক রক্ষাকবচ-গুলিকে প্রতিবিপ্লবের হিংস্রতার সম্মুখীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃহত্তর স্বার্থে সাময়িক ভাবে বাতিল করা যেতে পারে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেও লেনিন বলেছিলেন যে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রও অবাধ ও নিরঙ্কুশ হবে।

"In reality *only* under socialism will a rapid, genuine, really mass forward movement, embracing first the *majority* and then the *whol* of the population, commence in all spheres of social and personal life."

লেনিনের উপরোক্ত মন্তব্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত: সমাজতন্ত্র কোন অনড় অচল ব্যবস্থা নয়—তা দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সর্বদা অগ্রগামী। দ্বিতীয়ত: সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যাপক সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলেও এর স্বাভাবিক পরিণতি সমগ্র জনসাধারণের সক্রিয় যোগদানে—সমাজের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিকতার প্রসারই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য।

১৯১৭র বিপ্লবের মধ্যে সোভিয়েট ব্যবস্থায় কোন্ রণকৌশল (tactics) অবলম্বন করতে হবে এ বিষয়ে Letter on tactics এ লেনিনের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা পূর্ব ইয়োরোপের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনস্বীকার্য। দিন বদলের পালার মধ্যেও তিনি কোন ফরমুলাকেই চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বাস্তব ঘটনাবলীকে বুঝতে। "A marxist must take cognizance of actual events, of the precise facts of *reality*, and must not cling to a past theory, which, like all theories, at best outlines the main and the general, and only *approximates* to an inclusive grasp of the complexities of living reality."

এর পরেই আছে সেই বিখ্যাত উক্তি :

"Theory, my friend, is grey, but green is the eternal tree of life."[১০]

CENTRAL LIBRARY

তত্ত্বের ধূসরতার চেয়ে জীবনের শ্যামলিমা যে অনেক বেশী আকর্ষণীয় এ-সত্য পূর্ব ও পশ্চিমে গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাতে ও সমন্বয়ে আজ অনেক স্পষ্ট।

তবু সেই অব্যবহিত বিপ্লবোত্তর অস্থির সময়েও গণতান্ত্রিকতার সীমা লঙ্ঘন করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছেন রোজা লাক্সেমবুর্গ। তত্ত্বের 'ধূসরতা' সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বলেছেন"[১১]"একথা ঠিক যে আমরা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রতিমাপূজক নই" (We are not idol-worshippers of formal democracy)—কিন্তু আমরা তো মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের-ও প্রতিমাপূজক নই, তবে কি "প্রয়োজনে" সমাজবাদকেও বাতিল করতে হবে, গণতন্ত্রেরই মতো ? আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার কথা ওঠে না ;

"We have always revealed the hard kernel of social inequality and lack of freedom hidden under the sweet shell of formal equality and freedom—not in order to reject the latter, but to spur the working class into not being satisfied with the shell, but rather, by conquering political power, to create a socialist democracy to replace bourgeois democracy —not to eliminate democracy altogether."[১২]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই গণতন্ত্রের সূচনা হবে এই ধারণাকে রোজা লাক্সেমবুর্গ তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। "It [democracy] does not come as a Christmas present for the worthy people who in the interim have supported a handful of socialist dictators."; সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সূচনা হয় সার্থক বিপ্লবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই গণতান্ত্রিকতাকে বাতিল করে কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই গড়ে উঠতে পারে না।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সতর্কবাণী দীর্ঘ-কাল উপেক্ষিত হয়েছে। শাসকদলের মধ্যে 'গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতা' অনেক সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি Pat Sloan-এর 'Russia without Illusions' কিংবা ধর্মযাজক Hewlett Johnson এর 'Socialist Sixth of the World' এবং তারপরে Sidney ও Beatrice Webbএর 'Soviet Communism'—A New Civilization' পড়ে আমার কৈশোরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের যে ছবিটি উজ্জ্বল হয়েছিল আজ তার মধ্যে অনেক ফাঁক আর ফাঁকি, অনেক দৈন্য নিষ্ঠুরতা আর মালিন্যের গ্লানি ধরা পড়েছে। ১৯৪৯ এ চীনের বিপ্লবের পরে মার্কিন দেশে পত্রিকা Masses

and Mainstream এ চীনের পরিবর্তন বিষয়ে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার দুটি অনবদ্য পংক্তি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল :

"Home coming Crusoes of a ship-wrecked era
The Red Army of China entered Sanghai"

বিপ্লবোত্তর চীনের সমাজ কবি 'শেলি'র স্বপ্নকে সার্থক করেছে এই অভিমত তখন অনেকেই সমর্থন করেছেন, এমন কি যাঁরা সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে অনেক দূরে থাকতে চাইতেন তেমন অনেকেও।

কী ঘটল গত পাঁচ দশকে যাতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে 'প্লাস পয়েন্টে'র চেয়ে 'মাইনাস পয়েন্ট'ই বেশী,—এই সিদ্ধান্ত ১৯৮৯-১৯৯০ সালে এমন ব্যাপক স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করেছে? একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষাপ্রসারে, জনস্বাস্থ্যের সুষম ব্যবস্থায় এবং সামাজিক নিরাপত্তাবিধানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রেকর্ড অনেক ভালো। কিন্তু শুরু থেকেই গোল বেধেছে যে-বিষয়টি নিয়ে তা হ'ল সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। জর্জ অরওয়েলের Animal Farm এ সেই বিখ্যাত উক্তি "All pigs are equal but some are more equal than others" একসময়ে আমাদের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত করেছে, কিন্তু গ্লাস্নস্তের প্রভাবে এক্টি একটি করে নির্মম অত্যাচার ও অন্যায় সুযোগ গ্রহণের কাহিনীর আবরণ উন্মোচিত হয়েছে; অরওয়েল আজ অনেক প্রাসঙ্গিক। গণতন্ত্রের সীমানা অলঙ্ঘনীয় নয়, লেনিনের এই উক্তি ১৯১৭-১৮র সংকটময় পরিস্থিতিতেও তর্কাতীত ছিল না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সময়ে লেনিন যাকে বিশেষ পরিস্থিতি-তে ব্যতিক্রম বলে মনে করেছিলেন পরে তাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই যখন এদেশের সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলিতেও পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে সাম্প্রতিক নির্বাচনপর্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে চার/পাঁচ দশক পরে এই প্রথম "অবাধ" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসব দেশে, তখন আমরা আর অবাক হই না। কারণ আমরা মেনেই নিয়েছি যে এতদিন সে সব দেশে নির্বাচনের নামে যা অনুষ্ঠিত হ'ত তা প্রহসনমাত্র। শুধু সামাজিক নিরাপত্তাবিধান করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই পশ্চিমে যেমন, পূর্বেও তেমনই "Democracy is not yet achieved!"

চার.

পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য সাম্প্রতিক আন্দোলন এবং পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অভিনব তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ বোধহয় মার্কিন লেখক Francis

Fukuyama-র "ইতিহাসের অবসান"—(End of History) তত্ত্ব। গতবছর মার্কিন পত্রিকা National Interest এর শরৎকালীন সংখ্যায় তাঁর নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সম্প্রতি ঐ পত্রিকারই (Spring, ১৯৯০) সংখ্যায় বিতর্কের উত্তরে তিনি উন্নত ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর ঐতিহাসিক অগ্রগতি বা পরিবর্তন অসম্ভব,—এই মত আবার জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ফুকুইয়ামার মূল বক্তব্য এই যে ১৮০৬ সালে জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিজয়ের পরে হেগেল ইতিহাস সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। নেপোলিয়নের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হেগেল দেখাতে চেয়েছিলেন যে দ্বান্দ্বিক বিকাশের পথে ইতিহাসের অগ্রগতি সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে তার পর আর নূতনতর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। অবশ্য হেগেল নিজে সাম্য ও স্বাধীনতার এই চূড়ান্ত বিজয়ের ধারণা পরিত্যাগ করে-ছিলেন, জীবনের শেষপর্বে প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রেই তিনি ইতিহাসের বিলয় আবিষ্কার করেছিলেন। ফুকুইয়ামা কিন্তু হেগেলের প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর নিবন্ধে ; তিনি বলেছেন যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যে বিজয়ের কথা ১৮০৬ সালে হেগেল বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ হয়েছে বস্তুত : এই শতকের শেষ প্রান্তে। অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার পরের সব ঘটনা উদার নৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই টলিয়ে দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল যে এই শতক উদারনৈতিক মূল্যবোধের পশ্চাদপসরণের শতক। কিন্তু আশির দশকের শেষে সমস্ত পৃথিবীতেই বিপুল বিদ্রোহে গণতান্ত্রিকতার বিজয় পতাকা উড্ডীন ; হয়তো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিবর্তন আসবে দেরীতে, তবু পূর্ব ইয়োরোপের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই। জাতীয়তাবাদ বা মৌলবাদ হয়তো সাময়িক বাধার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কোনও নূতন ঐতিহাসিক পরিবর্তন আর সম্ভব নয়। ইতিহাসের বিলয় ঘটছে, কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ই মানুষের অগ্রগতির শেষ ঠিকানা,—এ-সত্য আজ প্রমাণিত।

ফুকুইয়ামার তত্ত্ব নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ; কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমতঃ যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিজয় মিছিলের কথা তিনি বলছেন তা কি উনিশ শতকের মিল বা তোক্‌ভিল-বর্ণিত গণতন্ত্র! কব্‌ডেন বা ব্রাইট ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে যে অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা দেখেছিলেন তা কি কোন

দেশেই (এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও) তার সাবেকি চেহারা নিয়ে বর্তমান ? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে যে কী বিপুল পরিবর্তনের স্রোতে রূপান্তরিত হয়েছে তার উজ্জ্বলতম বর্ণনা আছে John Stracheyর contemporary capitalism গ্রন্থে। নির্বাচনের অধিকারের সম্প্রসারণ, বাক্‌স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং শিক্ষাবিস্তার পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

" It is this many-sided thing, democracy, which has set the economic system as a whole on to a different course. It is not any one of the... aspects of democracy which has done it..... contemporary democracy as a whole, which is more than the sum of its parts, has been necessary to this achievement. For contemporary democracy is something more than its particular institutions These institutions, if they work effectively, create an all-pervading climate of opinion. And it is above all this climate of opinion which has profound economic consequences"[১৩]

জনমতের এই প্রভাব অবশ্যই পশ্চিমের সমস্ত দেশগুলিতে একভাবে পড়ে নি ; তবে সর্বত্রই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতার 'মেজাজ' পুরাণো ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হয়েছে একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং নয়া উপনিবেশবাদের ভূমিকা আজও বিপজ্জনকভাবে সক্রিয় ;—কিন্তু ধনতন্ত্রের বীভৎস নির্লজ্জতা পশ্চিমের অনেক দেশেই আজ অনেক সংযত। পরিবেশ দূষণ এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাবে শিল্পপতিরা নিছক মুনাফা-অর্জনের পথ থেকে অন্তত: কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন এসব দেশে। বিশ্বরাজনীতিতে গর্বাচভের উদ্যোগে উত্তেজনা প্রশমনের যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তার প্রভাব-ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিতে লক্ষণীয়।

স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের আদর্শের সমন্বয়ে পশ্চিমে গণতান্ত্রিকতার যে স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে তা আর এক সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করছে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে "freedom of choice" এর ধারণা ক্রমশ: প্রভাবশালী হয়ে উঠছে ; এখানে সমস্যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্জিত অধিকারের

সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার (বিশেষতঃ ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতার) সমন্বয়ের। কষ্টকল্পনা না করেও তাই বলা যায় যে গণতান্ত্রিকতার দুটি স্বতন্ত্র পথ মিলিত হতে চলেছে এক গতিময় সমাজ সচেতন সংবেদনশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। অবশ্যই এই পথ সহজ বা মসৃণ নয়, এবং ইতিহাস থেমে যাবে না কখনোই। নানা স্তরে সংঘাত ও বিপর্যয় আসবে পদে পদে। তবু সাম্প্রতিক অনেক ঘটনাই ইয়োরোপে এক নূতন সমন্বিত ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। আর মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-তে 'নূতন চিন্তা'র প্রভাব বিশেষ কোন মহাদেশে সীমাবদ্ধ নেই, তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপালে এবং 'মিয়ানমারে'-ও পরিবর্তনের জোয়ালো হাওয়া বইছে। পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সর্বত্রই যে গণতান্ত্রিকতার অভ্যুদয় সূচিত তার কোনও 'বিশেষণ' নেই, তা 'পঞ্চায়তী', 'মৌল', 'উদারনৈতিক' (এমন কি 'সমাজতান্ত্রিক') অভিধা ছাড়াই,—শুধুই গণতন্ত্র—যেখানে সকলের যোগদান কারুর অধিকারকে খর্ব করে না—

"……a symphony of voices where each singer carries his individual tune and where each tune merges into the total melody……"[১৪]

গ্রন্থপঞ্জী / তথ্য নির্দেশিকা

১) C, D. Burns—Political Ideals, Fourth Edn., The World Press, Calcutta, 1960, পৃঃ ২১৭

২) Democracy in a World of Tensions, UNESO, Paris, 1951, App III : পৃঃ ৫২৭

৩) 'What is Democracy ?' Democracy in the new States—Rhodes Seminar Papers—CCF, New Delhi, 1959 ; পৃঃ ২৭

৪) দ্রষ্টব্য John Strachey—Contemporary Capitalism, Victor Gollanez, London, 1957

৫) জুভেনেল, উল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৮

৬) Dennis Smith : Capitalist Democracy on Trial, Routledge, London, 1990 ; পৃঃ ১৭

CENTRAL LIBRARY

৭) Dennis Smith—তদেব পৃঃ ১৭

৮) ঐ পৃঃ ২৭

৯) লেনিন, স্টেট্ এণ্ড রেভোলিউশান, (সিলেক্টেড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় ভল্যুম, Lawrence & Wishart, পৃঃ ২১১)

১০) C. Wright Mills এর The Marxists (Peuguin, 1962) গ্রন্থে পৃঃ ২২৮-২৩৮ দ্রষ্টব্য।

১১) C Wright Mills, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৭-৮

১২) তদেব

১৩) জন ষ্ট্র্যাচি, কনটেম্পোরারি ক্যাপিটালিজম্, ভিক্টর গলান্জ, লণ্ডন, ১৯৫৭, পৃঃ ১৭৬-৭৭

১৪) জ্যাক্রি স্নোচাওয়ার, নো ডয়েস ইজ হোল্লি লষ্ট,.....ডেনিস ডব সন লিমিটেড, কিংসওয়ে ১৯৪৬, পৃঃ ৩০৪।

———

সমাজতন্ত্রের সঙ্কট—বিপর্যয় না অগ্নিশুদ্ধি ?

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এক.

"১৯৯০ সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রর মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করেছে—পূর্ব ইউরোপে তারই ঘন্টা বেজেছে"—সারা পৃথিবী জুড়ে কমিউনিষ্ট-বিরোধী কট্টর প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এই বলে উল্লাস করছেন। অন্যদিকে "মৌলবাদী" কমিউনিষ্ট যত আছেন, তাঁরা উটপাখির মত বালিতে মুখ গুঁজে বলছেন "সব ঝুট হ্যায়" আর প্রাণপণে ধিক্কার দিচ্ছেন মিখাইল গোরবাচভ ও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে। এই মতান্ধ কমিউনিষ্টদের বাঙ্গালি কবির ভাষায় প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে ; অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?

১৯৮৫তে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত, হয়েছেন মিখাইল গোরবাচভ। আর এটা ১৯৯০র জুন মাস। এই পাঁচ বছরে পৃথিবীর কি কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে ? ৫ বছর আগে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মানব সভ্যতা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহাকাশে ভয়াবহ তারকা-যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখছিল আমাদের গ্রহ। আজ ১৯৯০এ পৃথিবী থেকে প্রায় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের ও মানব সভ্যতা ধ্বংস হবার আশঙ্কা। ১৯৮৯এর আগষ্ট মাসে পশ্চিমজার্মানীর উইটেন শহরেএকজন ৭০ বছরের জার্মান বৃদ্ধা বলেছিলেন : "স্তালিনীয় হুকুমদারি সমাজতন্ত্র আমরা কেউ চাই না, কিন্তু এই শতাব্দীর সেরা মানুষ নিঃসন্দেহে মিখাইল গোরবাচভ কারণ গত দুই দশক প্রতি রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, হিরোশিমার নরকাগ্নিতে জ্বলছে জার্মানি, জ্বলছে পৃথিবী। সেই দুঃস্বপ্নকে বিতাড়িত করেছেন গোরবাচভই, আমাদের পৌত্র, প্রপৌত্রদের জন্য নিরাপদ করেছে আমাদের সমবেত বাসগৃহ এই পৃথিবীকে"।

এটা সৃজনশীল সমাজতন্ত্রেরই কীর্তি এবং ১৯১৭র মহান নভেম্বর বিপ্লবে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রকে জন্ম দেবার পর, এর চেয়ে বড় কীর্তি সমাজতন্ত্রের আর কিইবা থাকতে পারে ? কারণ সারা পৃথিবীর মানবমুক্তিই তো সাম্যবাদের চরম লক্ষ্য !

CENTRAL LIBRARY

পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে সমাজতন্ত্র বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে. তা আমি অস্বীকার করছি না—সে সমস্যার কথায় পরে ফিরে আসব। কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাবলী তো পূর্ব ইউরোপে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্রাজ্যবাদের দুইশত বছরের অবাধ শোষণের লীলাভূমি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা মহাদেশে কি ঘটেছে ১৯৯০তে? সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি, না তার চূড়ান্ত পরাজয়ের সুস্পষ্ট নিশানা?

১৯৯০ এর সূচনাতেই দীর্ঘ বহু দশক পরে ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও বর্ণবিদ্বেষী শাসনের জোয়াল ভেঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকা—যার পোশাকী নাম নামিবিয়া। সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের অবিসম্বাদী মার্কসবাদী সোয়াপো নেতা স্যাম নজুমো সাধারণ নির্বাচনে জিতে নামিবিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের জীবনপণ চারদশকব্যাপী কঠিন সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রদের দৃঢ় সমর্থন ও বিশ্বজনমতের চাপে, পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী আধা-ফ্যাসিষ্ট সরকার। ২৭ বছর পরে জেলের দরজা-খুলে বেরিয়ে এসেছেন বিশ্ববন্দিত নেলসন ম্যাণ্ডেলা ও তাঁর সহযোদ্ধারা, আইনী হয়েছে একই সঙ্গে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, নাটাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টি। বহুলাংশে প্রত্যাহৃত হয়েছে স্বৈরাচারী জরুরী অবস্থা। সমগ্র বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে পড়বার মুখে। মানবমুক্তির ইতিহাসে একটা কঠিনতম লড়াইয়ে পরিপূর্ণ জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবী।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায়, সামরিক বাহিনী নিয়ে ১৪ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম রাষ্ট্র চিলিতে ক্ষমতা দখল করেছিল ফ্যাসিষ্ট পিনোচেট। এক দশকের উপর শ্বেতসন্ত্রাস চলেছিল সে দেশে। ১৪ বছর পর চিলির বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিদের ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ ও বিশ্বব্যাপী সৌহার্দ্যের জোরে পিনোচেটের শাসন আজ চিলি থেকে অপসৃত, আইনী হয়েছে চিলির কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য বিপ্লবী দলেরা, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। মানবমুক্তির এই জয়কেও ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই।

একেবারে সম্প্রতি আমাদের ঘরের পাশে দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রগতির জয়ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ ২৯ বছর রাজতন্ত্রী স্বৈরশাসন চলার পর নেপালের জাতীয় গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টশক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যতঃ এক নিরস্ত্র গণবিপ্লব

CENTRAL LIBRARY

সংঘটিত করলেন নেপালে। কয়েকশত মানুষ শহীদ হলেন স্বৈরশাসনের গুলিতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। নেপালী কংগ্রেস ও নেপালের ৭টি কমিউনিস্ট দলের যুক্ত মোর্চায় ঐক্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু জয়ের নিশ্চয়তাও সুস্পষ্ট।

আর এক প্রতিবেশী দেশ বর্মাতে সামরিক একনায়কত্ব নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণ চালিয়েছে ১৯৬২ থেকে। কিন্তু গত দুবছরের প্রবল গণ-জাগরণ তাদের বাধ্য করেছে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করতে। সমস্ত বিরোধী নেতা ও কর্মীরা কারারুদ্ধ অবস্থায় বা ফেরারী থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তবু বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে সামরিক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, বর্মার বাম-গণ-তান্ত্রিক শক্তির। তাদের হাতে অবশ্য এখনও ক্ষমতা তুলে দেয় নি সামরিক স্বৈরতন্ত্রীরা, মুক্ত করেনি নির্বাচনে বিজয়ী বিরোধী নেতৃবৃন্দকে। তথাপি, বর্মাতেও দেওয়ালের লিখন সুস্পষ্ট।

চিলি থেকে নেপাল, বর্মা থেকে নামিবিয়া—বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ও স্বৈরতন্ত্রী-দের এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের পাশাপাশিই দেখতে হবে, পূর্ব ইউরোপের ঘটনা-বলীকে। তার জন্য একটু ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রয়োজন। জার্মান ফ্যাসিষ্টদের বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট পূর্ব ইউরোপ মুক্তিলাভ করে প্রধানতঃ সোভিয়েতের লাল ফৌজের বিজয় অভিযানের ফলে। তবে ঐসব দেশে কমবেশী ফ্যাসিষ্ট বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামও ছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। তার মধ্যে যুগোস্লাভিয়া তার দেশের শতকরা ৯০ ভাগকেই মুক্ত করে টিটো ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গণমুক্তি ফৌজের জোরে। বুলগারিয়াতেও ১৯৪৪ এ সংগঠিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্টের নেতৃত্বে সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থান। অন্যান্য দেশেও প্রতিরোধ সংগ্রামে যথেষ্ট বীরত্ব দেখান জনগণ, কিন্তু মূলতঃ দেশগুলি মুক্ত হয় লালফৌজের জোরেই।

এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যা অস্বাভাবিক, তাহ'ল এই যে মুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—চালনার মডেলটি কমরেড স্তালিন ও সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্বে জবরদস্তি চাপানো হ'ল পূর্ব ইউরোপের সমস্ত সদ্য মুক্ত দেশগুলির ঘাড়ে। অনেকেরই আপত্তি ছিল, কিন্তু সমান ক্ষমতা ছিল না। প্রায় সমস্ত দেশই আত্মশক্তির জোরে যারা হিটলারী ফৌজের কবল মুক্ত করেছিল, সেই যুগোস্লাভিয়া, তার কমিউনিষ্ট পার্টি ও মুক্তিনেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে স্তালিনীয়

হুকুমদারি অগ্রাহ্য করে, নিজেদের স্বতন্ত্র পথে সমাজতন্ত্র গড়তে অগ্রসর হ'লেন ১৯৪৮এ।

প্রতিশোধে তাঁদের বিতাড়িত করা হল "কমিনফর্মে"র সমাজতন্ত্রী পরিবার থেকে, তাদের বিরুদ্ধে বিকৃত, মিথ্যা অপবাদের স্রোত বহানো হ'ল, কিন্তু যুগোস্লাভিয়া পিছুও হটল না, সমাজতন্ত্রর পথও ত্যাগ করল না। পরে, ১৯৫৬তে, সোভিয়েত নেতৃত্ব তাঁদের গর্হিত অপরাধকে প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন এবং যুগোস্লাভিয়াকে ফের স্থান দেওয়া হ'ল সমাজতন্ত্রের পরিবারে, কার্যতঃ মেনে নেওয়া হল জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথে সমাজতন্ত্রর দিকে যাত্রা করার।

অন্যান্য রাষ্ট্রেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বতন্ত্র পথে সমাজতন্ত্র গড়ার উদ্যোগ হ'ল। কিন্তু সেই উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার বদলে, "প্রতিবিপ্লবী" আখ্যা দিয়ে সেই মতের প্রবক্তাদের কারারুদ্ধ করা হ'ল। চেকোস্লোভাক কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও স্লোভাকিয়াতে হিটলারশাহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণউত্থানের অন্যতম নেতা রুডলফ্ স্লানস্কিকে গুলি করে হত্যা করা হ'ল, ভিন্নতর গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বক্তব্য পেশ করার "অপরাধে"। একই ধরণের "অপরাধে" প্রাণ হারালেন হাঙ্গেরির পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য লাসলো রাজেক, বুলগেরিয়ার পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য কস্তভ, রুমানিয়ার কমিউনিষ্ট নেত্রী আনা পাউকার প্রমুখ। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে চূর্ণ করা হ'ল পূর্ব জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর গণজাগরণকে (১৯৫৩), হাঙ্গেরীর গণজাগরণকে (১৯৫৬) এবং সর্বোপরি কমিউনিষ্টনেতা ডুবচেকের নেতৃত্বের ১৯৬৮তে চেকোস্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী সমাজতন্ত্র গড়ার মহৎ উদ্যমকে।

প্রধানতঃ তাঁরই মাশুল দিতে হচ্ছে আজ পূর্ব ইউরোপের হুকুমদারি কায়দায় গড়া, আধা স্বৈরতন্ত্রী বিকৃত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রদের। সন্দেহ নেই যে চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও মহামারীকে নির্বাসিত করেছে এইসব রাষ্ট্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পদদলিত করেছে গণতন্ত্রকে, নানান মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে, শিল্পীর সৃজনশীলতার সমস্ত সুযোগকে।

১৯৯০র সূচনাতে, থ্যাচারের স্বৈরাচারী জিজিয়া করের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লণ্ডনে কয়েক লক্ষ জঙ্গী শ্রমিকের বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, ব্রিটেনের বামপন্থী শ্রমিক নেতা টোনি বেন প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন যে "পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের মৃত্যু হচ্ছে না, নবরূপায়ণ হচ্ছে। অগ্নিশুদ্ধিতে কিছু

বিপর্যয় ঘটতে পারে, কিন্তু যে শ্রমজীবী মানুষ একবার বিকৃত হ'লেও সমাজতন্ত্রের আস্বাদ পেয়েছে তারা কখনও মাথা পেতে আবার বেকারি, ছাটাই ও জিজিয়া করকে মেনে নেবে না। কিন্তু একাধিক মতের স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ গণতন্ত্র অবশ্যই তাঁরা চাইবে—হুকুমদারী শাসন কোনও মানুষই মানবে না।"

দুই.

পরাজিত জার্মান বিপ্লবের অবিস্মরণীয় নেত্রী রোজা লুকসেমবুর্গ সোচ্চার সমর্থন জানিয়েছিলেন ১৯১৭র নভেম্বর বিপ্লব, সমস্ত বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীকে ডাক দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লবের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিপ্লবের বিজয়ী বলশেভিক নেতাদের কাছে কতকগুলি হুঁশিয়ারীও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

"বুর্জোয়া শ্রেণী আধিপত্যের জন্য সমগ্র জনগণকে শিক্ষিত করার ও রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বের কাছে এই ধরণের শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য—এই শিক্ষা হচ্ছে বাতাস যা ছাড়া কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না। বলশেভিকরা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যে বিশাল দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন, তার জন্য জনগণকে ব্যাপকতম রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হ'বে···। তাই যদি হয়, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হুকুম জারি করে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না। ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে নিশ্চয় সমাজতন্ত্রে বলপ্রয়োগ করতে হ'বে কিন্তু রচনাত্মক নির্মানকার্যে হুকুম জারি করে কার্যোদ্ধার হবে না। অভিজ্ঞতার আলোতেই ভুল শুধরানো এবং নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। পরিপূর্ণ বন্ধনমুক্ত ও দৃপ্ত জীবন যাত্রাই অজস্র নতুন কর্মপদ্ধতির দরজা খুলে দেবে, ভ্রান্ত পদক্ষেপ সংশোধন করবে এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের শক্তি যোগাবে। সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাযুক্ত রাষ্ট্র দীন, বন্ধ্যা ও যান্ত্রিক হবে। কারণ গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না থাকলে, সেই রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তিও কমে যাবে, প্রগতির দ্বারও রুদ্ধ হবে" (রোজা লুকসেমবুর্গ : দি রাশিয়ান রিভল্যুশন, ১৯১৮)।

১৯১৮তে ঐ পুস্তিকাতেই রোজা আরও লিখলেন : "সর্বহারা একনায়কত্ব মানেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। কিন্তু এটা হবে শ্রেণীর একনায়কত্ব, দলের একনায়কত্ব নয় ; বা একটা গোষ্ঠীর একাধিপত্যও নয়। অর্থাৎ বিজয়ী সর্বহারাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত কাজকর্মে ব্যাপকতম জনগণকে টেনে আনতে হবে এবং গণতন্ত্রকে করতে হবে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত।" (পূর্বোদ্ধৃত)

১৯১৯ এর জানুয়ারী প্রতিবিপ্লবীদের হাতে শহীদ হলেন রোজা। একাধিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলেন বলশেভিকরা। রোজার হুঁশিয়ারী সেই তোলপাড়ে খানিকটা তলিয়ে গেল। ১৯২১ এ গৃহযুদ্ধের অবসানে, গুরুতরভাবে অসুস্থ লেনিন, রোগশয্যা থেকে যা লিখলেন, কার্যতঃ তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল রোজার হুঁশিয়ারীর।

১৯২৩ এর জানুয়ারীতে 'সমবায় সম্বন্ধে' প্রবন্ধে লেনিন লিখলেন : "আমাদের সামনে দুটি প্রধান কাজ—একেবারে অযোগ্য আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ঢেলে সাজ। এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, যাতে তাদের সমবায় সমিতিতে টেনে আনা যায়। যদি এতদিনে সমগ্র কৃষক সমাজকে আমরা সমবায় সমিতির মধ্যে গেঁথে ফেলতে পারতাম, তাহলে আমাদের দুই পা শক্তভাবে প্রোথিত হ'ত সমাজতন্ত্রের মাটিতে। কিন্তু এ কাজের জন্য অপরিহার্য কৃষকদের সাংস্কৃতিক মান বহুগুণে উন্নীত করা, যা করা যাবে না একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব না ঘটিয়ে। (লেনিন : সমবায় সম্বন্ধে, বঙ্গানুবাদ লেখকের)

লেনিনের মৃত্যুর পর (তাঁর শেষ কবছরেই) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শ বিকৃত হতে শুরু করেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর ও শ্রমজীবী কৃষকদের আধিপত্যের স্থান নিয়েছিল প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য, পরে তার কেন্দ্রীয় কমিটির আধিপত্য এবং শেষ পর্যন্ত স্তালিনের একনায়কত্ব। পার্টির মধ্যেও সমাজের সর্বত্র তর্কবিতর্কের মাধ্যমে বিপ্লবের যাত্রাপথের সঠিক নিশানা খুঁজে বের করার বদলে, রক্তাক্তভাবে দমন করা হ'ল মতপার্থক্যকে, কারারুদ্ধ ও হত্যা করা হল ভিন্ন মতাবলম্বী বলশেভিকদেরও—বুখারিন, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, র‍্যাকোসভস্কি, টমস্কি ও আরও বহু নভেম্বর বিপ্লবের পরীক্ষিত নেতাদের (ট্রট্স্কির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা প্রয়োজন, তাই এখানে তার উল্লেখ করলাম না)।

সোভিয়েত দেশের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকদের সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের ও লক্ষ লক্ষ সাচ্চা বলশেভিকের অকাতর আত্মদানের ফলে, এইসব গর্হিত গণতন্ত্রবিরোধী বিচ্যুতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদকে চূর্ণ করে নিজেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হ'ল। কিন্তু গণতন্ত্রবিরোধী অপরাধের মূল্যও দিতেই হ'ল।

১৯৫৬ তে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে নিকিতা খ্রুশ্চভ ব্যক্তিপূজার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ধারালো আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী পরাক্রান্ত আমলাতন্ত্র সে সংগ্রামকে মধ্যপথে রুখে দেয়—এক

CENTRAL LIBRARY

গেঁজে যাওয়া (stagnation) যুগ আসে ব্রেজনেভের আমলে। এখন গোরবাচভ পেরস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্টের দুই কর্মকাণ্ড থেকে সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করার দুরূহ ও কঠিন অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সারা পৃথিবীতে আজ সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠছে। দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আজ ধ্বংসের মুখে। প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ পৃথিবী থেকে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। ধনতন্ত্রকে পরাক্রান্ত শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রী আদর্শবাদের সামনে নিজের চেহারা বদলাতে হয়েছে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। সমাজতন্ত্র আজ শুধু কমিউনিস্টদের আদর্শ নয়, সব মতের সমাজতন্ত্রীরা, পরিবেশপন্থীরা, আমাদের দেশের 'দলিত'রা—সবাই যে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে লড়ছে, তারও নাম সমাজতন্ত্র। তাই পূর্ব ইউরোপের সাময়িক বিপর্যয়ে হতাশ হবার কিছু নেই।

পৃথিবীজোড়া শ্রমজীবী জনগণ আজকে সচেতন। কার্ল মার্কস বলেছিলেন শ্রমজীবী জনগণ সারা পৃথিবী জুড়ে শোষণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করবে। ভুল ভ্রান্তি চেপে গিয়ে নয়, ভ্রান্তি সংশোধনের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়েই সমুজ্জ্বল, মানবতাবাদী মহিমায় দেখা দেবে সমাজতন্ত্র—একবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ও বিশ্বে বিজয়ী হয়ে।

সমাজতন্ত্রের পটপরিবর্ত্তন ও মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্প্রতিককালে যে ধরণের পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতানৈক্য ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। এটা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ সমাজতন্ত্রের সমস্যা বা সংকট যাই বলা হোক্ না কেন, সেটির উৎস নিহিত রয়েছে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে, অর্থাৎ, মার্কসবাদের সামনে আজ যে প্রশ্ন বা সমস্যাবলী উপস্থিত হয়েছে, তাদের চরিত্র নেহাতই তাত্ত্বিক বললে ভুল হবে,—বহুলাংশে তা ব্যবহারিকও বটে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে বেশ কয়েকটি ভিন্ন মত ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছে। এক, যাঁরা কট্টর মার্কসবাদবিরোধী, তাঁরা ভাবছেন যে মার্কসবাদের পতন অনিবার্য ও মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দুই, অনেক মার্কসবাদীই এ কথা বলছেন যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের নয়, স্তালিনবাদের সংকটের প্রতিফলন মাত্র। যে ব্যর্থতার মাশুল আজ পূর্ব-ইউরোপকে দিতে হচ্ছে, সেটি মার্কসবাদী তত্ত্বের নয়, মার্কসবাদকে সঠিক-ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিণতি মাত্র। তৃতীয় একটি মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ধরণের সংস্কারের কর্মসূচী অনুসৃত হচ্ছে, অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি, বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব, অবাধ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার,—এই পথই সমাজতন্ত্রকে সজীব-ও গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রদান করে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করতে পারে। চতুর্থতঃ, মার্কসবাদীদের একাংশ এই মতও পোষণ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী এ কথাই প্রমাণ করে যে, সংস্কারের নামে সে সব দেশে যা ঘটছে তা এক অর্থে প্রতিবিপ্লবেরই নামান্তর এবং স্তালিনীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রকে পরিচালিত করেই মার্কসবাদ ও সমাজবাদকে সুরক্ষিত করা সম্ভব।

এই মতগুলোর সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার মনে হয়েছে যে, এই মতপার্থক্য ও বাদানুবাদের মাধ্যমে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে

এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে তাদেরকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরকে এই ধরণের কয়েকটি বিষয় বা সমস্যাকে চিহ্নিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, কারণ বলা বাহুল্য যে প্রশ্নগুলো মার্কসবাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এক.

প্রথম প্রস্তাবনা :

মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে তার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের বাস্তবতাকে। এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে এই সব দেশে সমাজবাদ জনগণের প্রাথমিক অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য বহু স্তরেই বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদের তাত্ত্বিকেরা তাই খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে এই ব্যর্থতা মূলতঃ মার্কসবাদী তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীর অসাফল্য ও ব্যর্থতারই প্রতিফলন মাত্র। অতএব এঁদের মতে পূর্ব ইউরোপের মানুষের গণতান্ত্রিক চাহিদা পূরণ করার পূর্বশর্তটি হোল মার্কসবাদকে বর্জন করে পশ্চিমী গণতন্ত্রের পক্ষাপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা। এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা হোল এই যে, এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন অনালোচিত ও উপেক্ষিত থেকে যায়। প্রশ্নটা হোল যে, মার্কসবাদের মৌলিক তত্ত্বে গণতন্ত্রের প্রশ্নটি কি সত্যিই অস্বীকৃত ছিল? যদি সেটি না হয়ে থাকে, তাহলে এ কথা বলা হবে চরম মূর্খতা যে পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ব্যর্থতারই ফলশ্রুতি মাত্র, বরং সেখানে এ কথাটাই বলা বেশী প্রয়োজন হবে যে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতি ঘটে থাকলে তার দায়ভাগ বহন করতে হবে প্রয়োগ-কর্ত্তাদের, মার্কসবাদের আদি প্রবক্তাদের নয়।

বিস্তৃত আলোচনা না করেও এ কথা খুব দ্বিধাহীনভাবেই বলা যেতে পারে যে মার্কসবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতারা গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে অস্বীকার ত করেনই নি ; বরং তাঁদের চিন্তার বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁরা বারেবারেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মূল পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। এই সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গণতন্ত্র বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সচেতনভাবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে

প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্যটি এখানেই নিহিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের যে ধরণের কাঠামোকে প্রাধান্য দেয়া হয় সেখানে কোনভাবেই সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ শোষিত শ্রেণীর পক্ষে শাসন ব্যবস্থায় নিয়ামক ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ব্যক্তি অনেক সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিরোধিতা করার সুযোগ পান ও সাধ্যমত প্রয়াসীও হন,—কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোন বিকল্প ব্যবস্থা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ তাই একই সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক ও প্রকৃত অর্থে অগণতান্ত্রিক চরিত্র প্রদান করতে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতা, অধিকার, ভোটতন্ত্র, বহুত্ববাদী রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে যেমন এই ধারণাটা দেয়া হয় যে তারা সবাই স্বাধীন ও মুক্ত, বাস্তবে গোটা ব্যবস্থাটিকে এমনইভাবে পুঁজি ও পুঁজির মালিকেরা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে কার্যতঃ এই ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ কোনভাবেই সুরক্ষিত হতে পারে না।

বুর্জোয়া ব্যবস্থার আপাতসত্য ও নির্মম বাস্তবের এই দ্বন্দ্বকে নিরসন করার জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস আহ্বান জানিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব, বিকল্প ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব। এই ব্যবস্থাকেই মার্কস সর্বহারার একনায়কত্ব আখ্যা দিয়েছিলেন। এই একনায়কত্ব গোড়ার দিকে অবশ্যই হিংসাত্মক হতে পারে, কারণ যতদিন পর্যন্ত অপসৃয়মান পুঁজিবাদের প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা বজায় থাকবে, বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বশর্তরূপে তাকে প্রতিহত করার জন্য দমনমূলক নীতিরও প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই একনায়কত্বই হবে, লেনিনের ভাষায়, গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম রূপ, কারণ এর প্রধান ভূমিকাটি হবে গঠনাত্মক, দমনাত্মক নয়। তার অর্থ একটাই ; এটি হবে এমনই এক ব্যবস্থা যেখানে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে সমাজ ও প্রশাসনের সর্বত্র শ্রমজীবী জনগণ ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে, নির্ধারণ করবে তাদের নিজস্ব সমাজ ও তার ভবিষ্যতকে। সক্রিয় অংশ গ্রহণের এই সুযোগই তাদেরকে দেবে প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদ। প্রশাসন জনগণকে নয়, জনগনই প্রশাসনকে নির্দেশ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে। গণতন্ত্রের এই সমষ্টিগত ব্যাপকতাকেই মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন পারী কমিউন প্রসঙ্গে ১৮৭১ সালে রচিত 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' রচনায় ; অসফল ও অসম্পূর্ণ হলেও এই কমিউনই ছিল

সর্বহারার গণতন্ত্রের প্রথম রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। পরবর্ত্তীকালে লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পুস্তিকাতেও সোভিয়েত সংক্রান্ত ধারণাটির যে ব্যাখ্যা করেন, তার মূল উৎস ছিল পারী কমিউন। রুশ বিপ্লবের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লেনিন তাঁর শেষ পর্বের রচনাতেও বারে বারেই প্রশাসনের সর্বস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পার্টির দায়বদ্ধতা, তৃণমূল স্তরে সোভিয়েতকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করার কথা বলেছিলেন। এই একই প্রশ্নকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অকুতোভয় নেত্রী রোজা লুকসেমবুর্গ ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আন্তোনিও গ্রামশচি।

পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী তাই আমাদের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেটি অনেকটা এই রকম: সমাজতন্ত্রকে উজ্জীবিত করার জন্য প্রয়োজন হোল চিরায়ত মার্কসবাদের গভীরে নিহিত গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে উদ্ধার করা এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা। এই দিকটিকে প্রায় উপেক্ষা করে প্রায় একতরফাভাবে কেন্দ্রীকতাকে প্রশ্রয় দেবার ফলেই পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রশ্নটি এত বড় আকার ধারণ করে। সেই সঙ্গে এ কথাও ভাবার সময় এসেছে যে গণতন্ত্রের প্রকৃত বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করার জন্য শুধুমাত্র মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনার দিকে নয়, আমাদের মুখ ফেরাতে হবে এই ধারারই সার্থক উত্তরসাধক, যেমন রোজা লুকসেমবুর্গ ও আন্তোনিও গ্রামশচির চিন্তার দিকে, যাঁরা ভিন্ন পটভূমিতে মার্কসবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্কটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুই.

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা :

পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীকে যদি শুধুমাত্র প্রয়োগের ব্যর্থতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে এ কথা মেনে নিতে হয় যে তত্ত্ব হিসেবে সনাতনী মার্কসবাদ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধারণা যেখানে কোন ফাঁক থাকার অবকাশ নেই। এই ধারণাটিরও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন, কারণ অন্ততঃ দু'টি কারণে এই বক্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না। এক, মার্কসবাদের চরিত্র যদি প্রকৃত অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীলতার স্বার্থেই এই তত্ত্বের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজন। দুই, তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদ বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে জড়িত দু'টি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে। প্রথমটি ক্ষমতা

CENTRAL LIBRARY

দখলের প্রশ্ন ; দ্বিতীয়টি ক্ষমতাকে একটি নতুন, গণ-চরিত্র দেবার প্রশ্ন। তাত্ত্বিক বিচারে উভয় ক্ষেত্রেই সনাতনী মার্কসবাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বোধ হয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে ক্ষমতা দখলের তত্ত্ব হিসেবে, জনতাকে সংগঠিত করে বিপ্লবকে সম্পন্ন করার স্ট্র্যাটেজি হিসেবে মার্কসবাদের বৈধতা যেমন ইতিহাসে বারেবারেই প্রমানিত হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে, ক্ষমতাকে গুণগতভাবে একটি সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র-প্রদানের প্রশ্নটি কিন্তু অনেকাংশেই অমীমাংসিত রয়ে গেছে। মার্কসবাদের মূল প্রবক্তাদের, এমন কি লেনিনেরও সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বাস্তব রূপায়নের অভিজ্ঞতা ইতিহাসগত কারণেই অনুপস্থিত ছিল। তাই এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে তাঁদের পক্ষে বিকাশমান সমাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রটি কি হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনা করা ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব ছিল না এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যে অসম্পূর্ণতা থাকতেই পারে।

এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পুঁজিবাদের সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর্বে নয়, পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ যুদ্ধোত্তর যুগে, ধনতন্ত্র নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শগত চিন্তার বিকাশের মাধ্যমে। প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে পুঁজিবাদ তার অর্থনৈতিক সংকটের যেমন মোকাবিলা করেছে, তেমনই সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্বকে অনেকাংশেই সুনিশ্চিত করা হয়েছে ধনতন্ত্রের সনাতনী মতাদর্শে অতি সূক্ষ্ম ও চতুরভাবে নতুন মাত্রা যোগ করে। 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র', 'গণমুখী পুঁজিবাদ', 'এক ও অভিন্ন শিল্পোন্নত সমাজ' প্রভৃতির ধারণার মাধ্যমে একদিকে যেমন পুঁজিবাদকে একটি মানবতাবাদী, জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে, তেমনই অপরদিকে রুশ বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সমাজতন্ত্র,মার্কসবাদ,সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নানা কায়দায় অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে জনগণকে বিপথে চালিত করার অবিরাম চেষ্টা চলেছে। মতাদর্শ হিসেবে পুঁজিবাদের সাফল্য এখানেই যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার শোষণের চরিত্রকে আড়াল করে অনেকাংশেই নিজেকে একটি ভোগবাদী সমৃদ্ধশালী ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার আকর্ষণের ব্যাপ্তি গ্রাস করেছে শুধুমাত্র পশ্চিমের নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষকেও। একই সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করে লাভ নেই

যে প্রতিষ্ঠিত বা ফলিত সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সাধারণভাবে জনমানসে শেকড় গাড়তে পারে নি। পুঁজিবাদের আপাতমুক্ত ভোগবাদী, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য মণ্ডিত পরিমণ্ডলের পাশাপাশি, সমাজতন্ত্র চিত্রিত হয়েছে যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট, বৈচিত্র্যহীন, কর্তৃত্বমূলক, সর্বোপরি অগণতান্ত্রিক ও অদক্ষ এক ব্যবস্থা হিসেবে।

এই ব্যর্থতার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন হোল শুধুমাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা নয় : মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদকে যদি সামগ্রিক-ভাবে মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা যায়, এবং যার জন্য প্রয়োজন হোল মতাদর্শগত সংগ্রামের স্তরে মার্কসবাদী চিন্তায় নতুন মাত্রা সংযোজন করা, একমাত্র তবেই মননের স্তরে পুঁজিবাদের আগ্রাসী ও বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী প্রভাবকে প্রতিহত করা সম্ভব। সনাতনী মার্কসবাদের কতকগুলো ধারণা ও নীতিকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে বা চিরায়ত মার্কসবাদকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবনা হিসেবে মেনেনিলে মতাদর্শগত তত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন বা গুরুত্ব অনুভূত হবে না। লেনিনোত্তর পর্বে কার্যতঃ মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ঘটনাটাই ঘটেছে, ও যার ফলে সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে সৃষ্টি-বিমুখতাই যেন আজ মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তার জন্য প্রয়োজন হোল প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বের স্তরে মার্কসবাদের বিকাশ ঘটানো। এই জায়গায় সনাতনী মার্কসবাদে অসম্পূর্ণতা ইতিহাসগত কারণেই রয়ে গেছে এবং এখানেই পরবর্তী প্রজন্মের ওপরে দায়িত্ব এসে পড়ে যে কিভাবে এই কাজকে সম্পূর্ণ করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যেতে পারে। ক্ষমতা দখলের স্তরে স্বাভাবিক কারণেই পার্টির ধারণাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু বিকাশমান সমাজতন্ত্রেও যদি কার্যতঃ পার্টিই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্যকে আত্মসাৎ করে বা পার্টি ও প্রশাসনের সীমারেখা বস্তুতঃ অবলুপ্ত হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রকে ক্রীয়াশীল রাখা বা তাকে যথার্থ রূপ দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর অন্যতম কারণ হোল এই যে, মার্কসবাদের বুনিয়াদী তত্ত্বে পার্টি-নিরপেক্ষভাবে কোন সংস্থারই প্রতিষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নটি বিচার করার অবকাশ ঘটে নি। পরবর্তীকালে এই জায়গায় তত্ত্বগত সংযোজনের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল এবং সে কাজ না হওয়ায় আজ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে পার্টির প্রায় সার্বভৌম অস্তিত্বের ধারণাটিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একইভাবে বলা যেতে পারে যে মার্কসবাদকে শুধুমাত্র পার্টি মতাদর্শ হিসেবে না দেখে মানুষের

CENTRAL LIBRARY

মননপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে যুক্ত করে তাকে সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে পরিণত করার যে প্রয়োজন ছিল, সে কাজও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মার্কসবাদের আকর্ষণ ক্রমহ্রাসমান। আজকের পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। সনাতনী পদ্ধতিতে মার্কসবাদকে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ও পার্টির মতাদর্শরূপে গণ্য করে আজ আর এগুনো সম্ভব নয়। বুর্জোয়া মতাদর্শের কাছে আত্মবিক্রয় করে নয়, বুর্জোয়া সভ্যতার মানবতাবাদী অবদানের সঙ্গে ইতিহাসে গণ-সংগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অন্বিত করে মার্কস-বাদকে একটি সুষ্ঠু, সজীব ধারণা হিসেবে ও সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতিপন্ন করার মতাদর্শগত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার প্রয়োজন এখন দেখা দিয়েছে। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ মতাদর্শগত চিন্তার বিকাশসাধন করে যেমন আজ এক বুর্জোয়া সভ্যতার জন্ম দিয়েছে এবং যার পরিমণ্ডলে বাঁধা পড়েছে বিশ্বের একটা বড় অংশ, তার সুদৃঢ় কাঠামোকে ভাঙতে হলে মার্কসবাদেরও দায়িত্ব হোল আদর্শগত স্তরে চিন্তার উন্নতি ঘটিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা; অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাকে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম রূপ হিসেবে মননের স্তরে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রস্তাবনা :

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে তা যুগপৎ আশা ও হতাশার উদ্রেককারী। একদিকে বলা যেতে পারে, মতান্ধতা ও যান্ত্রিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে মার্কসবাদকে একটি সার্থক, গঠনমূলক বৈপ্লবিক আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করার ও তার মানবতাবাদী, গণ-তান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অনেক অজানা, অলিখিত তথ্য আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ব্যক্তিপূজা ও ইতিহাস-বিকৃতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করার যে সম্ভাবনা আজ উন্মোচিত হয়েছে, তার জন্য অবশ্যই বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব ধন্যবাদার্হ। আমলাতান্ত্রিক অচলায়তনের বেড়াজাল থেকে সমাজতন্ত্রকে মুক্ত করার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কিন্তু বাস্তবে এই সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্য যে বিকল্পগুলি ভাবা হচ্ছে বা যে ধরনের ভাবনাচিন্তা ক্রমশই প্রাধান্য বিস্তার করছে, তা দেখে শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয়। বাজার-অর্থনীতি, পুঁজিবাদের অনুকরণে এক ধরণের বহুত্ববাদী ব্যবস্থা, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের প্রায় অবলুপ্তিকরণ প্রভৃতি ধারণার প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র সম্ভবত এক নতুন সংকটের মুখোমুখি হতে চলেছে। গ্লাসনস্ত ও গণতন্ত্রের নামে যদি অপসংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্রবিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় অথবা মানবতাবাদ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্বকে চিহ্নিত করতে গিয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রকে উপেক্ষা করা হয়, কিংবা অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে যদি এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যেখানে নতুন করে বেকারীত্ব, অনিশ্চয়তা, মূল্যবৃদ্ধি বিপ্লবের সত্তর বছর পরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই বিকল্পকে গ্রহণ করতে শংকা জাগে, দ্বিধা বোধ হয়।

মার্কসবাদকে যদি প্রকৃত অর্থে-ই সৃষ্টিশীল প্রতিপন্ন করতে হয়, তবে অবশ্যই প্রয়োজন আছে সংস্কারের ; কিন্তু সে সংস্কার যদি সংস্কারবাদের পথ ধরে অগ্রসর হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রশ্রয় পাবে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির যে সম্ভাবনা আজ উন্মোচিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে যদি সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা না যায়। এই প্রশ্নের সঠিক সমাধানের ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর করবে মার্কসবাদেরও ভবিষ্যৎ। সমাজতন্ত্রকে ত্বরান্বিত করার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা যদি কার্যতঃ বিপ্লববিমুখতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়বে বই কমবে না।

CENTRAL LIBRARY

সমকাল ও বল্টিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সংকট

ড. পূরবী রায়

বলটিক সমুদ্রের তীরে যে জাতি বসবাস করতে শুরু করে এই সমুদ্রের নামেই তাদের নামকরণ হয় বলট্, আর যে ভাষা তারা ব্যবহার করত তা হোল বলটিক —আর এই বলটিক ভাষার অন্তর্গত ছিল প্রাচীন প্রুশিয় (Old Prussian), লিথুয়নীয় (Lithuanian) লেটিশ (Lettish) কিউরেনীয় (Curonian) সেমিগালিও (Semigallian) এবং সেলিয় (Selian)। এই ভাষাগুলির মধ্যে যথাক্রমে লিথুয়নীয় ও লেটিশই বর্তমানে প্রচলিত। অন্যগুলি মৃত। বলটিক সংস্কৃতি আদিম যুগ থেকে এবং প্রাচীন ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে গড়ে উঠলেও ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। এই জাতির লোকেরা বসবাস করত এমন এক জায়গায় যেখানে এককালে নানা গাছের সমারোহ ছিল (যদিও এখন পাইন ও বার্চ প্রাধান্য পেয়েছে)। বনের মধ্যে নানা ধরনের পাখী, হাঁস, আর তার সাথে মাছ, ব্যাঙের ছাতা, বাদাম, মধু এবং নানা প্রকার বেরী—তাদের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়ক ছিল। এছাড়া ছিল বলটিক সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাওয়া এ্যামবার—সারা ইউরোপে যার চাহিদা মেটানো ভার। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই এ্যামবার বেচাকেনার মাধ্যমে বলটিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে এক নতুন রূপ নিতে থাকে এবং ক্রমশ এক বিরাট প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় যার প্রভাব উত্তর-পূর্ব ইউরোপে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

৪র্থ-৫ম খ্রীষ্টাব্দ থেকে বলটিক সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। তার কিছু আগে থেকে স্লাভরাও আস্তে আস্তে বলটিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১২শ খ্রী: এমন কি তার পরেও এই ঘটনা ঘটতে থাকে। বলট্‌রা যুগ যুগ ধরে ধরিত্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে নিজেদের এমন চমৎকার ভাবে লাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল যে তাদের জীবনপ্রণালী ভাষা, বিশ্বাস, আচার-বিচারে পরিবর্তনের লক্ষণ খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐকতানের সুর মেলে। বলট্‌দের গানের ঝোঁক ভীষণ; সমবেত ও সংঘবদ্ধ সুরধ্বনি তাদের একতাকে একসূত্রে বেঁধে রাখার আশ্বাস দিয়েছে—দিয়েছে এই

পার্থিব জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ; আর তার সঙ্গে এই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ পার্থিব জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তুলেছে। এর থেকে যে পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাস এসেছে তাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যকে তারা উপাসনার বস্তু করে তুলেছে—যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, বজ্র-বিদ্যুৎ। এমন কি পাখী ও ব্যাঙকেও তারা দেবতারূপে বন্দনা করেছে। পৃথিবী, ভূমি, জল, তেজ সবই তাদের কাছে দেবতা—ইন্দো-ইউরোপীয়দের ধর্মভাবের লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়—বিশেষত ইন্দো-ইরাণীয়দের মৃতের প্রতি আচার অনুষ্ঠান ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রীতির সঙ্গে বলটিক আচার অনুষ্ঠানের গভীর মিল আছে। একদিকে ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ৮
ব্যোম, সর্প, অশ্ব অপরদিকে সুজলা সুফলা ধরিত্রীর প্রতি আদিম যুগ থেকে আকর্ষণ, তার বনজ সম্পদ, বৃক্ষরাজি ফুল ফলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলটিক সংস্কৃতিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। দেখা যায় যে, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়ার কবি শিল্পী সুরকারের মনে গীত ও কাব্য যেন রসময়ভাবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের স্থাপত্য মূলত কাঠের—কাঠের মন্দির; গীর্জা, মঠ—সবতেই কাঠের ব্যবহার দেখা যায়—যা আজও এক বিশেষ শিল্পরূপে গড়ে উঠছে।

মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের লোকের মত বলট্‌রা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। এক স্থান থেকে অপর স্থানে বসতি পরিবর্তনের ফলে অন্যদের প্রাচীন সংস্কৃতি বহুলাংশে লোপ পেয়েছে—বলট্‌দের ক্ষেত্রে তা হয় নি। ইন্দো-ইউরোপীয় লোকগাথা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তারা তাদের সংস্কৃতির শিকড়কে ধরে রেখে আবহমানকাল বহন করেছে। এতে কোন বিচ্ছেদের রেখা পড়েনি—এমন কি এই অনুভূতি-প্রবণতার মাধ্যমে তারা মাঝে মধ্যে নিজেদের মনে করেছে প্রাচ্য থেকে আগত। এশিয়া মহাদেশ থেকে আগত এমন কি ভারত থেকে এসেছে এমন চিন্তাকেও সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারে নি।*

প্রাচীন বলট্‌দের কোনো লিপি পাওয়া যায় না—প্রস্তর বা গাছের ছালে কোনো লিপির সন্ধান পাওয়া যায় নি, যেমন পাওয়া যায় গ্রীক, ল্যাটিন জার্মানিক ও শ্লাভ লিপির ক্ষেত্রে।

ফ্রান্জ বপ্, ১৮১৬ সালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পরিচয় দেন। দেখা যায় লিথুয়নীয় ও সংস্কৃতের মধ্যে মিল আছে। যেমন, 'Dievas davė dantis ; Dievas duos duonos' (লিথুয়নীয়)

---

* **Bolts and the Aryans in their Indo-European Bakground :**
Dr. Suniti Kumar Chatterjee

Devas adadāt datas ; Devas dāt (or dadat) dhanās (সংস্কৃত)
(God gave the teeth ; God will give bread)
(ঈশ্বর দন্ত দিয়েছেন ; ঈশ্বর রুটি (ধন) দেবেন)

A. Schleicher-এর লিথুয়নীয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। ইন্দোইউরোপীয় তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৬১-তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিদ K Brugmann, A Meillet, F. de Soussure A. Leskien এবং সেই সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুনীতিবাবু 'দাইনা' (daina) বলটিক সাহিত্যে খ্রীষ্ট ধর্মের আগের চিত্র পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন। 'দাইনা' প্রথম লোকসাহিত্য যা শ্রুতির মাধ্যমে এক যুগ থেকে অপর যুগে প্রচারিত হয়েছে। সুনীতিবাবু বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে যেমন বেদমন্ত্রে লোকগাথার মাধ্যমে সমকালীন সমাজচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে 'দাইনা'ও অনুরূপ লিথুয়নীয় লোকগাথা।

বলটিক ও সংস্কৃত এমন দুটি ভাষা যা পৃথিবীর দুই প্রান্তের ভাষা হয়েও তাদের ইন্দোয়োপীয় উৎসকে চিনিয়ে দেয়। লিথুয়নীয় ও সংস্কৃত বহু শব্দের উদাহরণ থেকে এ সত্য জানা যাবে :

লি. Sesuo / স. Svásā (ভগ্নী), লি. naūyas / স. návyas (নূতন),
লি. Senas / স. Ṣánas (পুরানো)
লি. Šimtos / স. Śatam (একশত), লিঃ javai / স. yávas (শস্য),
লি. Sparnas / স parnam (ডানা, পক্ষ), লি nāgas/স. nakhām (নখ)

এমন কি রুশ নদীর নাম ভল্‌গা, মাসক্‌ভা, কামা এই সব শব্দ Finno-ugric গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোনো কোনো ভাষাবিদের মতে ভল্‌গা শব্দ বলটিক শব্দ জিলগা (Jilga) জাত যার মানে লম্বা নদী। লিথুয়নীয় jilgas-ilgas মানে দীর্ঘ, লম্বা, হয়তো তাই থেকেই লম্বা নদী।

একটা জাতির সংস্কৃতিকে ধরে রাখবার জন্য ভাষা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারো কারো মতে অবশ্য ভাষাই সংস্কৃতির মুখ্য সম্বল কিন্তু এ মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না—ভাষা সংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে কিন্তু একক বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হতে পারে না। সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় নৃতত্ত্বের বিচারে ও ঐতিহাসিক বিকাশ বা সম্প্রসারণ লক্ষ্য করে। ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে দেখা যায় ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে জার্মান সামরিক যোদ্ধারা

যখন পূর্ব ইউরোপের দিকে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাদের দুটি সাফল্য লক্ষণীয়ঃ দেশ-বিজয় এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়াস। কিন্তু লিথুয়নীয়গণ এই আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল ; বরং রুশ রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা তাদের সীমান্ত বাড়াতে থাকে। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো ও লিথুয়ানিয়ার যৌথ উদ্যোগে বলটিক সমুদ্রতীর থেকে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত রুশ আধিপত্য বিস্তৃত হতে পেরেছিল। রুশদের সাংস্কৃতিক মান ও তার সঙ্গে জাতিগত আধিক্য থাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রুশেরাই নেতৃত্ব পেয়ে যায়। ১৩৮৬ খ্রীঃ লিথুয়ানিয়ার রাজকুমার জোগাইলা যখন পোল্যাণ্ডের রাণী জাৎভিগাকে বিবাহ করেন এই বিবাহ বন্ধনসূত্রে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে লিথুয়ানিয়ার রাজা ধর্মান্তরিত হন, তখন থেকেই লিথুয়ানিয়ায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রবর্তন হয়।

১৫শ ও ১৬শ শতকের ইতিহাসে দেখা যায় লিথুয়ানিয়া সম্পূর্ণভাবে পোলিশ চুক্তি বদ্ধ এবং পোলিশ রাজনৈতিক শাসন-অধীনে। ১৮৬৩ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁর রাজ্যপাল নিয়োগ করেন মিখাইল নিকোলাইয়েভিচ্ মুরাভিয়োভকে এবং লিথুয়ানিয়ার আধিপত্যের প্রতি পোলিশ বিদ্রোহ সমূলে উৎখাত করার আদেশ দেন। এই কাজে সাফল্য লাভ করে মুরাভিয়োভ প্রাথমিক প্রচেষ্টা চালান যাতে লিথুয়ানিয়া থেকে পোলিশ-ল্যাটিন প্রভাব দূর হয়ে রুশ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। লিথুয়ানিয়াকে পোলিশ সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত করতে গিয়ে তিনি ক্যাথলিক স্থাপত্য থেকে শুরু করে ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর উপরই আঘাত হানেন। বহু গীর্জা মঠ ধ্বংস করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে বহু অর্থ ব্যয় করে রুশ অর্থডক্স গীর্জা ও মঠের প্রতিষ্ঠা হয়—দেখা যায় ব্যাপারটা এমন যে, যা কিছু ক্যাথলিক তা পোলিশ এবং যা কিছু অর্থডক্স তা রুশ। এর সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার উচ্ছেদ চলল এবং কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষাব্যবস্থায় ল্যাটিন তুলে দিয়ে রুশভাষা ব্যবহৃত হতে লাগল।

অবশ্য শক্তিবলে ল্যাটিন উচ্ছেদ করে রুশ নিয়ে এলেও লিথুয়ানিয়ার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হোলো না। এত সত্ত্বেও লিথুয়ানিয়া তার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পারল। লিথুয়নীয়দের ইতিহাসেই দেখা গেছে তাদের ভাষার প্রতি এক আকর্ষণ কারণ যে ভাষার মধ্যে শ্রুতির লোকগাথা দানা বেঁধেছে তাকে এত সহজে সেই মূল থেকে বিচ্যুত করা যায় না। ১৮ শতকে লিথুয়নীয় বহু রচনাসম্ভার লিথুয়নীয় ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই

CENTRAL LIBRARY

ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে তা খুঁজে পেলেন যা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। দ্বিতীয়ত, লিথুয়নীয়দের প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ (হয়তো বা ভাষার এমন শক্ত শিকড়ের দরুনই) তাদের রুশ প্রভাব সহজে স্বীকার করতে দেয় নি। সুতরাং মুরাভিয়োভ শত চেষ্টা করলেও জাতীয়তাবাদের মূলকে উৎপাটন করতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিথুয়নীয় জাতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, লোকসাহিত্য জাতীয়তাবাদ এইসব বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে লিথুয়নীয় লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য শুধু উচ্চমানের নয়, তার সঙ্গে আদিযুগ থেকে জাতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য ধারা বয়ে চলেছে।

১৮৩২ সালে লিথুয়নীয় ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়—আউজ্‌রা (Auszra)—লিথুয়নীয় জাতীয় পত্রিকা বা মুখপত্র, যার মাধ্যমে লিথুয়নীয় জাতি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে। অপরদিকে ১৯ শতকের শেষার্ধে বহু নিষিদ্ধ বিদেশী সাহিত্যপত্রিকা ও বই-এর আগমন তাদের আরো সচেতন করে তোলার পথ সুগম করে দেয়। এইরূপ এক পরিস্থিতিতে আর অপরদিকে রুশ জাপান যুদ্ধের দামামায় ১৯০৪ সালে ল্যাটিন অক্ষরের ব্যবহারের পুনঃ প্রবর্তন হয়। লিথুয়ানিয়া কি তার ভাষার সুপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়াসী ছিল? তাদের জাতীয়তা-বোধ কি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নতুন কোন বিন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল? নাকি রুশ সাম্রাজ্যবাদের যোগান দেওয়া আন্তর্জাতিক কাঠামোকে স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? যখন লিথুয়ানিয়ায় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯০৫ সালে তিনটি প্রধান পার্টির জন্ম হয় তখনকার ও বর্তমানের পরিস্থিতি আমাদের সতর্কতার সঙ্গে বিচার করতে হবে।

১৯১৪ সালের ১লা আগস্ট জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তার পাঁচ দিন বাদেই অষ্ট্রিয়া। ১৯১৫ সেপ্টেম্বরে জার্মানরা পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া দখলে আনে এবং ১৯১৭-য় রিগা। এদিকে ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার স্থাপিত হওয়ায় বহু অপেক্ষমান শান্তি ডিক্রি ঘোষিত হল যাতে বলা হল যুদ্ধরাজ দেশগুলি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করবে "কোনো সংযোজন না করে নিরপত্তার মাধ্যমে"। সেই সময় লিথুয়ানিয়া যখন তার স্বাধীনতার প্রশ্ন রাখল তখন নানা বিতর্কের ও মতান্তরের মাধ্যমে ১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ব্রতস্ক ব্রেসট শহরে "no war no peace"

ঘোষণা করলেন এবং তখনই ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ সালে লিথুয়ানিয়া স্বাধীনতা পেল।

বহুযুগ ধরে ল্যাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া একই প্রকারে শোষিত হয়েছে বলে মনে করে। এই দুটি দেশের ধর্ম এক তবে তাদের জাতীয় ও অর্থনৈতিক ঘৃণা রুশদের প্রতি তত ছিল না যত ছিল বলটিক জার্মানদের প্রতি। ভৌগোলিক দিক থেকেও দুদেশের সাদৃশ্য প্রচুর। দুদেশেরই বলটিক সমুদ্রকূলবর্তী দুটি বড় বন্দর আছে। রুশ সাম্রাজ্যের অংশ এ দুটি দেশেরই পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী ছিল। তবে যে দুটি প্রধান তফাত তা হোলো জাতি এবং ভাষা। তবে এটা ঠিক যে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়া এই তিনটি রাজ্যের পক্ষে এমন শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশে থেকে সুকৌশলে স্বাধীনতা বাঁচিয়ে চলা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন ছিল। ১৯১৯-১৯২০-তে তাদের পৃথক সত্তা খুঁজে পাবার একমাত্র কারণ বোধহয় রাশিয়া এবং জার্মানি দুটি শক্তিই প্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের অসহায়তার সুযোগ নিতে সেই সময় ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানরা পিছপা হয়নি। জার্মানি ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত অভিযান ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবতারণা করে।

উনিশ-বিশ শতকের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হোল লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক অনেক বেশী বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল যা ল্যাটভিয়া বা এস্তোনিয়ার সঙ্গে ছিল না। এর প্রথম কারণ লিথুয়ানিয়ার উপর পোল্যাণ্ডের চাপ সৃষ্টি হওয়া এবং দ্বিতীয়ত লিথুয়ানীয় বিখ্যাত কবি বালক্রশায়িতিস (রুশকবি আলেকজান্দার ব্লক গোষ্ঠীর), যিনি মস্কোয় লিথুয়ানীয় দূতের কাজ করেছেন। তাঁর প্রভাব ১৯০০ দশকের রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তিরিশের দশকে রাজনৈতিক চিত্র আরো সমস্যা-জড়িত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দেয় তার প্রতিফলনে বলটিক রাজ্যগুলিকে আরো বেশী করে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষত লিথুয়ানিয়াকে। তার এসকল সমস্যা ছাড়াও ক্লাইপেদা অংশ নিয়ে জার্মানদের সঙ্গে বিবাদ ছিল। এই বিবাদের হয়তো খানিকটা সুরাহা হত যদি জার্মানদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হতো। কিন্তু তা না হয়ে ১৯০৩ সাল থেকে সম্পর্কের অবনতিই হতে লাগল।

১৯৩৪ সালে দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব জেলাগুলিতে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ

CENTRAL LIBRARY

এবং ১৯৩৫ সালে জার্মান লিথুয়নীয় সম্পর্কে ছেদ পড়ল। ১৯৩৪-৩৫ সালে ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় নতুন আইন জারি হল যে জার্মান ভাষায় কোন স্থান নাম বা বিজ্ঞপ্তি লেখা যাবে না। সব জায়গায় জার্মানীর পরিবর্তে ল্যাটভিয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এর পরিণামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বলটিক দেশগুলির সুসম্পর্ক পরিলক্ষিত হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি বলকটিকের সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে জার্মান ও সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলটিক দেশগুলির প্রতি মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে। ক্লাইপেদা অংশ নিয়ে জার্মান লিথুয়নিয়ার সম্পর্ক অমীমাংসিত থাকে এবং বলটিকের এই সমস্যা জাতিসঙ্ঘের কাছেও পীড়াদায়ক হয়ে ছিল এবং এই জট ছাড়াতে জাতিসঙ্ঘ অপারক ছিল।

জার্মান লিথুয়নিয়া সমস্যা একদিকে ঘোরতর আকার ধারণ করেছিল অপরদিকে ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মান গোষ্ঠীর প্রতি ল্যাটভিয় ও এস্তোনিয়দের অবিচারের ফলে জার্মানী এই দেশগুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবার চেষ্টা করে। বাণিজ্যিক বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে বলটিক দেশগুলি থেকে জার্মানীই বেশি পণ্যদ্রব্য আমদানী করত যতটা না তারা। এইসময়ে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে এস্তোনিয়া জার্মানদের কিছুটা কাছাকাছি যেতে পেরেছিল। ল্যাটভিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় তার ঝোঁক সোভিয়েতের দিকে ; কারণ রুশ-সংস্কৃতি ল্যাটভিয়াকে অনেক বেশী আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে মস্কো শুধুমাত্র লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কথা না ভেবে এই তিন বলটিক রাজ্যের সার্বভৌমত্বের কথা চিন্তা করে। তিনটি দেশ যে একসূত্রে গ্রথিত সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ১৯৩৭ সালে রুশ মার্শাল ইগোয়োভকে (অবশ্য তিনি আসার পূর্ববর্তী বছরে এই তিন রাজ্যের প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নে আসেন সোভিয়েত প্রতিনিধি হিসাবে) এই তিন বলটিক দেশে পাঠানো হয়। ১৯৩৮-১৯৩৯ এ আন্তর্জাতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বলটিক দেশগুলিতে দুর্যোগের ঘন মেঘ ঘনিয়ে আসে—শুরু হয় এক দিকে স্প্যানিশ আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ যা সোভিয়েত ও জার্মানীর নীতিগত সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করে তুলে ; অপরদিকে অষ্ট্রিয়ার সহযোগিতা মধ্য ইউরোপে হিটলারের পথ সুগম করে যাতে জার্মান-পোলিশ সক্রিয়তা বলটিক দেশগুলির উপর দেখা দেয়।

১৯৩৯ সালে বলটিক নিরাপত্তা এক সঙ্কট মুহূর্তে উপনীত হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না থেকে

লণ্ডন, প্যারিস, মস্কোর সম্মিলিত ভূমিকায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ও বলটিক দেশগুলি সামরিক চুক্তিবদ্ধ হয় এবং ১৯৪০ সালে এই তিনটি রাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন করে। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ সাম্রাজ্যের হারানো বলটিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

লিথুয়ানিয়া ১৯৪০-র ৭ই আগস্ট সরকারীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তখন থেকে তার জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ লিথুয়নীয়। তার পরই রুশ, পোলিশ, বেলোরুশীয়, ইউক্রেনীয় ও ইহুদীর সংখ্যা। ১৯৫০ সাল থেকে স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে আন্তঃপ্রজাতান্ত্রিক বৈবাহিক সংমিশ্রণ তেমনভাবে দেখা যায় না। রুশ, ইহুদী ও পোলিশ এদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে উঠলেও অর্থাৎ সোভিয়েতের ইউরোপীয় অংশের সঙ্গে যদিও তা দেখা যায় কিন্তু এশিয় অংশের সঙ্গে উল্লেখ করার মতন বৈবাহিক আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। এতে গত সত্তর বছরে এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের কোনো বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নি।

অপরদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সোভিয়েত ইউনিয়নে লিথুয়ানিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে—বিদ্যুৎশক্তি, প্রযুক্তি ও সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট উন্নতি সাধনও করেছে। লিথুয়নিয়ায় খনিজ সম্পদ নেই; এ-রাজ্য প্রধানত কৃষিভিত্তিক এবং সেই জন্য সোভিয়েত সরকার তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার সুযোগ দিয়েছে। তবে শক্তি যেমন গ্যাস, তেল ও কয়লা যা উৎপাদনের সহায়ক তার জন্য তাকে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া সমুদ্র উপকূলে উন্নত মানের মৎস্য শিল্পের চাষ হয়—বলটিক বারেন্ট ও আটল্যান্টিকে এক মৎস্য বন্দর করা হয়েছে যেখানে কড, হেরিং, প্রাটের বেচাকেনা চলে। এখানে খনিজ দ্রব্য না থাকায় কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে; এছাড়া আছে পশুপালন এবং দুগ্ধজাত ও নানাধরনের মাংস প্রস্তুতির কারখানা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অবদান এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে—কারণ প্রথমেই বলেছি বলটিক সংস্কৃতি বিশেষত লিথুয়নীয় ভাষা, সাহিত্য, লোকগাথা যুগ যুগ ধরে এই জাতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং সেই মূল উৎপাটন করা কখনই কোন শক্তি প্রয়োগেও সম্ভব নয়। তার লোকগাথা, গানের চর্চা সোভিয়েত সরকার অবহেলা করে নি; তাই দেখা যায় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভিলনিয়াস শহরে গানের উৎসব হয়—

যেখানে এক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পুরানো ও নতুন তানে সুর জেগে ওঠে। তেমনই লোকগাথা আজও কৃষকের ঘরে ঘরে মুখে মুখে ফিরছে—তার কাঠের ঘরের কোণে আজও পুরানো সুর বাজে। ধর্মে এরা রোমান ক্যাথলিক।

ল্যাটভিয়া ৫ই আগস্ট ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সরকারী-ভাবে যুক্ত হয়। এখানকার জনসংখ্যার ৯০ ভাগ ল্যাটভিয়; তারপর রুশ বেলোরুশিয়, ইউক্রেনীয়, পোলিশ, লিথুয়নীয় ও ইহুদীর সংখ্যা। সংখ্যা অনুযায়ী দেখা যায় যে যদিও লিথুয়নীয় ও ল্যাটভিয় এক গোষ্ঠীর ভাষা কিন্তু জনসংখ্যার যথাক্রম চিত্রে ল্যাটভিয়ার পরেই রুশের স্থান। এখানে খনিজ সম্পদ মোটামুটি ভাবে থাকায় তা শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ল্যাটভিয়ায় প্রস্তুত বাস ও ট্রাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক অতি উচ্চমানের 'দাইনা' লোকগাথার মাধ্যমে ল্যাটভিয়ার লোকগীতি তার সাহিত্য-জগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে সেই সঙ্গে সমৃদ্ধি পেয়েছে লোকশিল্প ও হস্ত-শিল্প। ধর্মে এরাও রোমান ক্যাথলিক।

এস্তোনিয়া সরকারীভাবে ৬ই আগস্ট ১৯৪০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে সঙ্গে যুক্ত হয়। এস্তোনিয়দের এক বৈশিষ্ট্য যে ৭২,০০০ এর বেশী এস্তোনীয় তাদের প্রজাতন্ত্রের বাইরে সোভিয়েতের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে বাস করছে; আর এস্তোনীয় প্রজাতন্ত্রে জনসংখ্যার দিক দিয়ে এস্তোনীয়র পরে যথাক্রমে বেলেরুশীয়, ইউক্রেনীয়, ফিরন্, ইহুদী ও ল্যাটভীয়দের স্থান। এস্তোনিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ পৃথিবী খ্যাত **Oil Shales** organic substances. সুতরাং এখানে উৎপন্ন শক্তি নিজের প্রজাতন্ত্রে ব্যবহৃত হয়েও উদ্বৃত্ত শক্তি অন্যান্য প্রজাতন্ত্রেও রপ্তানী হয়ে থাকে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে Textile industries-এ উন্নত মানের বোনা সামগ্রী উৎপাদিত হয়। কৃষির মানও খুব উন্নত এবং খনিজ সম্পদ খুব বেশী না থাকায় কৃষির উন্নতিতে অধিক নজর দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতির মান ৩৫০ বছরের প্রাচীন তারতু বিশ্ববিদ্যালয় ধরে রেখেছে—যা উচ্চমানের গবেষণা কেন্দ্র। ভাষা ও জাতিগত দিক থেকে লিথুয়নীয় ও ল্যাটভীয় ভিন্ন। একশ বছরের বেশী প্রাচীন লোকগীতির অনুষ্ঠান এদের জাতীয় সম্পদ।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম নিশানা উড়িয়েছে লিথুয়ানিয়া এবং অনুরূপ বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়াস ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়া প্রকাশ করেছে; কারণ এরা বরাবরই এক সূত্রে গ্রথিত। এস্তোনিয়া জাতি ও ভাষার দিক থেকে ভিন্ন হলেও ধর্মে এক। বর্তমান বিশ্বে যে

বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জাতীয়তাবাদ যা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে সংযুক্তভাবে প্রকাশের মাধ্যম। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পেছনে আছে স্বরাজ লাভ এবং স্বাধীন হওয়ার চিন্তা। জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি—এক জাতিকে অপর জাতি থেকে ভিন্ন হতে সাহায্য করে এবং স্বপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। সর্বপ্রথমে দেখা যাক যে সোভিয়েত এতগুলি জাতির সমন্বয়ে ও এত ভাষার সমন্বয়ে যে ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রাথমিক গলদ কোথায়।

লেনিনবাদী জাতি সংক্রান্ত নীতির প্রথম কথাই হচ্ছে জাতির একতা ও সার্বভৌমত্ব ; নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা (Self-determination) এবং এমন কি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন স্বরাষ্ট্র গঠন করারও ক্ষমতা ; এর ফলে সকলের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে। লেনিন এবং কম্যুনিস্ট পার্টি জাতি ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বারে বারে নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁরা প্রজাতন্ত্র গঠনের অন্যান্য উপাদানগুলি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পরই পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত জাতিগুলির উন্নতিতে যাতে আশু ফল পাওয়া যায় সর্বাগ্রে সেইদিকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় রাখার দরুণ অরুশ জাতিগুলির মেহনতি জনগণ জাতীয় একতা ফিরে পায় এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় তাদের উন্নতির পথ বাধামুক্ত হয় : তৃতীয়ত, অরুশ প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্র-স্বীকৃতিতে শতাব্দী ধরে জাতিতে জাতিতে যে সংঘর্ষ ছিল তা বিলোপ পায় এবং তারা আন্তর্জাতিকতাবোধ ও জাতীয়তাবোধে বিশ্বাস খুঁজে পায় ; চতুর্থত, রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এক গ্রন্থিতে থাকায় জাতিগুলি পরস্পরকে সম্মিলিত ও সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয় যা তাদের সর্বাধিক উন্নতি এমন কি অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হয় এবং পঞ্চমত, এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়াসে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনই ছিল জাতিতে জাতিতে এক বন্ধুত্বপূর্ণ অটুট বন্ধন—এ ছাড়া নানা ভাষার সমন্বয়ে এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না। তাই বলা যায় যে সোভিয়েত পৃথিবীর প্রথম দেশ যে জাতীয়তাবাদের সমস্যা সমাধান করতে সফল হয়েছিল।

সোভিয়েতের এই সফলতার পিছনে ছিল অরুশ জাতির নীতি-নির্ধারণের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সমকক্ষতা যাতে বহু অনুন্নত জাতি সোভিয়েত

সমাজতান্ত্রিক সমাজের মাধ্যমে তার বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের দুটি স্তরে বিভাজিত করে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয়েছে যাতে প্রতিটি প্রজাতন্ত্র তার নিজস্ব কৃষিসম্পদ ও শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান মানুষের শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমানাধিকারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মেহনতি জনগণের সমাজে প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের জন্য—এই বিরাট বিশ্বাস উন্নত সমাজব্যবস্থার সহায়ক হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রধান কর্মকাণ্ড নিরক্ষরতা দূরীকরণ যা সমাজকে এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিতে সাহায্য করেছে। বহুজাতিভিত্তিক বুদ্ধিজীবীর (multinational intelligentia) উত্থান এ-ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবদান।

বহুমুখী সাহিত্য, শিল্পকলার জন্মপ্রসার ও উন্নয়ন একমাত্র ওইরূপ সমাজেই সম্ভব—কারণ অখণ্ড অর্থনৈতিক, সামাজিক শিল্প ও সংস্কৃতির গ্রন্থিতেই এতগুলি দিক এক সাথে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়। বিশ্বে সোভিয়েতই প্রথম তা দেখাতে সচেষ্ট হয়ে প্রমাণ করেছে যে তা সম্ভব। এক জাতির সাংস্কৃতিক ভাবধারার সঙ্গে অপরের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পরস্পরের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে পুষ্ট করে আরো সম্পদশালী করে তুলেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সার্বিক উন্নতির জন্য কর্তব্যও কিছু ছিল যেমন সোভিয়েতের নানা জাতি সমন্বিত প্রজাতন্ত্রগুলির সার্বিক উন্নয়ন ; প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য ছিল তার নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর জীবনমুখী ও সাংস্কৃতিক দিকটা শক্তিশালী করে তোলা যাতে সেই কাঠামো সোভিয়েত কাঠামোর একটি অংশরূপে থাকতে পারে। প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা—তার উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা রেখে যদি উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা যেত তাহলে হয়তো জাতীয় সমাজতান্ত্রিকতা থেকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক পথ খোঁজা সহজ হত।

কিন্তু দেখা গেল জাতিসংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিনবাদী জাতিসংক্রান্ত নীতির সাফল্য সম্পর্কিত থিসিস থেকে গড়ে ওঠা নীতি একেবারেই ভিন্নপথ ধারণ করেছে—এতে সমাজতন্ত্র গঠনে লেনিনের নীতি থেকে সরে এসে মৌলিক গণতান্ত্রিক মানগুলি বাতিল করা হয় এবং ১৯৩০ এর দশকের গোড়ায় লেনিনের নীতি থেকে সরে এসে স্তালিনের নীতি চালু করা হয়। তাতে জাতীয়তাবাদ, উৎকট স্বাদেশিকতা, জাতীয় অভিমান এত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। তার প্রথম ও প্রধান কারণ

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অতি-কেন্দ্রীকরণ ও পার্টির কর্তৃত্ব। এতে প্রশাসন ব্যবস্থায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রের একক কাঠামোকে এবং লেনিনের সার্বভৌম ও সমানাধিকার সম্পন্ন প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের ধারণা বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। যে কোন প্রজাতন্ত্রে প্রকৃত কর্তৃত্বে ক্ষমতা প্রয়োগের ভার ছিল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংস্থার উপর এবং দিনে দিনে এদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। ফলে প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতি ক্রমশ লোপ পায় এবং তাতে ফেডারেলবাদের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলে জাতীয়তাবাদের নানা সমস্যা যেভাবে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছিল সে সম্পর্কে যদি আগে থেকেই গবেষণার দ্বার খোলা থাকত এবং স্বাভাবিকভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে এই সমস্যার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার আবেদন করত তাহলে হয়তো কিছুটা তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা যেত প্রতিকারের উপায়।

১৯৭৭ সালে এ সম্পর্কে গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়; কিন্তু হঠাৎ সব কিছু পাততাড়ি গোটাবার আদেশ আসে এবং এই ভয়ংকর নীতির কবলে পড়ে গবেষণা মাঝপথেই হিমঘরে গিয়ে তালাবন্ধ হয়। এতে সমস্যা আরো গভীরতর হয়ে দেখা দেয়। বর্তমানে সমস্যা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সোভিয়েত জনগণ বলে নিজেদের বর্ণিত করতে ইউনিয়নের বহুজাতি দ্বিধা বোধ করছেন। এই জাতীয় বহুজাতি সমস্যার সমাধানে দার্শনিক এডওয়ার্ড বাগ্রামভ মনে করেন বর্তমানের ১৫টি প্রজাতন্ত্র ভেঙে ৪০টি করলে হয়তো কিছুটা সমস্যা হালকা হবে। অপরদিকে দার্শনিক ওজিগানোভ ethnocentrism-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে জাতির সামাজিক-কাঠামো, এই আন্দোলনের সামাজিক চরিত্র। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব, তাদের নীতি এবং সেই নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই সমস্ত ব্যাপারগুলি বিবেচ্য—এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় বসা উচিত। অধ্যাপক বাব্রামভের মতে ১৯৩৬ সালে The Institute of Inter-Ethnic Relation-কে বন্ধ করে দিয়ে যে এই সকল গবেষণার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা পুনরায় চালু করে গবেষণার ভিত্তিতে সমস্যাকে দেখা অত্যন্ত জরুরী। সব কিছু রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে বহুদিন যাবৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জাতীয়তাদের কাজ সোভিয়েত দেশে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। আজ তার মাশুল দিতে হচ্ছে।

গবেষণা হলেই যে এ সমস্যা ঠেকিয়ে রাখা যেত তা না হতে পারে তবে এইটুকু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যে এই ধরনের নানা সমস্যাজড়িত প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা

চিন্তা করা হয়েছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দেওয়া গেল না। আজকে তো এমন কি সে সম্পর্কে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে একথা বলার'ও সুযোগ নেই। ১৯৮৫ সাল থেকে যখন পুনর্গঠন ও খোলাখুলি আবহাওয়ার মধ্যে কথা বলা শুরু হোল তার আগে এই জাতি সমস্যাকে খতিয়ে দেখার অবকাশ ছিল না ; কারণ কেন্দ্রীকরণ রিপোর্টে জাতিগত সমস্যাকে বড় করে দেখানো হলে হয়তো পুনর্গঠন ও খোলাখুলি মনোভাবের প্রবর্তনের পূর্বে বিষয়টি নিয়ে আরও বিশদভাবে ভাবা যেত।

প্রজাতন্ত্রগুলির জাতি সংখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হল লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্রে যেমন লিথুয়নীয়গণের পরেই রুশদের সংখ্যাধিক্য ল্যাটভিয় এবং এস্তোনীয়র ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা দেখা যায়। যে সব জাতি অত্যন্ত অনুন্নত ছিল সেইসব জাতির ক্ষেত্রে রুশ সংখ্যাধিক্য থাকলে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে পড়ে না কিন্তু উন্নত জাতি যেমন বলটিকদের ক্ষেত্রে এই রুশ প্রভাব এবং কর্তৃত্ব আজ বিষময় হয়ে উঠেছে—উন্নত ও অনুন্নতের প্রাথমিক স্থান নির্ণয় করে যদি রুশ সংখ্যাধিক্যের কথা ভাবা যেত তাহলে হয়ত এই উগ্র জাতীয়তাবাদের চিন্তা কিছুটা প্রশমিত হত। তাছাড়া সোভিয়েত সমাজের বন্ধন অটুট রাখার জন্য যে আন্তঃ প্রজাতান্ত্রিক বৈবাহিক সূত্রের কথা ভাবা হয়েছিল বলটিক প্রজাতন্ত্রে তা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। তাদের পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় মেলামেশায় রুশ, ইউক্রেনীয় বা বেলোরুশীয় যত আগে স্থানাধিকার করেছে সেই অনুপাতে মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রের কোনো ছায়াই তাদের উপর পড়েনি। এতে কার্যত যে সমস্ত অসাম্য ছিল তা দূর করার প্রয়াসে এইসকল ব্যাপারগুলি অনুকূল হয়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র বহুজাতিক ঐক্য প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়। যে আন্দাজে তারা শিক্ষিত ও যোগ্যতর হয়ে ওঠে সেই তুলনায় পরিস্থিতিকে জনসাধারণের একতার অনুকূলে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয় নি।

ভাবা বিচারে দেখা যায় যে রুশ ভাষা যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেজন্যে সুরক্ষিত সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ার সময় এই রাষ্ট্রে অনুরূপ সমৃদ্ধিশালী আরও কয়েকটি ভাবা ছিল যেমন ইউক্রেনিয়, লিথুয়নীয়, ল্যাটভীয়, আজারবাইজান, আর্মেনীয় ও জর্জিয়। এই ভাষাগুলির প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দিয়ে যদি তাদের বৈশিষ্ট্যের কোন বিকাশ ও উন্নতি ঘটানো যেত যুগ যুগ ধরে যে সামাজিক ধারা ভাষাগুলি বহন করে আসছে তাতে ছেদ পড়ত না এবং এদের সাবলীল প্রকাশের মাধ্যমে পরস্পরের সাংস্কৃতিক বন্ধন অটুট হতে

পারত। যোগাযোগের ভাষা হিসেবে রুশ ভাষার ভূমিকাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বীকার করে না এবং সেটা সার্থক হয়েছে যেখানে অন্য ভাষাগুলির তুলনায় এই ভাষা অনেক উন্নত ; যেমন, কিরগিজিয়া, কাজাকস্তানে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিভাষিক ব্যবস্থাও রয়েছে যেমন উজবেক-রুশ, জর্জিয়-রুশ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বিভাষা সূত্রে যদিও রুশেরই প্রাধান্য বেশী—তবুও বহুজাতি সম্পন্ন বহুভাষাভাষীর এই দেশে প্রাথমিক উপায়ে যোগসাধনের এছাড়া পথ নেই। তবে ভাষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বিভাষার জোড় পাওয়া যায়। যেমন, উজবেক-তাজিক, আজারবাইজান-আর্মেনীয়, লিথুয়নীয়-ল্যাটভীয়। যদি সুচিন্তিতভাবে এই জোড়-গুলির প্রসার ও চর্চা এবং প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেওয়া হত তাহলে এই উন্নতমানের ভাষাগুলি আজ যেভাবে মনে হচ্ছে, রুশ প্রভাবে বিলুপ্তির পথে, তা হয়তো বা বাস্তবে হত না এবং বর্তমান সঙ্কট এত প্রকটভাবে দেখা দিত না। ভাষাগতভাবে বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতার প্রাক্কালে একবার ভাববার অবকাশ থাকত যে আমরা রুশ-লিথুয়নীয় বা রুশ-ল্যাটভীয় নই লিথুয়নীয় ল্যাটভিয়ের উজবেক ও তাজিকের সম্পর্ককেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলতে পারেন যে তার ফলে আজ যে-কোনো ভাষার সাহিত্য যেভাবে অন্য দেশেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা হয়তো সম্ভব হোতো না। কারণ এইসব ভাষার সাহিত্য রুশের মাধ্যমেই পৃথিবীর তৃতীয় ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী, ফরাসী, হিন্দী অথবা বাংলায় অনূদিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে যে-ভাষার মূল সুর যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে সেই ভাষাভাষীরা এতবেশি রুশ প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে পারে না। তাছাড়া যদি লিথুয়নীয় থেকেই সরাসরি অনুবাদ হতে পারে তবে রুশ মাধ্যমে তৃতীয় ভাষার পথ বেয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কেন? ১৯৩০ এর দশকে (সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে বাধ্যতামূলক রুশভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত ১৯৩৮ সালের ডিক্রি) লেনিনের রুশ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে স্বেচ্ছা প্রণোদনার নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হোল। কিন্তু ফলত অন্য ভাষা আয়ত্তের প্রয়াসে প্রায়ই নেতিবাচক পরিণাম ঘটতে দেখা যায় যার প্রকাশ ও ফলশ্রুতি জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া, জাতিগত হীনমন্যতা, জাতীয় নৈরাজ্যবাদ (নিহিলিজম) এবং ভাষার উন্নতিতে বাধা। এই অবস্থাই আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে। ভাষা আয়ত্ত করার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী প্রবণতা জনসংখ্যার একটা বড় অংশের মধ্যে একাত্ম-

বোধে সংকট সৃষ্টি করেছে এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদসুলভ মনোভাবের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শিক্ষার বাহন, রাষ্ট্রভাষা ও জাতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে জাতি-বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মর্যাদা না দেওয়া মৌলিক অধিকারকেই ক্ষুণ্ণ করা। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি অথবা নিয়ন্ত্রণে নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সুতরাং তার পরিণামে সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী।

ভাষার অধিকার সরাসরি কেড়ে না নিলেও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার না থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। সংস্কৃতি চায় অনুশীলন, সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষসাধন। সংস্কৃতি জাতীয় ইতিহাসের পরিণাম যা সেই জাতির সামাজিক কাঠামোর দ্বারাই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং ভাষা, সমাজ, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। এই অবিচ্ছেদ্য সত্তাকে জাতির থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার পরিণাম সুফলপ্রদ হতে পারে না। সোভিয়েত সমাজে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার মর্যাদা পায়নি এটাই বর্তমান সংকটের মুখ্য কারণ। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো প্রজাতন্ত্রের সাহিত্য লোক সঙ্গীত ও ক্রীড়া শিক্ষায়তনের মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করার প্রতি যথাসাধ্য নজর দেওয়া রয়েছে। কিন্তু এই সৎ প্রচেষ্টাও নিছক যান্ত্রিক প্রলেপে পর্যবসিত হয়েছে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজ জেহাদ ঘোষণা করেছেন সমগ্র সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের সদস্যগণ। বাক্ স্বাধীনতা, অর্জনের জন্য আজ সাহিত্যিক শিল্পী গোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রকাশ ধর্মের মাধ্যমেও হয় ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চেতনাবোধ কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়েই গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। মানবজাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে যে ধর্মবোধ অধিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রবাদে তাকে এভাবেই গুরুত্বহীন করে দেখা হয়েছে।

মানুষের দুটি দিক আছে একটি তার জন্মসূত্রে পাওয়া অপরটি সে নিজেকে যেভাবে গড়ে তোলে। ধর্ম প্রাথমিক পর্যায়েরই অন্তর্গত যার সঙ্গে আবার তার সংস্কৃতিগত যোগ আছে। সুতরাং ধর্মকে শুধু আফিমের নেশা বলে মানুষকে নেশামুক্ত করার চেষ্টা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির নির্মূল উৎপাটন সম্ভব নয়। ধর্মের মধ্যে

আছে কৌতূহল, ভয়, সন্দেহ, নিরুপায়বোধ এবং এগুলির সমন্বয়ে এক দুর্বলতা যার জন্য সে অতিপ্রকৃতকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। ধর্মবোধের প্রকাশের জন্যে সব সময় আড়ম্বর জাহির করার প্রয়োজন পড়ে না ; নিভৃতে সচেতনভাবে বা অনবহিত থেকে এমন কাজ করা হয় যা কখনও কখনও পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে চলে যায়। মনের নির্জ্ঞান স্তরেও সংস্কৃতির প্রভাব বিরাজ করছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ ব্যবস্থা গড়ার প্রচেষ্টাকে সে স্বাভাবিকভাবেই বাধা দেয়।

এখন বলটিক প্রজাতন্ত্রগুলির অতৃপ্তি, আক্ষেপ ও বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে গেছে যে তারা বিচ্ছিন্নতার দাবি জানিয়েছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকেই পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় এই যে বলটিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ ত্যাগ করার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা দেয় এবং কার্যত জাতিগুলির সদস্যেরা পার্টির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। অপরদিকে যুবগোষ্ঠী 'কমসোমল' ষাটের দশকে নতুন চিন্তাধারায় যুবসঙ্ঘ গড়বার চেষ্টা করে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে দেখা যায় যুবসমাজে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। অথচ সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকে যেমন বুদ্ধিজীবীর বিনাশ ঘটে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়াহয়—এটা হয়তো সমসাময়িক হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের ঘটনাগুলিকে মাথায় রেখেই করা হয়েছিল।

এই সময় সাংস্কৃতিক দিক থেকে সাহিত্য-শিল্পের গুণগতমান বাড়ানোর প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা খোলামেলা আমেজ ছিল। যে সব কবি-সাহিত্যিক হয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত অথবা মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁদের পুনরায় সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের সভ্য করে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলছিল। নাটকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। নাটক রচনা, তার ষ্টাইল বাস্তবও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিবেশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং নাটকের দল ইউরোপের নানাদেশে ভ্রমণ করে নাটক পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছিল। এটা সুরকারদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল যাতে তারা পাশ্চাত্যের অন্য দেশের সঙ্গে তাল রাখবার সুযোগ পায়। তবে এটা ঠিক যে তেমন তেমন কবিতা বা সমালোচনা হয়তো কোনো দৈনিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশ করার সুযোগ পেলেও সেই কবি বা সাহিত্যিকের বই প্রকাশ করার কালে সম্পাদনায় কড়া

নজর এড়ানো শক্ত হয়েছে এবং সেইসব-সাহিত্য প্রকাশিত হতে পারেনি। অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য যত না রুশে অনূদিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি অনূদিত হয়েছে বলটিক প্রজাতন্ত্রের ভাষায়। বলট্‌দের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তাদের ভাষার প্রতি অনুরাগ। যদিও কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল ভাষাই সমান কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের থেকে বলট্‌দের তাদের ভাষার প্রতি এক বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ফলে রুশ ভাষা থেকে দস্তায়েভ্‌সকি যে কতবার এস্তোনীয়, ল্যাটভীয় ও লিথুনিয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার সংখ্যা পাওয়া ভার। আগেই বলেছি বলট্‌রা তাদের লোকগাথা ও গানের জন্য বিখ্যাত এবং সেই গানের এক স্বতঃস্ফূর্তভাব যুগ যুগান্ত ধরে বাহিত হচ্ছে। স্রোতের মুখে পাথর চাপা দিলে তার ফল যা হবে বলটিক রাজ্যগুলিতে তাই ঘটেছে। ১৯৬৫তে এস্তোনীয় উৎসবে হাজার হাজার এস্তোনীয় গেয়ে উঠেছিল "আমার জন্মভূমিই আমার ভালোবাসা"। এই গানই এস্তোনিয়ের বেসরকারী জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত হয়েছে। একই মনোভাব থেকে লিথুয়ানিয়ার গানের উৎসবে গীত হয়েছিল "প্রিয় লিথুয়ানিয়া তুমি আমার জন্মভূমি"। অথচ কৃষি ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সোভিয়েত সহায়তায় এই রাজ্যগুলিই প্রচুর অগ্রগতি দেখাতে পেরেছে।

শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সাম্যভাব গড়ে ওঠার আশা ছিল আজ তা বিপরীত স্রোতে ধাবমান। ধর্মের দিক থেকে বলটিক রাজ্যগুলি গোঁড়া ক্যাথলিক এবং সেজন্যে ভ্যাটিক্যানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যতখানি রুশ অর্থডক্সের সঙ্গে তত গভীর সম্পর্ক তারা রাখতে পারেনি। ১৯৫৬ সনের ২রা নভেম্বর অল সোলস ডে-তে (all souls day) যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় ধর্মের গাঁথুনি এদের মনের কত গভীরে। এইসব ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে বোঝা যায় এরা কেন ও কিভাবে এক বিচ্ছিন্ন ভাব-ধারার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। আজ নোঙর ফেলবার পূর্বক্ষণে এই বিচ্ছিন্নতাবোধই এক বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে তারা প্রভূত সাহায্য পেয়েছে অপরদিকে তারা অনেক কিছু হারিয়েছে —এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জেহাদ ও স্বরাজের দাবি হয়তো মানা যাবে অথবা যাবে না তবে তার আগে কিছু বিষয়ে আলোচনায় আছে।

Presidential Council member প্রিমাকভের মতে লিথুয়ানিয়ার বক্তব্য

CENTRAL LIBRARY

গত পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে কিছুই দেয়নি একথা সত্য নয়। বর্তমানে যে এক উন্নতমানের অর্থনৈতিক অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে আছে তা সোভিয়েত সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। বেলোরুশীয়দের থেকে তাদের পাঁচটি আঞ্চলিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ক্লাইপেদা বন্দর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা যা লিথুয়ানিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে লিথুয়ানিয়া পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সোভিয়েতকে দোষারোপ করে বিবৃতি দিচ্ছে যে সোভিয়েত ও লিথুয়ানিয়ার মাঝখানে অবরোধ তৈরী করে সোভিয়েত তাদের খাদ্যসামগ্রী, তৈল, বিদ্যুৎ শক্তি অবরোধ করছে। এ অভিযোগ অবশ্য সঠিক নয়। প্রিমাকভ বলেছেন যে শক্তি দিয়ে লিথুয়ানিয়াকে জোর করে ধরে রাখবার ইচ্ছা সোভিয়েতের নেই—এমন কি অত্যন্ত ভালো বিবাহও সময়ে সময়ে ভেঙে যায়। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও পাত্রপাত্রীর মার্জিতভাব অটুট থাকে—কারণ সেই বিবাহবন্ধন যে প্রকারেই হয়ে থাকুক না কেন তার একটা আব্রু আছে। গর্বাচেভ ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে লিথুয়নীয় পার্টির সক্রিয় কর্মীবৃন্দের কাছে বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে এই সমস্যা অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, যোগ্যতা, মৈত্রীবদ্ধতা এবং পার্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—সুতরাং এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে এগোন প্রয়োজন।

আজকের বিচ্ছিন্নতা এক গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর ন্যস্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত স্বার্থ তুচ্ছ করে এগোনো যায় না কারণ একটি প্রজাতন্ত্র বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে তার সঙ্গে জড়িত থাকে সেই দেশের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থ। যদিও তাদের নিজেদের সমস্যা যত ভালোভাবে তারা বুঝবে ততটা হয়তো অপরে বুঝতে পারবে না তবু এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনায় বসার প্রয়োজন আছে। গরবাচেভ বলেছেন যে এই সম্পর্কিত আইনের খসড়া যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। আইনসম্মতভাবে কোনো প্রজাতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তা সহায়ক হবে। দেখা যাচ্ছে পুনর্গঠন ও খোলাখুলি আবহাওয়ার প্রথম ঝড়ের দাপটই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার দাবি। কিন্তু বর্তমান সমস্যাজর্জরিত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই সঙ্কটকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে কে বেশী লাভবান হবে বা কার ক্ষতি কতখানি হবে সে সম্পর্কে এখনি সঠিক সিদ্ধান্তে আসা প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। সোভিয়েত বৃহৎশক্তির কাছ থেকে বলটিক প্রজাতন্ত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হলে ভৌগোলিক

দিক থেকে সোভিয়েতের কিছুটা ক্ষতি হবে কারণ বলটিক সমুদ্র কূলবর্তী বন্দরগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে বিশেষ সহায়ক। কিন্তু ১৯১৬ অথবা ১৯৪০-এর পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রের সঙ্গে ১৯৯০-এর মানচিত্রের তফাৎ অনেক। আজ বলটিক প্রজাতন্ত্র বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে হয়তো তাকিয়ে আছে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (common market) দিকে, তাকিয়ে আছে অপর এক বৃহৎ শক্তি আমেরিকার দিকে ; কিন্তু তাদের কাছ থেকে এই সঙ্কটের দিনে সত্যি কতখানি সাহায্য সহজলভ্য, আর্থিক অনুদান আদৌ আসবে কিনা তা ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আরো বিচার্য যে এই রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হলে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কতখানি সফল হতে পারবে। বৃহৎ শক্তিকে নিরপত্তার কথা সবসময়েই চিন্তা করতে হয়, যথাযোগ্য ব্যবস্থাও রাখতে হয় কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই ক্ষুদ্ররাজ্যগুলির পক্ষে বিপুল সামরিক আর্থিকভার বহন সম্ভব কিনা।

বর্তমান অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে অথবা সংকট আরও ঘনীভূত হবে তা কেবল অনুমানের বিষয়। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে স্বল্প সামরিক সাহায্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করা সম্ভব এবং সে-চেষ্টা থেকে সকলেই বিরত নয়। সেজন্য 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এই স্লোগান যখন দিকে দিকে তুলে যুদ্ধবাজদের ক্ষান্ত করার চেষ্টা চলছে তখন অন্ততর বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করলে পৃথিবীবাসী উপকৃত হবে কিনা বলা শক্ত। বিচ্ছিন্নতা ডেকে এনে বলটিক রাজ্যগুলিও সত্যি সত্যি উপকৃত হবে কিনা তাও বিতর্কের বিষয়। এই পরিস্থিতিতে আবেগ নয় আলোচনার মাধ্যমে পথের সন্ধানই বোধহয় শ্রেষ্ঠ পন্থা। না হলে শুধু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির নয়, সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সঙ্কট আরো গভীরভাবে দেখা দেবে।

———

সমাজতন্ত্রের সংকট, সম্ভাবনা ও মানবপ্রকৃতি

শিবাশিস দত্ত

সংস্কৃতির অর্থ ব্যাপক। সভ্যতার অগ্রগতির পথে সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিকাশের সমস্যা থেকে যে সঙ্কট দেখা দেয় তা দেশ-কাল-সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব পরিসরে সমগ্র মানব সভ্যতার সঙ্কট। সংস্কৃতি হলো প্রকৃতি সমাজ ও মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা এক অচ্ছেদ্য বন্ধন যার মাধ্যমে তৈরী হয় 'Total Man"-পূর্ণ মানব। প্রকৃতি-মানব সম্পর্ক, উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে সমাজের চাহিদাপূরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্করক্ষা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক অর্থাৎ অসঙ্গতি এবং সঙ্গতিকে এক করে জানা-এসবের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সঙ্কট সে কারণে মানুষ সমাজ ও মানবতার সঙ্কট। সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা সংস্কৃতির সংকটের আংশিক রূপ। বর্তমান নিবন্ধে তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবজনক ও বলিষ্ঠ অধ্যায়। মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতির বদলে সর্বহারার অর্থনীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্র যা ছিল অসম্পূর্ণ ও মুষ্টিমেয়র স্বার্থে তার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (উন্নত ও সমগ্র সমাজের স্বার্থে চালিত), মানবতাবোধের সার্বিক বিকাশ এ সমস্ত কারণে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয় ও উন্নত বলে বিবেচিত হয়েছিল। পূর্ব ইয়োরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে যে সঙ্কটের ছবি ফুটে উঠেছে তাতে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ধনতন্ত্রের সঙ্কট কোন নতুন কথা নয় ; যদিও STR'র (Scientific and technological revolution) মাধ্যমে ধনতন্ত্র তার গভীর সঙ্কটের সাময়িক নিরসন ঘটিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বোধহয় এরকম ভাবেনি। অনভিপ্রেত এবং অকল্পনীয়ভাবে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সফল ধনতান্ত্রিক প্রয়াস সমাজতন্ত্রের কাছে এক অতিরিক্ত দুর্ভাবনা।

সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা ধরা যাক। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ঘুরে আসার পরেই রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ তীর্থদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর তাৎপর্য কম নয়। 'রাশিয়ার চিঠি'তে কবি ব্যক্ত করেছেন

একই সঙ্গে বিস্ময় এবং উদ্বেগের কথা। ধন গরিমায় ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব কবির ভালো লেগেছে। কিন্তু শিক্ষাবিধি দিয়ে ছাঁচে ঢালা মানুষ তৈরীর মধ্যে কবি বিপদের সঙ্কেত দেখেছেন। "মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করেছে,...প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে"—কবির এই উক্তি মানবতার সপক্ষে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির এক বলিষ্ঠ স্বীকৃতি। একই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে নঙর্থক দিকটি। মানুষের ইচ্ছার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কিনা কবি খোঁজ করেছেন বার বার। ডিকটেটরশিপের সদর্থক দিকটা যেমন শিক্ষায় ফলেছে তেমনি নঙর্থক দিকটা জবরদস্তি জেনে তাকে পাপ বলে উল্লেখ করেছেন।

সোভিয়েত সমাজ ও জনগণের অবস্থা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে পূর্ব ইয়োরোপের এক বুদ্ধিজীবি রসিকতার আড়ালে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। পূর্ব ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে একই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন।...'Every body is employed but nobody works ; nobody works but the plan is fulfilled ; the plan is fulfilled but there is nothing to be found in the shops ; shops are empty but in every house you can find lots of goods ; houses are full but people complain ; people complain but the party candidate gets 99·9 per cent of the vote.'[১] সমাজতান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটের কথা এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের "প্রাচুর্য" সঙ্কটের কারণ নয়; ভোগ্যপণ্যের "অভাবে" গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার পরও কর্মবিমুখতা ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা অনিয়ন্ত্রিত হলে তার থেকে যেমন শুরু হয় সমাজের অবক্ষয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধন ব্যক্তিসত্তাকে হরণ করে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করে। অবাধ গণতন্ত্র যেমন স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়, রাষ্ট্র বা দলসর্বস্ব গণতন্ত্র তেমনি এক ধরণের প্রহসন।

সমাজতন্ত্রের সংকট ব্যাপক হয়ে দেখা দেবার একটি কারণ ভোগ্যপণ্যের অপ্রতুলতা। ধনতান্ত্রিক সমাজে "নিঃশব্দ বিপ্লব" ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য বাড়িয়ে এ চাহিদা পূরণ করেছে। বিংশ শতাব্দীর কমপিউটার বিপ্লব এককথায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্যলাভ পুরনো বিশ্বকে অকেজো ও অচল বলে ঘোষণা করেছে। শ্রেণীচেতনার ঊর্দ্ধে মানবচেতনা, বৈরীতার বদলে সহযোগিতার-নির্ভর

বিশ্ব—এক নূতন ধরণের গণতন্ত্রের বার্তা বয়ে এনেছে নতুন পৃথিবী। তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ, পরিবেশ দূষণের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় মানবজাতিকে রক্ষার প্রশ্ন হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ভাবনা। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এ এক অভিন্ন সংকট। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিভিন্ন শক্তির পুরনো বিন্যাস ভাঙ্গছে, নতুন বিন্যাস গড়ে উঠছে, নতুন এক সমাজ জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে, জন্ম নিয়েছে এক নতুন সামাজিক শ্রেণী।···"This class includes bureaucrats, managers, professionals, white collar workers, technicians etc—generally people on salary rather than wages···Karl Marx as well as other radicals saw more and more property in fewer and fewer hands. They did not see the possibility of the emergence of a class that would attempt to hold power without holding property."[২]

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার গতি-প্রকৃতি আরো বিস্ময়কর। জনগণের পরিবর্তে আমলাতন্ত্র এখানে সর্বময় কর্তা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা জনগণের হাতে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী। আমলাতন্ত্র সমাজতন্ত্রের সুফলগুলো ক্রমাগত হরণ করে অর্থনীতিতে মন্দা, অচলাবস্থা গড়ে তুলেছে, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়ের সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছে।

এরকম পরিস্থিতি থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরস্ত্রৈকার আবির্ভাব। গর্বাচেভ পেরস্ত্রৈকা বলতে বোঝেন "Socialism with a human face." মানুষের মুখ ঢাকা পড়েছিল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। মানবতাবোধ বিযুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছিল প্রায়িক রাষ্ট্রতন্ত্রে। অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পেরস্ত্রৈকার মাধ্যমে। সমাজতন্ত্রের নঙর্থক দিকের পাশাপাশি এটি হলো সদর্থক দিক। ডিক্টেটরশিপের মত মস্ত আপদ চালু থাকা সত্ত্বেও তার সদর্থক দিকটি শিক্ষায় ফলেছে বলে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান কালের পেরস্ত্রৈকায়। কিন্তু সমস্ত মানুষকে শিক্ষায় শিক্ষিত করেও আর্টের পালোয়ানির দ্বারা মনুষ্যত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি নিহিত ছিল সমাজতন্ত্রের জন্মলগ্নেই। তবে শিক্ষা হল এক অমোঘ শক্তি যা সমাজতন্ত্রকে কখনই পুরোপুরি ভাবে খারিজ করে না। গুরুতর সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও

CENTRAL LIBRARY

উত্তরণের প্রক্রিয়া চলে এ ব্যবস্থায়। বিখ্যাত রুশ কবি ইভতুশেংকো গর্বাচভের সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে বলেছেন, "...He has changed the air over the soil. When I say 'air' I mean first of all a fresh wind which penetrates or tries to penetrate to all levels of our society. And by soil I mean objective reality. I mean the economic situation. I mean the psychology of a people. The main change is a change of atmosphere."[৩] সমাজতন্ত্রের ইতিবাচক দিকটি এই প্রক্রিয়ায় জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে বলেই বিদ্রোহী কবি ইভতুশেংকো মনে করছেন। মানবসত্তার বিকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "One of the signs of the maturity of a person or the maturity of a society is being tolerant of differences. We were many times not tolerant, and I hope what's now happening with the release of Sakharov and some other people, is a symbol of maturity of a society that could permit human tolerance."[৪] গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার বাসনা গর্বাচেভের মতাদর্শে স্থান পেয়েছে। সমালোচক মন সম্মানিত হচ্ছে আজকের সোভিয়েতে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত 'Command Economy'র বদলে গর্বাচেভ 'Market Economy' চালু করতে চাইছেন। অতীতে যে সাংবিধানিক কাঠামো মেনে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে সেই কাঠামোর খোল নলচে না বদলে গণতন্ত্রমুখী সমাজতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নয়। নতুন অর্থ নৈতিক পদক্ষেপগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকেরা ও রক্ষণশীলেরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতা, ব্যাহত হচ্ছে বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এরকম দাবী তুলে পেরস্ত্রৈকা বানচাল করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের সাংবিধানিক কাঠামো না বদলাচ্ছে। শ্রেণী-পার্টি-সমাজতন্ত্রের বিশেষ তকমাধারী ঘোড়ার একমুখী এবং একমাত্রিক দৌড়কে বহুমুখী, বহুমাত্রিক করতে না পারলে পেরস্ত্রৈকা সফল হবে না। সমাজতন্ত্রকে ঘিরে যে মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যেই পেরস্ত্রৈকার সাফল্য নিহিত। পেরস্ত্রৈকার পথ এ কারণে দুরূহ, জটিল এবং সম্ভাবনা ও সংকটের পথ।

সমাজতন্ত্র থেকে উদ্ভূত মানবতার সংকটকে দুভাবে দেখা যায়। মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও তা লঙ্ঘনের বিপদ থেকে উদ্ভূত সমস্যা। মানব প্রকৃতি ও তার

প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই সংকট ও তার সমাধানের বীজ নিহিত। মানব-প্রকৃতি গঠনে যেহেতু বিজ্ঞানের ভূমিকা আছে তাই সমাজতন্ত্র, মানবতার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি জড়িয়ে থাকে। বিজ্ঞানচর্চার সুফল যেমন আছে তেমনি তার সমস্যাও আছে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য মানুষকে দাম্ভিক করে তোলে। প্রকৃতির সন্তান না থেকে মানুষ তখন প্রভুত্ব করতে চায় প্রকৃতির ওপর। আবার ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনায় প্রকৃতির নিয়মাবলীর কাছে মানুষের দম্ভ টেকে না। কমপিউটার মানব এযুগে বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্যের কথাই বলে। আবার কমপিউটার মানব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সমগ্র মানবসভ্যতার কাছে। তাই বিজ্ঞানের ফলাফলকে মানবিক গুণসম্পন্ন হতে হলে মানুষকে অহমিকা বিসর্জন দিতে হবে। সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান-সম্মত এবং শ্রেষ্ঠ একথা সত্য কিন্তু তা কখনই একটি বিশেষ শ্রেণী বা পার্টির বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব হতে পারে না। এরকম কর্তৃত্ববাদ থেকেই অহমিকার জন্ম হয় যা সমাজতন্ত্রের বিপদ ডেকে আনে। সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবগুণসম্পন্ন সাধনা ও তার সাফল্যের উপাদানগুলি অর্জিত হলে তবেই সমাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ হতে পারে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র যত উন্নত হয় ততই সে বিশেষ মতবাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে সমগ্র মানবসমাজের অগ্রগতির চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। সত্যের ওপর কোন কর্তৃত্ব চলে না ; মানবসত্য কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এগোয়।

মানুষের মধ্যে শ্রেয়বোধ এবং প্রেয়বোধ দুইই থাকে। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক মতবাদে প্রতিষ্ঠিত কোন দর্শন মানবপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে কখনই আনতে পারে না। বিজ্ঞান এখানে সীমিত। বিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু কখনই তা পূর্ণসত্য নয়। মানব হৃদয় পূর্ণসত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র দাবিদার। মানবসত্তা বৈচিত্র্য, বিস্ময়, সমস্যা এবং সম্ভাবনার আধার। কার্ল মার্কস ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন,…"Religion is the self consciousness and self-esteem of man who had either not yet found himself or has already lost himself again. …It is the fantastic realisation of the human essence because the human essence has no true reality."[৫] মানবসত্য কোন ছকবাঁধা দর্শনে পরম সত্য বলে ঘোষিত হয় না। মানবমনে এক দ্বান্দ্বিক, বিপরীতমুখী টানাপোড়েন চলে বলেই মানুষ নতুন করে বাঁচে, কখনো সে নিজেকে একান্ত আপনার বলে ঘোষণা করে, কখনো আপন হতে বিবিক্ত হয়ে বিশ্ব-হৃদয়ে নিজেকে মেলে ধরতে চায়। প্রেম, ঘৃণা একই মানবের দুই সত্তা।

মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা থাকার অর্থ এ নয় যে মানুষ বদলায় না। আত্মরক্ষা ও প্রজাতি-রক্ষা এ দুটি মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানে এ কথা স্বীকৃত। সংবেদনের প্রভাবে পরাবর্ত (Reflex) সক্রিয় হয়। শর্তাধীন বা শর্তহীন উভয় পরাবর্তের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। অর্থাৎ মানবসমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে মানবিক কোন বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ ঘটতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্র বা সমাজ মানবপ্রকৃতি নির্ভর নয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়ায় মানব-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

সে কারণে সমাজতন্ত্রের সংকট থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় মানব-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, অনুশীলন ও তার বৈচিত্র্যকে যথাযথ মর্যাদাদান। শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মধ্যে নূতন মূল্যবোধ গড়ে তোলে এ কথা ঠিক, কিন্তু পূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ তাতে গড়ে ওঠে না। গণতন্ত্র, মানবতাকে পুরোপুরিভাবে কোন দর্শনের অঙ্গীভূত করা যায় না। বিশেষ সময়ে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ যেমন বিশেষ গুরুত্ব পায়, অন্য সময়ে 'human factor' অতিক্রম করে যায় class-factor' কে। শ্রেণী মতবাদ আর মানবতাবাদ সমার্থক নয়। একে অন্যের পরিপূরক। শ্রেণী মুক্তিতেই ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি হয় না, ব্যক্তির সার্বিক মুক্তির মধ্যে সমষ্টির মুক্তিবোধ নিহিত। কার্ল মার্কসের কথায়, "free development of one is the condition of free development of all." শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-সংঘাত, শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য। ক্ষমতাদখলের সংগ্রামে শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীকে পূর্বেকার গুরুত্ব দিয়ে দেখলে সমাজতন্ত্রের ঘোষিত লক্ষ্য এবং সম্ভাবনাগুলি বিপদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র যেহেতু সমগ্র সমাজের কল্যানসাধণে কাঙ্খিত সত্য, কাজেই বিপ্লবের পর সমগ্র সমাজের কথা ভাবতে হয়। কোন বিশেষ শ্রেণী এক্ষেত্রে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বিশেষ বিশেষ সময়ে (যুদ্ধ, শিল্পায়ন) শ্রেণী-পার্টি আধিপত্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক, সমগ্র রাষ্ট্রের পূর্ণ মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এরূপ আধিপত্য ক্ষতিকারক ও নেতিবাচক। সমাজতান্ত্রিক বহুত্ববাদ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। পূর্ব ইয়োরোপে কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া নেতৃত্বের অবসান তাই প্রধান দাবি হয়ে উঠেছে, সমাজতন্ত্র বাতিলের দাবি ওঠেনি।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে এরকম কিছু সত্যকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করা হয়েছিল যার পরিণামে আজকের সঙ্কট। ধরে নেওয়া হয়েছিল সর্বহারার

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং তা সোভিয়েতে করা হয়েছে। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না এ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সোভিয়েত পার্টির একাদশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা জিনোভিয়েভ বলেছিলেন…"The dictatorship of the proleteriat, comrade Lenin says, is a terrible undertaking. It is not possible to insure the victory of the dictatorship of the proleteriat without breaking the backbone of all opponents of the dictatorship. No one can appoint the time when we shall be able to revise our attitude on this question"[৬] কমিউনিজম বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা—এককথায় সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখার বাসনা মানুষের হতে পারে, কিন্তু সে বাসনা কি মেটে? রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে পরেশের মুখে বলেছেন,—"সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতরো হৃদয়বর্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেইজন্যে আমাদের দেশে এ রকম সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচু জাতকে দেবালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে, তবে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী।" বা ধরা যাক ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের প্রশ্ন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বিলোপ করলে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি মাধ্যমকে অস্বীকার করা হয়। আবার ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মেনে নিলে ব্যক্তি-মালিকানা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। অতএব উভয়-সঙ্কট। মোহিত সেন "Perestroika and India" বইতে এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :—"The exploitation of labour of those who do not own by those who do, would continue to be prohibited but not individual ownership."[৭] একই পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে…"The diverse form of socialist ownership have been grudgingly recognised as a possibility which should be eliminated as soon as possible." এর পরেই তিনি বলেছেন,…"This is not a retreat from socialist to private form of property ownership but of flexible forms of socialist ownership giving the working man and woman the sense of mastery."

সমাজতন্ত্র তার পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে সঙ্কট কাটিয়ে উঠবে না তা পুঁজিবাদের ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে এ প্রশ্নে হতাশ হতে হবে যদি সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যগুলির মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাটো করে দেখা হয়। "অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ"—রবীন্দ্রনাথের এই বাণী সমাজতন্ত্রের অমোঘ শক্তির অভিবাদন স্বরূপ। সমাজকে জটা ধরে টান মারার শক্তি সমাজ-তন্ত্রের আছে, ধনতন্ত্রের নেই। শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব প্রভৃতি প্রশ্নে হিংসা অপরিহার্য, কাজেই সমাজতন্ত্রে মানবতাবোধ শ্রেয় কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। মানবিক প্রবৃত্তির উৎস কি এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা আমাদের সংশয় মেটাতে পারে। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে হিংসা বা অন্যান্য মানবিক প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত নয়। Genetic determinism★ এর ধ্যান-ধারণায় মানব প্রকৃতিকে বিচার করলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া বিপ্লব বা শ্রেণী সংগ্রামে হিংসার যে ভূমিকা থাকে সেটা exception, কখনই সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার rule নয়। ..."No doubt in the course of class struggle and the revolution communists as well as any other revolutionaries have had at times to be cruel, to tell lies and to kill. Exceptions were made the rule, means were considered to be hardly any importance provided the end was good the dialectical unity of means and ends was disrupted."[৮] ব্যতিক্রমকে নিয়মের সমগোত্রীয় করে দেখলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। 'Means' এবং 'Ends' এর দ্বান্দ্বিক ঐক্য ব্যাহত হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় অতীতের সোভিয়েত সমাজের বিত্রস্ত চেহারা থেকে তা অনুমান করা যায়। রাষ্ট্র-ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ববাদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (unity and distinction) ব্যাহত হলে কর্তৃত্ববাদ প্রবল হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে।

★ means some degree of constraint that is based on the possession of a particular set of genes. (on Human Nature—Edward O Wilson—পৃঃ ২১৭). একই বইতে লেখক বলেছেন,...'Biology is the key to human nature, and social scientists cannot afford to ignore its rapidly tightening principles" (পৃঃ ১৩) .....that human social behaviour rests on a genetic foundation—that human behaviour is, to be more precise, organised by some genes that are shared with closely related species and others that are unique to the human species. (পৃঃ ৩২)

CENTRAL LIBRARY

মোদ্দা কথা হলো সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও সংকট থাকলেও তার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ যেন আরব মরুভূমির সেই ফিনিক্স পাখী, (mythical bird) কয়েক শতাব্দী বেঁচে থাকার পর আগুনে ঝাঁপ দেয়, আবার যৌবন ফিরে পায়। সমাজ-তন্ত্রকে ঘিরে যে পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার দানা বেঁধে আছে তার দাসত্ব না করে সমাজতন্ত্রের আগামী যৌবনের কথা ভাবা দরকার। তা ছাড়া কার্ল মার্কস যে কোন রকমের দাসসুলভ মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলেন।

বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎস :

১. The Gorbachev Era— পৃঃ ৫২
Edited by
Alexander Dallin and Condoleeza Rice

২. Culture as History— পৃঃ (২১, রোমান হরফ)
—Warren I. Susman.

৩. The Soviet Union— পৃঃ ১০৫
Edited by
Janet Podell
Stevėn anrovin

৪. ঐ — পৃঃ ১০৫

৫. Perostroika and India— পৃঃ ৮০
—Mobit Sen

৬ Janet Podell : পূর্বোক্ত গ্রন্থ— পৃঃ ১৭৮

৭. Mobit Sen : পূর্বোক্ত গ্রন্থ— পৃঃ ৭৮

৮. ঐ ঐ — ঐ

পূর্ব ইউরোপে বিপ্লব ১৯৮৯

আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক

পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী গভীরতা, ব্যাপকতা, বিস্ময়কর দ্রুততার জন্য অভ্যস্ত ধারণা বিশ্বাসের শিকড়ে টান লাগিয়েছে। সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষ ঘটনার গতিতে স্তম্ভিত। স্বভাবতই পরস্পরকে দোষারোপ করার বদলে বুদ্ধিজীবীরা, নানা মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষরা তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন। শুধু সমাজতন্ত্র নয়, সোসাল ডেমোক্রেসী, সামাজিক আন্দোলন, গণতন্ত্র সব কিছুরই পুনর্মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে চিন্তা এখন গভীরভাবে শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক ও তাঁর সহযোগীরা এ নিয়ে যা কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন এদেশের মননশীল মানুষদের কাছে তার ব্যাপক আবেদন থাকতে বাধ্য, কারণ ফ্রাঙ্ক হলেন সেই সব চিন্তাবিদদের অন্যতম যিনি দেশরে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের চারত্র ও প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘকাল তাঁর বিশিষ্ট মত ব্যক্ত করে এসেছেন। পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের পটভূমিতে এদেশে চিন্তা জগতে যখন আলোড়ন দেখা যাচ্ছে, তখন ফ্রাঙ্কের এই রচনা চিন্তার নতুন খোরাক জোগাবে। নিবন্ধটি এই এই বছরেই রচিত এবং এদেশে সুখ্যাত "ইকনমিক এ্যাণ্ড পোলিটিকাল উইকলি" পত্রিকায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করা হলো সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে। —চারণ

১৯৮৯ সালের শেষ মাসগুলিতে পূর্ব ইউরোপের ঘটনাক্রমের যে গতি তাদের উদ্যোক্তাসহ সকলকে বিস্মিত করেছিল তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক পুনর্মূল্যায়ন দরকার। সমাজতন্ত্রের যে সব তত্ত্ব ও মতাদর্শ এতকাল ব্যাপকভাবে মানুষ মেনে এসেছে তাদের সঙ্গে একত্রে সোস্যাল ডেমোক্রেসীর এবং উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকার পুনর্বিবেচনা জরুরী হয়ে পড়েছে। ১৯৮৯ সালের বিপ্লব যে উল্লাস অনুমোদন পেয়েছে সেগুলি ছাড়াও, এই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অর্থ নৈতিক কারণ ও পরিণামের কথাও গভীর বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তারই শিক্ষণীয় দিকগুলি নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এক : এই ঘটনাবলীর সূচনা করতে এবং তাদের আরো ছড়িয়ে দিতে সামাজিক আন্দোলনসমূহের ভূমিকা সম্ভবতঃ আগের তুলনায় আরও ব্যাপক ছিল। সামাজিক রূপান্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকায়

CENTRAL LIBRARY

পুনর্মূল্যায়ন দরকার হয়ে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আগে যে সব আলোচনা হয়েছে সেখানে তাদের বহু-শ্রেণীভিত্তিকতা (pluri-class) এবং সেগুলি যে ব্যাপক আকারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, এছাড়া আর বিশেষ কিছু বলা হয়নি। পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলনে বহু শ্রেণীর অংশ গ্রহণ অনেকদিন ধরেই অব্যাহত রয়েছে। আর পশ্চিমে এইসব আন্দোলনে অংশ নেয় মুখ্যতঃ মধ্যশ্রেণীর মানুষ, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবিরা। আর দক্ষিণে সামাজিক আন্দোলনের গণভিত্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ বেশি দেখা যায়। পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলনে এর আগে বুদ্ধিজীবিরাও নেতৃত্ব দিয়েছে, তবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিল মধ্যশ্রেণীর মানুষ এবং মেহনতী জনতার বিভিন্ন অংশ। অন্য নানা জায়গার মতো এখানে এবারের সামাজিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ঘটেছে অনেক ব্যাপক ভাবে এবং তারা আন্দোলনের নেতৃত্বে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থেকেছে। এই সব আন্দোলনের এই সামাজিক গঠনবৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেয় কেন এই আন্দোলনে জোরালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাদের স্বৈরাচার ও ক্ষমতার ক্রমোচ্চ স্তর বিরোধী চরিত্র। যে সব চিরায়ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও বৈধতাকে তারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তাদের তুলনায় এইসব আন্দোলনের গণভিত্তি যে বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নেই। পূর্ব ইউরোপে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে সংগঠিত এইসব সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রেণী এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরো গভীর আলোচনা করা দরকার।

দুই : ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে এই সব অপরিনীম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক রূপান্তরের শান্তিপূর্ণ চরিত্র বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। এই সব আন্দোলনগুলি ছিল উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই শান্তিপূর্ণ এবং রোমানিয়া ছাড়া তাদের দমন করতে শক্তি প্রয়োগ বা জবরদস্তি করা হয়নি। রোমানিয়ার 'সিকিউরিটেট' শক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করতে চাইলে সৈন্য বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে তার বিরোধিতা করে। তারা (মূলত স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই) অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। কেবল সৈন্যবাহিনীর ভূমিকাই নয়, রোমানিয়ার গণ অভ্যুত্থানের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকেও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের সামাজিক আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্রভাবেই বিচার করা দরকার। অন্যত্র এইসব আন্দোলনের সাংগঠনিক শিকড়গুলি আরো দীর্ঘস্থায়ী গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট দেখা গেছে। যেমন পূর্ব জার্মানীর চার্চে, চেকোশ্লোভাকিয়ার

কার্টা ৭৭য়ে, হাঙ্গেরীর অসংখ্য শান্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে, পোল্যাণ্ডে সলিডারনোস্ক ও ক্যাথলিক চার্চে। বুলগারিয়ার অবস্থান রোমানিয়া ও এই সব বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি কোনখানে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রুশ অংশে সামাজিক আন্দোলন ও অসংখ্য "ক্লাব" পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করেছে। বাস্তবিকপক্ষে 'তাঁর' পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের অগ্রগতির জন্য গরবাচেভকে নিজের পার্টিকে টপকে সামাজিক আন্দোলনে গণ সমাবেশের জন্য আবেদন জানাতে হয়েছে। এইসব বিভিন্ন ধরণের শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের কার্যকারিতা সামাজিক রূপান্তরের দিকে, অগ্রগতি ঘটাতে কতোটা সাহায্য করবে, তারও পুনর্মূল্যায়ন দরকার।

তিন : গণতন্ত্রের দাবী এখন এমনই সুদূরপ্রসারী ও গভীর তাৎপর্যবহনকারী হয়ে পড়েছে যে, গণতন্ত্র শব্দটির অর্থও বহুলাংশে বদলে গেছে। গণতন্ত্রকে এখন সংসদীয় রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ধারণার পরিসরে সীমিত না রেখে সিভিল সোসাইটীতে 'সিভিল ডেমোক্রেসী'র স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করা দরকার হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক দাবী বলতে এখন আর কেবল সংসদীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রে এবং দেশের অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধতা, 'নোমেনক্লাচুরা' বা পার্টি আমলাতন্ত্রের সুযোগ সুবিধার অবসান ঘটানোর উদ্যোগ বোঝায় না, আরো অনেক কিছু বোঝায়। রাস্তা পর্যায়ে এবং স্থানীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হওয়া ছাড়াও, অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র এখন নিজেকে নানা ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক ও কমবেশী সাংগঠনিক চেহারা নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে চলেছে। এবং এই প্রকাশ ঘটে চলেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে। তাই গণতন্ত্র বলতে এযাবৎ যা বোঝা গেছে এবং বোঝানো হয়েছে, সেখানেও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ধারণাগত পরিবর্তন ও পরিমার্জনের।

চার : এইসব শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের জন্য তাদের দাবী দলীয় রাজনীতির আপেক্ষিক অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। বহু আন্দোলন ও তাদের সদস্যরা দলীয় রাজনীতির উপর তাদের একান্ত নির্ভরতা কিংবা মুখ্য হয় বাতিল করে দিয়েছে নয়তো নতুনভাবে তার সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করছে। কেবল তাই নয়, তারা জনগণ ও তাদের দাবিদাওয়াগুলিকে অন্যভাবে সমাবেশ ঘটাতে ও সংগঠিত করতে চেষ্টা করছে। তার জন্য ভিন্ন ধরনের সমাবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। এই সব আন্দোলন হলো সচেতন ও

CENTRAL LIBRARY

প্রকটভাবেই দলবিরোধী। অবশ্যই এই বিরোধিতা বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু অন্যান্য দলের ছত্রছায়ায় দাঁড়াতে কিম্বা নিজেরা দল গড়তে তারা অনীহা প্রকাশ করেছে। বেশ কয়েকটি সামাজিক আন্দোলন তাদের মুক্তির আশু লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পর রাজনৈতিক দলে নিজেদের রূপান্তরিত করার উদ্যোগ বাতিল করে দিয়েছে। যেমন পূর্ব জার্মানীর 'নিউস ফোরাম' (Neues Forum) তাদের কর্মীদের জাতীয় পর্যায়ের এক সভায় উপস্থিত আশি শতাংশ সদস্যদের ভোটে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দল হিসাবে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস্, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চেকোস্লোভাকিয়ার 'সিভিক ফোরাম'র সংগঠন 'ঢিলেঢালা ধরনের', তাদের কোন 'মাস্টার প্ল্যান, কোন নিজস্ব নিয়মকানুন নেই, এবং তাদের আন্দোলনের 'স্ট্র্যাটেজি কোন মাইনে করা উপদেষ্টাদের দ্বারা রচিত হয় নি।" হাঙ্গেরীয় সংস্থা 'লেফ্ট অল্টারনেটিভ' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন যে এটি হলো 'একটি তাত্ত্বিক প্রবণতা বা ঝোঁক, কোন দল নয়। বিপরীত পক্ষে বলা যায় এটি হলো সমাজের তলা থেকে গড়ে ওঠা একটি দলবিরোধী সংগঠন" (ইন্টারন্যাশনাল ভিউপয়েন্ট, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩)।

কিন্তু সে যাই হোক, আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা কোন না কোন দল, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন বা আছেন। বহু ক্ষেত্রেই এই সব আন্দোলন প্রত্যাশা করে যে, তাদের সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন দলেও সক্রিয় সদস্য থাকবেন, যদিও সেটা হবে তাঁদের ব্যক্তি হিসাবে ভূমিকা। কিন্তু এই সব আন্দোলন কিংবা আধা আন্দোলনের সাংগঠনিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সদস্যদের দীর্ঘদিন কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই দলের রাজনৈতিক দাবীদাওয়া কিংবা দলের প্রয়োজনের নামে সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খুবই মূল্যবান বলেই কেউ সহজে সেখানে আপোষে নারাজ। অন্য দিকে এইসব আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন বলেই তারা তাদের সামাজিক অবদান সম্পর্কে খুবই সচেতনভাবে দাবী করতে পারে যে, গণতন্ত্রকে আরেকটি দলের সঙ্গে তুলনীয় না করে কিংবা দল ছাড়াওআরেকটি সংগঠন গড়ে তুলে এইসব সামাজিক আন্দোলন বলতে চায় যে, গণতন্ত্রে অবদান কেবল তারাই রেখেছে এবং তারা দল গড়ার প্রশ্নে কোন আমল দেয় নি।

পাঁচ: পূর্ব ইউরোপের সমস্ত সামাজিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ এবং

CENTRAL LIBRARY

এথ্‌নিসিটি সংক্রান্ত প্রশ্ন যে নানা আকারে এসেছে সে কথা অনস্বীকার্য। এই আন্দোলনে যে সব উপাদান কাজ করছে, জাতীয়তাবাদ ও এথ্‌নিসিটি উপাদান হিসাবে সেখানে সর্বত্রই ছিল। শুধু রুশীদের বিরুদ্ধে হলেও জাতীয়তাবাদ এবং এথ্‌নিক নানা সমস্যা ও বিষয় জনগণকে এই সব আন্দোলনে সামিল করেছে এবং তারপর তাদের লক্ষ্যমাত্রা ও দাবী নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বালটিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে সামাজিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ বিরাট এক সামাজিক শক্তিরূপে আবির্ভূত এবং তাদের দাবীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য এথ্‌নিক, জাতীয় ও ধর্মীয় পার্থক্য ও দাবিদাওয়াগুলি যেমন সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে তেমনই পরস্পরের বিরুদ্ধে জনগণকে সামিল করতে সাহায্য করেছে।

সোভিয়েতের মধ্য এশিয় ও ট্রান্সককেশিয় অঞ্চলে এথ্‌নিক, জাতীয়তাবাদী (সামাজিক) আন্দোলনে তার প্রকাশ ঘটেছে। এই সব এথ্‌নিক জনগোষ্ঠী ও জাতিগুলি যেমন পরস্পর থেকে পৃথক, তাদের প্রতিটি আন্দোলনেও সেই পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত তাদের পরিস্থিতি ও পরিবেশও হলো অনন্য ধরণের। তা ছাড়া এই সব আন্দোলনের মধ্যে এই মুহূর্তে যেসব এথ্‌নিক ও জাতীয়তাবাদী দাবি-দাওয়া প্রাধান্য পেয়েছে তারা প্রতিটি গোষ্ঠীর কমবেশী সুবিধাভোগী শ্রেণীগত এবং কর্তৃত্ব ও অধীনতার ভৌগোলিক / রাজনৈতিক / অর্থ-নৈতিক অবস্থান এবং সেইসব ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অধিকতর জাতীয়তাবাদী ও এথ্‌নিক দাবিভিত্তিক বহু আন্দোলনে 'জাতীয়' রাষ্ট্র-ক্ষমতার দাবী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিংবা অগ্রাধিকার পেয়েছে। এইসব দাবীর ভিত্তিতে যে সব সামাজিক আন্দোলনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন ওঠে নি, তাদের সঙ্গে পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ছয়ঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার সমস্যা সামাজিক আন্দোলনগুলির সামনে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে এক অভিনব চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপের বিপ্লবগুলি বহুলাংশে যে সব শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন গুলির দ্বারা সম্ভব হয়েছে, যারা চলতি শাসন ব্যবস্থার উৎপাদন ও রাষ্ট্র ক্ষমতার পতন ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ক্ষমতা দখল করে এই শূন্যতা পূরণ করতে চায় নি। কিন্তু রাজনৈতিক রাষ্ট্রক্ষমতায় শূন্যতা প্রকট হয়ে উঠলে পূর্ব ইউরোপীয় সামাজিক আন্দোলনগুলি 'বাধ্য হয়েছে' রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের জন্য নিজেদের পুনর্গঠিত করতে। লিচ্‌ ভ্যালেসা ঘোষণা করেছেন 'সলিডারনোশ্চের' সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছে পোল্যাণ্ডে সরকার দখল করা। কিন্তু তার সামনে 'অন্য

কোন পথ ছিল না'। পূর্ব জার্মানীর 'নিউস ফোরাম' কিম্বা চেকোস্লোভাকিয়ার 'সিভিক ফোরাম' নিজেদের দলে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও পরিচালনার কাজে তৎসত্ত্বেও তাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কোন কোন সামাজিক আন্দোলনের সদস্যদের একদিকে আন্দোলনে এবং অন্য দিকে কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে 'দ্বৈত জঙ্গীয়ানা' দেখাতে হয়েছে। চেকোস্লোভাক আন্দোলনে বিক্ষুব্ধদের অগ্রণী নেতা ভাক্লাভ্ হাভেলকে রাষ্ট্রপতি হতে হয়েছে।

বস্তুত "মুক্তির" পরে যে রাজনৈতিক সমস্যা ব্যাপক ও জরুরী ভিত্তিতে দেখা দিয়েছে সেটি হলো রাষ্ট্র নিয়ে করণীয় কি তার মীমাংসা। দেশে বিদেশে মানুষ পূর্ব জার্মানীতে রাষ্ট্রের পতনোন্মুখ, রোমানিয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপর্যয়, এবং ঈশ্বর না করুন আপাদমস্তক পারমানবিক অস্ত্রে সজ্জিত সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙনের আশংকা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে। যেহেতু সুপার পাওয়ার রূপে তার কোন দায়িত্ব আর থাকছে না তখন পারমানবিক বোতাম টেপার কাজে কে নজরদারি করবে, অথবা বার্লিন ও বুখারেষ্টের পথে ঘাটে "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার" দায়িত্ব কে নেবে? এই ভয় শুধু সেখানে বা পূর্ব ইউরোপে নয় বিদেশেও দেখা দিয়েছে। (পূর্ব বার্লিনে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য বিদেশে চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ আবার চালু করার প্রস্তাব উঠেছে, আর মস্কোয় গরবাচেভের মঙ্গল কামনায় গির্জায় চলেছে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা) দেশের মধ্যে এই সংকট প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে। যদি "আমরা" নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ না করি অথবা আমাদের মিত্র যারা ক্ষমতাগ্রহণ করতে চায় তাদের সমর্থন না করি তাহলে অন্যরা ক্ষমতা দখল করতে এগিয়ে আসবে কিংবা আমাদের শত্রুদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করবে। তাই মুক্তি হোক বা না হোক, "মুক্তিকামী" সামাজিক আন্দোলনগুলি বাধ্য হচ্ছে চলতি প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংস্কার নয়, তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে (যাদের অন্যতম হলো রাষ্ট্র)। সিভিল ডেমোক্রেসীর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার আশা নিহিত রয়েছে কিভাবে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলি পুরানো আন্দোলনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে এবং পুরানো যে সব আন্দোলন চলতি প্রতিষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের অংশে পরিণত হয়েছে সেখানে নিজেদের মতো করে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবে।

সামাজিক আন্দোলনের দলে পরিণত হওয়া, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা দুনিয়ার

CENTRAL LIBRARY

অন্যত্র মোটেই কোন নতুন ঘটনা নয়। অনেক রাজনৈতিক দলের সূচনা হয়েছিল সামাজিক আন্দোলন রূপে, তাদের অনেকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টার মধ্যে কিংবা তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে। সামাজিক আন্দোলনের কালক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করা তাই কোন নতুন ঘটনা নয়। যেমন মেক্সিকোর "পার্তিদো রেভোলিউসিওনারিয়ো ইনস্টিটিউশন্যাল" (PRI) তার ৬০ বছরের দীর্ঘজীবনে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করেছে তেমনই নিজের প্রাতিষ্ঠানিকতার পরিচয় বহন করছে। বস্তুতপক্ষে পূর্ব ইউরোপে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশ কিছু কম্মিউনিস্ট পার্টি তাদের জীবন শুরু করেছিল পুরানো ধাঁচের 'পেটি বুর্জোয়া' নেতৃত্বে পরিচালিত "শ্রমিক শ্রেণীর" সামাজিক আন্দোলন রূপে। তৎসত্ত্বেও তারা কিংবা তাদের "নেতারা" শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো l'etat, c'est mois, 'আমিই রাষ্ট্র'।

পশ্চিম জার্মানীর গ্রীন মুভমেণ্ট বা দলের মধ্যে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে 'ফাণ্ডি' অর্থাৎ যারা আন্দোলনের মৌল লক্ষ্য ও পদ্ধতিতে অবিচল; এবং 'রিয়ালো' অর্থাৎ বাস্তবাদীদের মধ্যে যারা দল গড়তে চায়, রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের জন্য আপোষের পথে যেতে প্রস্তুত, ঠিক সেই ধরণের পরিস্থিতি পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলনসমূহের অভ্যন্তরে ও বাইরে রয়েছে। তাই বলা যায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা ধরণের জরুরী চাপ পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলনগুলিকে রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে ঠেলে দিতে অথবা আকৃষ্ট করতে পারে এবং ব্যর্থতার রাজনৈতিক মূল্য এড়াতে ও অত্যন্ত কঠিন ও জটিল অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার তাগিদে তাদের নীতির ক্ষেত্রেও আপোষের পথে যেতে হতে পারে। যেমন পোল্যাণ্ডে 'সোলিডারনোস্ক' নেতৃত্বকে বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রস্তাবিত কড়া ওষুধ সদস্যদের গেলার জন্য চাপ দিতে হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ও অন্য কিছু এথনিক আন্দোলন প্রায়ই 'স্বাধীন' জাতীয় রাষ্ট্র কিংবা প্রতিবেশী এথনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। যে সব অর্থনৈতিক সংকট তাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে, আন্দোলনে চালিকা শক্তি যোগান দিয়েছে তাদের মোকাবিলা করায় নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা গোড়ার দিকে তারা আমল দিতে চায় না।

সাত: পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রসারমান ও গভীর অর্থ-নৈতিক সংকট ও তার সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি এই সামাজিক আন্দোলনসমূহের

গঠনে ও জনসমাবেশের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তাদের চরম রাজ-নৈতিক লক্ষ্য এই গণসমর্থনের ভিত্তিতেই জোরদার হয়ে উঠতে পেরেছে। আশির দশক, বলা যায় বস্তুতপক্ষে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকেই সোভিয়েতে সেই অর্থ নৈতিক দুর্গতির সূচনা যাকে এখন বলা হচ্ছে "বদ্ধাবস্থা"। তার অভিঘাতেই পূর্ব ইউরোপে অর্থ নৈতিক সংকট দ্রুত বাড়ে এবং মানুষের জীবনমানে চরম অবনতির সূচনা হয়। বলা দরকার যে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও দুনিয়ার আরো কিছু অঞ্চলেও এই সময় থেকে অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিতে থাকে তীব্রভাবে। এই কালপর্বে পূর্ব ইউরোপে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবে পশ্চিম ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার নব্য শিল্পায়িত দেশগুলির তুলনায় আপেক্ষিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা ও মানে অবনতি প্রকট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-পরিচালনায় ব্যর্থতা যতোই সংকট ঘনীভূত করতে থাকে ততোই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির অভ্যন্তরে ও পারস্পরিক সম্পর্কে সামাজিক স্তরগুলির অবস্থানে প্রাধান্য ও নির্ভরতা অর্থাৎ সুযোগসুবিধা লাভের ও শোষণ ক্ষমতার অবস্থান্তর ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য যে অবস্থানের এই আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটেছে দেশ, অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টর, সামাজিক গোষ্ঠী সমূহ, এথ্‌নিক গোষ্ঠী এমন কি নারী ও পুরুষের সম্পর্কেও। এই সব অর্থ নৈতিক পরিবর্তন জনিত চাপ কোথাও সামাজিক বিক্ষোভ শুরু করেছে, কোথাও বা তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে উপেক্ষিত নানা দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য মানুষ পথে নেমেছে, আন্দোলনে সামিল হয়েছে, তা সে সামাজিক, এথ্‌নিক কিম্বা জাতীয়তাবাদী যাই হোক না কেন। তবে এই সব আন্দোলনের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই পার্থক্যও রয়েছে যথেষ্ট। একথা সুবিদিত যে বিক্ষোভ অর্থ নৈতিক কারণে ঘটতে থাকলে সমগ্রভাবে মানুষ যে 'অভ্যস্ত' উন্নত জীবনমান হারাতে বসেছে সেটাই ফিরে পেতে চেষ্টা করে এবং দেখতে চায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশে সংকটের জন্য অবস্থাগত যে পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে তার নিজের ঠাঁই কোথায়। অর্থ নৈতিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি এখন কোথায় কিভাবে তাকে স্পর্শ করবে সেটাই জেনে নেওয়া দরকার মনে করে। কারণ অধিকাংশ অর্থ নৈতিক সংকটেই দেখা যায় জনগণের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অংশ হয় চূড়ান্ত নয়তো আপেক্ষিকভাবে শক্তি ও স্বার্থের মেরুকরণে লাভবান হয়েছে এবং যারা ইতিপূর্বেই নীচুতলায় ছিল তাদের ও বিশেষত নারীর অবস্থান আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত দুই দিক থেকেই আরো খারাপ হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

এই পরিবর্তন উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই বিক্ষোভের সূচনা ও জোটবাঁধার প্রবণতা ঘটাতে পারে। যারা সুযোগ সুবিধা কম পেয়েছে তারা নিজেদের জীবনমান রক্ষা করতে এবং যে "ব্যবস্থা" তাদের দুর্দশার কারণ হয়েছে এবং তার থেকে দুর্নীতি ও অন্য নানাভাবে যারা লাভবান হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জড়ো হতে পারে। যে সব এথ্‌নিক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায় এই বিষয়টি লক্ষিত হয়েছে তারা হলো বুলগেরিয়ার তুর্কীরা, রোমানিয়ার হাঙ্গেরীয়রা, হাঙ্গেরীতে জিপ্‌সী ও অন্যান্যরা, সার্বিয়ার আলবেনিয়রা, যুগোশ্লাভিয়ার সার্বিয়রা, চেকোশ্লাভাকিয়ার বোহেমিয়রা, সোভিয়েত ইউনিয়নে আজারবাইজানী ও অন্যান্য বহু গোষ্ঠীর মানুষ, যাদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে বেকারত্ব একটা বিরাট সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী যারা তারাও বিক্ষুব্ধ বোধ করে এই জন্য যে এটা হলো এমন এক "ব্যবস্থা" যেখানে তাদের "অলস", "অপদার্থ" দরিদ্র প্রতিবেশীদের "বেঁচে" থাকার জন্য তাদের "খরচ করতে" কিম্বা "ভর্তুকী দিতে" বাধ্য হতে হচ্ছে। উপরন্তু এই সব বেশি সুবিধাভোগীর দল সমাজ-তান্ত্রিক কিম্বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাইরে, অন্যত্র তাদের অবস্থা আরো ভালো হতে পারে ভেবে বিক্ষুব্ধ বোধ করে। এই শেষোক্তদের দলে অনেক রুশ, আর্মেনিয় এবং সোভিয়েতের অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে, এবং বিশেষভাবে রয়েছে এস্তোনিয়, লাৎভিয় ও লিথুয়নিয়রা। এদের দলেই পড়বে শ্লোভেনিয়ার লোকজন, কিছুটা কম সংখ্যায় যুগোশ্লাভিয়ার ক্রোয়াশিয়রা, এবং অবশ্যই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বহু মানুষ পশ্চিমের অর্থ নৈতিক জীবন চুম্বকের মতো যাদের চোখ আর পা টানছে। সত্য সত্যই সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হোক বা না হোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড ও রোমানিয়ার বসবাসকারী হাজার হাজার "এথ্‌নিক জার্মান" হঠাৎই যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে তাদের আবেগ অনুভূতির গভীরে চাপা পড়ে থাকা জার্মানত্ব এবং ফেডারেল রিপাবলিকে ঘটতে থাকা জার্মান মিরাক্‌লের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। কোন বিশেষ এথ্‌নিক, জাতীয় কিংবা গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের বাইরে ব্যাপক জনগণের মধ্যেও এই ধরণের এককাট্টা হওয়ার, কিংবা অর্থনৈতিক কারণ উদ্ভূত বিক্ষোভ থেকে জোট বাঁধার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। এই সব দাবিদাওয়া খুব সহজেই রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সিভিল ডেমোক্রেসীর অংশ গ্রহণকারী ভূমিকায় প্রসারিত হয়ে সেখানেই নিজেকে প্রকট করে তুলতে পারে। তাদের এথ্‌নিক কিম্বা জাতীয়তাবাদী দাবিদাওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন

CENTRAL LIBRARY

রূপে প্রকাশ করার সম্ভাবনার কথা যদি আপাতত আমল দেওয়া না হয়, তাহলেও পূর্বোক্ত সম্ভাবনাগুলি উপেক্ষণীয় নয়। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্প্রতিক কালে তীব্র হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক বিক্ষোভ যে জনপ্রিয় আন্দোলনকে বাঁধ-ভাঙা রূপ দিয়েছে, সামাজিক (এথ্‌নিক কিংবা জাতীয়তাবাদী) আন্দোলনে ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, সে বিষয়ে আর তর্কের অবকাশ নেই।

আট : রণনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি দুনিয়ার ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে যা সামাজিক আন্দোলনসমূহের সূচনা ঘটাতে, অগ্রসর হতে এবং এযাবৎ তাদের সামাজিক শক্তি সমাবেশের সুযোগ বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ে সাহায্য করেছে। পূর্ব ইউরোপে এই দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বের দাবি করতে পারে ব্রেজনেভ নীতির বাতিলকরণ ঘটনা। বাস্তবিক পক্ষে গোর্বাচেভ ব্রেজনেভ নীতি সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমোদন পেয়েই হাঙ্গেরী-অস্ট্রিয়া সীমান্ত খুলে দেন, যার ফলে পূর্ব জার্মানী থেকে বন্যার স্রোতের মত মানুষ দেশ ছাড়তে থাকে। তাঁর পূর্ব জার্মানী সফরকালে সেখানকার নেতা এরিখ হোনেকারের গালে চুম্বন দেওয়া সত্ত্বেও, এটা যে মৃত্যু চুম্বন ছিল, তখন না বোঝা গেলেও পরে দেখা গেছে সেটা ছিল মৃত্যু চুম্বনের সামিল। কারণ জানা গেছে তখনই তিনি বলে যান লিপজিগে সমাবেশ শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা ব্যাহত করতে চাওয়া হলে, সোভিয়েত বাহিনী তখন কিন্তু দমনকারীদের সাহায্যার্থে যাবে না। এটাই ছিল গত ৯ই অক্টোবরের আলোচনার মর্মবস্তু। শুধু তাই নয় তিনি এই বলেও সতর্ক করার চেষ্টা করেন যে, আন্দোলনকারী ও তাদের দমনকারী এমন পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ কোথাও মুখোমুখি লড়াইয়ের স্তরে এলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে সোভিয়েত বাহিনী দুই পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারে।

খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেই পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত সামাজিক (তথা এথ্‌নিক/ জাতীয়তাবাদী) আন্দোলনগুলিতে জনসমাবেশের পথ প্রশস্ত করেছে ; আবার এরাই এক দিকে পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের সাফল্যের জন্য জনসমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করছে এবং অন্যদিকে এই বিপদেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আন্দোলন লাগাম ছাড়া হয়ে গেলে তখন সবটাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পোল্যাণ্ড ও চীনের

ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, পেরেস্ত্রৈকা এক চরম সীমাবদ্ধতার অধীন, যেহেতু গ্লাসনস্তের রাজনৈতিক সংস্কার না ঘটলে এই আন্দোলন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। অন্যদিকে হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, তারা পাশাপাশি অনেক দূর যেতে পারে এবং যতোদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ততোদূর তাদের একত্রেই যেতে হবে। সেইজন্যই বিদেশের অভিজ্ঞতাথেকে শিক্ষা নিয়ে গোর্বাচেভ নিজেই পরিষ্কার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সফল পেরেস্ত্রৈকার ভিত্তি হলো গ্লাসনস্ত। আর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সুপার পাওয়ারের অবস্থান দূরে থাক, সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি শক্তি হিসাবে টিকে থাকতে হলে সফল পেরেস্ত্রৈকা হবে তার পূর্বশর্ত। একথা স্ববিরোধী মনে হলেও সত্য যে. ব্রেজনেভনীতির রাজনৈতিক বাস্তিসকরণ এবং পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক বোঝা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছুটা "মুক্তি" হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের রণনৈতিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে আবশ্যিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ।

এক কথায় বলা যায়, এই সব রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরিবর্তনগুলি এই সমস্ত সামাজিক আন্দোলনে জনসমাবেশ ঘটাতে, তাদের সফল করে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও পরিবেশ সৃষ্টিকারী উপাদানরূপে কাজ করেছে। তাছাড়া সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে তার বিশেষ প্রকাশ একদিকে সরাসরি অর্থনৈতিক কারণভিত্তিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে পরোক্ষে অর্থনৈতিক তাগিদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব করে তুলে এই সব সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ও তাদের আপেক্ষিক সাফল্যলাভের পথ সুগম করেছে। অবশ্য এই সব রণনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলি আরো গভীর বিশ্লেষণ দাবী করে।

নয় : এই সব ঘটনার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস অনেক তিক্ত বাস্তবতাকে আড়াল করে রেখেছে। গণতান্ত্রিকতার সাফল্য আর মুক্তির মধুচন্দ্রিমা এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও মেরুকরণের সমস্যাগুলিকে জনপ্রিয় আন্দোলনের একেবারে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আন্দোলনের ইঞ্জিন আপাতত চলেছে শুধু রাজনৈতিক বাষ্পের জোরে। তাকে কখনো ঠেলে নিয়ে চলেছে কখনো বা জ্বালানির যোগান দিচ্ছে সাধারণ মানুষের সামাজিক আন্দোলন। এই সব দেশে বিশেষত পশ্চিম দুনিয়ার সংবাদপত্রে এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে দেখানো হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের

পথে মানুষের আনন্দ অভিযানরূপে। এটা অনেকাংশে ঠিক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কারণ কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রক্রিয়া ও সমস্যাগুলি শুধু রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের জোয়ারে বদলায় না।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্গতির তিক্ত বাস্তবতা প্রতিদিন জনগণকে সচকিত করে তুলছে পোল্যাণ্ডে এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিরাট অংশে। হয়তো বা কিছুটা কম পরিমাণে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সোভিয়েত দেশে। খাদ্য রপ্তানীর বিপর্যয়কারী প্রতিক্রিয়া থেকে রোমানিয়া হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা রেহাই পেয়েছে কিন্তু অন্য সমস্যা-গুলি একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। তাদের জনগণের খুব সামান্য অংশই জানে কিংবা আপাতত হিসাব করতে চায় অর্থনৈতিক বাস্তবতার অভিঘাত কতোদূর গড়াতে পারে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক যাত্রা যে দিকে শুরু হয়েছে সেটাও ঠিক ট্রেনের মতোই রেলপথের অবস্থা, লাইন, গীয়ার, সুইচ প্রভৃতির বাস্তব অবস্থার মতোই তার গতিবেগকে মন্থর করে দিতে পারে।

তবে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সামাজিক আন্দোলন উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি দেশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর যে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম সে বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন। যেমন পোল্যাণ্ডে এবং অন্যত্র দেখা গেছে এর মধ্যেই বিরাট মাপের অর্থনৈতিক সমস্যার বোঝা সামাজিক অন্দোলনে যোগদান-কারী নানা অংশকে তাদের স্থানচ্যুত করে ফেলেছে। ফলে যারা স্থানচ্যুত হয়েছে তাদের রাগ ও ক্ষোভ রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা গৌণ করে অর্থনৈতিক সমস্যাকে মুখ্য করে তুলছে। জনগণের বিভিন্ন অংশে পরস্পরের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন সামাজিক আন্দোলন জনগণের অপেক্ষাকৃত অগ্রণী যে অংশকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত বেশি অসুবিধাভোগীরা সোচ্চার হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, এই অগ্রণী অংশও বলতে শুরু করেছে দেশের কিছু অপদার্থ, নিষ্কর্মা মানুষের জন্যই (অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া কম সুবিধাভোগী অংশের) তারা এগিয়ে যেতে পারছে না। আর প্রায় সবাই মিলে দোষারোপ করছে আন্দোলনের চালক, পথপ্রদর্শক এবং সম্ভবত সমগ্র আন্দোলনকেই। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং অত্যন্ত সঠিক ভাবেই এইসব আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত মানুষই চাইবে তার নতুন পাওয়া গণতন্ত্রকে, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুফলগুলিকে তার নিজের জরুরী সমস্যার সমাধানে, স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাতে। তা ছাড়া জরুরী সমস্যার সমাধান

সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। এহেন অবস্থায় কেউ কেউ মনে করছে যে অন্য কেউ, অন্য কোন পদ্ধতিতে হয়তো বা তাদের পরিত্রাতারূপে আসতে পারে। এই সঙ্কট কালে পপুলিস্ট নেতার অভাব হয় না যারা সমস্যা সমাধানের অভিনব পন্থা নিয়ে হাজির হয় এবং বিক্ষুব্ধ মানুষদের আকৃষ্ট করতে পারে। সার্বিয়ার নেতা মিলোসেভিচ তাঁর সমর্থন জানিয়ে এর মধ্যেই এক ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সম্ভবত অন্যত্রও অল্পকালের মধ্যেই এথ্‌নিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি, স্লোভেনিয়া ও পূর্ব জার্মানীর আন্দোলনের অগ্রণী অংশগুলি হয়তো আরো পশ্চিমঘেঁষা বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আল্‌গা কিংবা জোরালো ধরণের সম্পর্ক গড়তে চাইবে। (বিগত কয়েক মাসে পূর্ব জার্মানীতে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে এবং আগামী ডিসেম্বরের শুরুতেই দুই জার্মানী এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে একীকরণ সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করবে।) কিন্তু আন্দোলনের পিছনের সারির মানুষদের কাছে কোন বিকল্প গ্রহণযোগ্য হবে সেটি এখনও খুব পরিষ্কার নয়।

তাই যে সামাজিক আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে মুক্তির বাহন রূপে হাজির হয়েছিল, সেগুলিই শেষ পর্যন্ত নিজেদের সৃষ্ট রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিপদের কারণ হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে উদ্ভূত কিংবা অন্যান্য সামাজিক আন্দোলন এথ্‌নিক, জাতীয়তাবাদী, এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও অন্যান্য নানা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিতে পারে যাদের পরিণতি সম্পূর্ণ অজানা। সেখানে যদি সদ্য অর্জিত গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পপুলিস্ট একনায়কত্ব-বাদী প্রতিঘাত দেখা দেয় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

দশ : ১৭৮৯, ১৮৪৮, ১৯১৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৮৯ সালের বিপ্লব ও সামাজিক আন্দোলনগুলির (তবে জাতীয়তাবাদী নয়) ঐতিহাসিক তুলনামূলক আলোচনা এবং তারই সঙ্গে রাশিয়ার ভূমিকা ও অবস্থানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গত করা দরকার। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েতের বর্তমান পরিবর্তনকে একটি চলিষ্ণু প্রক্রিয়া বলে সিদ্ধান্ত করার বদলে ১৯৮৯ সালের বিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমি নির্ণয়ের জন্যই এটা জরুরী। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব ছিল সূচনা পর্বে শান্তিপূর্ণ, পরে তা হিংসাশ্রয়ী হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর প্রতিবিপ্লবে পরিণত হয়। পুঁজি-বাদের পথ অধিকতর প্রশস্ত করার জন্য এটা ছিল একটা "বুর্জোয়া" বিপ্লব, কিন্তু

"সামন্তবাদের" বিরোধিতা করার জন্যই এই বিপ্লব হয়নি। পরে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের অংশ রূপে ভিয়েনায় রাশিয়া একটি ইউরোপীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতার উপরে শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক, উভয় ধরণের আঘাত এসেছিল। কিন্তু তাদের সবগুলিকেই নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হয়। তাই এই সব বিপ্লব রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থার উপর তখনই উদারনৈতিক বুর্জোয়া নীতিসমূহ চাপিয়ে দিতে পারে নি, যদিও পরবর্তীকালে তাদের অনেক নীতি ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়েছে। তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক আন্দোলন অবশ্যই তেমন কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বিকাশ মধ্য ইউরোপে রুশ প্রভাবের অবসান সূচিত করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার ভূমিদাসদের মুক্তি দেন এবং তাঁর নিজের ধারণা অনুযায়ী একা পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত শুরু করেন। কিন্তু তাতে ব্যাপক কোন ফল পাওয়া যায় নি।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিপ্লবের সূচনা শান্তিপূর্ণ ভাবেই ঘটেছিল, কিন্তু জারদের কাছ থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেরেনস্কি সরকারের হাতে আনার সময় ক্রমে শক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল চলতি সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবেই চাপ দেওয়া ও ভয় দেখানো। কিন্তু বিপ্লবী প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে থাকায় রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর সশস্ত্র আঘাত হানা হয়। আঘাতের সাফল্য প্রমাণিত হয় কিন্তু তার থেকেই ঘটে গৃহযুদ্ধ ও পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠ যুদ্ধোত্তর ইউরোপে সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর (সামাজিক) আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং রুশ দেশেও বিপ্লবী শক্তিসমূহের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল শ্রমিক শ্রেণী। গৃহযুদ্ধে তাদের সংখ্যা আরো কমে যায়। [তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে লেনিন ব্রেস্ট লিটভস্কে এক স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি করেন এবং বিজয়ী পক্ষ যুদ্ধ শেষে নিজেদের মধ্যে রাজ্য ও অন্যান্য সুযোগের যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে রাশিয়া (সোভিয়েত সরকার) উক্ত চুক্তির জন্য সেই ভাগ হারায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিজয়ী পক্ষের শরিক হিসাবে এবং ইয়াল্টা ও পটসড্যাম্ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া ভাগে পায় ও গ্রহণ করে মধ্য ইউরোপে প্রাধান্যের ভূমিকা। তারই বর্তমান পরিচয় পূর্ব ইউরোপ। এর অল্প কালের মধ্যেই দুনিয়ার সুপার পাওয়ার রূপে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে।]

১৯৬৮ সালের বিপ্লবগুলি ছিল মুখ্যত শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন, যা প্রায়ই শক্তি প্রয়োগ করে ভেঙে দেওয়া হয় যদিও তাদের কোনটাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার কিংবা তার সামনে বিরাট কোন বিপর্যয় ঘটাবার মতো অবস্থায় যায় নি। এই সব "নতুন" সামাজিক আন্দোলনের একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলি শ্রমিক শ্রেণী ভিত্তিক বা তার নেতৃত্বাধীন ছিল না। অপর দিকে ১৯৬৮ সালের আন্দোলনগুলির মাধ্যমে এই স্বীকৃতি আসে যে এই সব সামাজিক আন্দোলনের আবেদন "চিরায়ত" (শিল্প) শ্রমিক শ্রেণী, তাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং/অথবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে ছাড়িয়ে ব্যাপক জনগণের মধ্যে পৌছে দিতে হবে। যদি ১৯৬৮ সালের আন্দোলনগুলির মধ্যে "প্রাগের বসন্ত" কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে বলতে হবে সেখানে লক্ষ্য ছিল চলতি রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যেই ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ঘটানো। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনীর সামরিক আক্রমণের মধ্যেই তার মোড় ঘুরে যায়। ১৯৬৮ সালে ভিয়েতনামে "তেত্ আক্রমণ" অবশ্যই আরেক ধরণের ঘটনা। তখন সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে এখানে সেখানে চ্যালেঞ্জ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।

১৯৮৯ সালের বিপ্লব ব্যাপক ও গভীরতাদ্যোতক শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন রূপেই শুরু হয়েছে। তাদের প্রবক্তাদের বিস্মিত করে এই আন্দোলন অতি দ্রুত সফল হয়েছে এবং সিভিল সোসাইটিতে সিভিল ডেমোক্রেসী প্রতিষ্ঠা ও সচল করে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পেরেছে। সর্বশেষে 'ডোমিনো থিয়োরী' পূর্ববর্তী ঘটনা সমূহে যার আশংকা ছিল কিন্তু প্রয়োগ করা হয়নি, এবারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই কাজ করে। তার সাফল্য অংশত সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে এবার সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে সামাজিক আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কিংবা বহিরাগত কোন শক্তি আন্দোলন ব্যর্থ করতে এগিয়ে আসেনি। যার ব্যতিক্রম অপেক্ষাকৃত "স্বাধীন" রোমানিয়া, যেখানে অবশ্য সৈন্যবাহিনী জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের পক্ষ নেয়। দেশের শাসন ব্যবস্থার উঁচু তলায় প্রতিরোধের এই মৃদু প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি ও নীতি পরিবর্তনের জন্য। এই সব আন্দোলনের সামনে যেখানে শাসনব্যবস্থার উঁচু তলায় বিপর্যয় ঘটে যায় সেখানে কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং যে সব প্রতিষ্ঠান "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিশ্রুতি" দেয় কার্যত তাদের সাড়া শব্দ ছিল না। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে বহু

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ ভয় পেয়ে যান এই ভেবে যে অবস্থা কোন দিকে গড়ায়। হয়তো বা এই ভয় বা আশংকা হলো ব্যর্থতার লক্ষণ কিংবা আশা করা যেতে পারে এটা হলো দেরিতে পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধির ঘটনা। এই সব দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যে প্রসার ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলেছে হয়তো তার যুগান্তকারী তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে না পেরে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি উক্তিকে ভিন্নভাবে বললে এটা ছিল পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে সিভিল সোসাইটিতে সিভিল ডেমোক্রেসীর প্রসার অর্থাৎ "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের গণতন্ত্র।"

একই সঙ্গে এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার গভীরে অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তারা গুরুত্ব অনুসারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের কঠোর বাস্তবতা এই সব সামাজিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গতিমুখ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘোরাতে না পারলেও কিছুটা বিচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে। যদি ১৯৮৯ সালের মতো ১৯৮৯ সালও ইতিহাসে বিপ্লবের বছর রূপে চিহ্নিত হয়, তাহলে ১৯৯০ এবং চলতি দশকের ঘটনাবলী কি ১৭৯০ এর দশকের মতো কিছু সৃষ্টি করবে? কোন ধরণের প্রতিবিপ্লবী থার্মিডরের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কিংবা আদৌ আছে কিনা, ঠিক এই মুহূর্তে তার চিন্তা করার দরকার নেই। আফগানিস্তানে সামরিক ব্যর্থতা থেকে শুরু করে (তাকে কি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বলা হবে?) অর্থনৈতিক ব্যর্থতার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের "সাম্রাজ্যিক" প্রসার এক নিদারুণ চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যার প্রচণ্ড অভিঘাতে এই "ইউনিয়ন" হয়তো ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। সেই রাশিয়া, সেটা "সোভিয়েত" থাক্ বা না থাক্, আপেক্ষিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু সেটি হবে সম্পূর্ণত পুনরুজ্জীবিত, শক্তিশালী এক রাষ্ট্র।

এগারো: এই সব ঘটনায় প্রকৃত বিদ্যমান সমাজতন্ত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেছে তার পুনর্বিবেচনা দরকার। এইসব ঘটনা ও রূপান্তরের কারণ খুঁজতে গেলে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যমান (অ)সমাজতন্ত্রের পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যর্থতাকে নিয়ামক উপাদান বলে চিহ্নিত করতে হয়। একথা সুবিদিত যে কেন্দ্রায়িত পরিকল্পনা অধীন অর্থ-নীতিতে (অধিকতর পরিমাণে ইন্‌পুট বা উৎপাদনের মালমশলা কাজে লাগিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই তৈরি করা গেছে কিন্তু ভোগ্যপণ্য বাড়েনি) বাধ্যতামূলক

CENTRAL LIBRARY

ভাবে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ভারী শিল্প এবং কোন কোন দেশে বৃহদায়তন শিল্পভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের রমরমা দেখা গেছে। সামাজিক সেবামূলক কাজের পরিধি বেড়েছে এবং সুনিশ্চিত করা গেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সেই কাজের প্রসার ঘটেনি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সমভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সব অনমনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়নের নিবিড় অগ্রগতি ঘটেনি (যেমন যন্ত্রপাতি আরো উৎপাদনশীল, কম পরিমাণে উপকরণ খরচ করে উৎপাদনকে আরো বৈচিত্র্যধর্মী করে তোলা সম্ভব হয়নি)। সাম্প্রতিক কালের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পটভূমিতে বিশেষত পশ্চিম দুনিয়ায় কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার চালু হলে, এমন কি পূর্ব এশিয়ায় নতুন শিল্প সমৃদ্ধ দেশের আবির্ভাব ঘটতে থাকলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্রায়িত অর্থনীতি আর তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। বরং বিপরীত পক্ষে বলা যায় চরম ও আপেক্ষিক উভয় অর্থেই তারা পিছু হঠেছে। এই সব সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবের এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা-বিন্দু।

অর্থনৈতিক ব্যর্থতার জন্য "সমাজতন্ত্র" জাতীয়তাবাদের প্রতিযোগী হয়েই উঠতে পারেনি। প্রথমে যুগোশ্লাভ ও হাঙ্গেরীয় জাতীয়তাবাদ, সর্বোপরি পোলিশ জাতীয়তাবাদ এবং সম্প্রতি বাল্টিক এলাকা, ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশিয়া, ইউক্রেন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যত্র জাতীয়তাবাদ ও এথনিসিটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করছে। কারণ সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারলে এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা এই ধরণের গণতন্ত্রের দাবি গড়ে ওঠার কোন সুযোগ থাকতো না, আর অর্থনীতির বাজারীকরণের কোন প্রশ্নই উঠতো না।

পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য সঠিক ভাবে বোঝার জন্য অবশ্য দুনিয়ার অন্যত্র বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে একটা প্রাসঙ্গিক তুলনা করা দরকার। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সমগ্র আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় জীবন যাত্রার মানে বিপর্যয়কর অবনতি ঘটেছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির পটভূমিতে তাদের অবস্থানের আপেক্ষিক প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে। তাদের অনেকের দুর্গতি পূর্ব ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি। তবে সম্ভবত পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং হয়তো ব্রহ্ম-

দেশের অবস্থা এই অবনতির শীর্ষে রয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বাইরে এই সব দেশেও সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি এখানকার মতো ফলপ্রসূ হয়নি, এমন দূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েও অগ্রসর হয়নি। আফ্রিকার বহুক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রবণতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে পড়েছে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও সংশয় জেগেছে। কোথাও কোথাও এথনিক ও জাতীয় মুক্তির জন্য আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়েছে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের মতো নাটকীয় পরিবর্তন কোথাও ঘটেনি। লাতিন আমেরিকার বহু দেশেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু সেখানে সামাজিক আন্দোলনগুলি দাবি যাই করুক না কেন কার্যত গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন কেবল প্রান্তিক ধরণের হয়েছে মাত্র। যেমন আর্জেন্টিনায় গণতন্ত্রীকরণের নাটকীয় প্রক্রিয়া যতোটা না ঘটেছে মাদ্রেস দ্য লা প্লাজা দ্য মেয়ো ও অন্যান্যদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তার চেয়ে বেশি জোরালো ভাবে কাজ করেছে মার্কিন দেশের সামরিক সাহায্য ও সমগ্র পশ্চিম দুনিয়ার রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট বৃটিশ সামরিক শক্তির কাছে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের জন্য। ব্রহ্মদেশে সামাজিক আন্দোলন সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমন করা হয়েছে। কম বেশি একই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বহু দেশে, চিলি থেকে মেক্সিকো, জ্যামাইকায়, গ্যাবনে, এবং শ্রীলঙ্কায়। এদের যে কোন দেশেই পূর্ব ইউরোপের মতো জোরালো সামাজিক আন্দোলন দেখা গেলে রক্তের বন্যায় তা ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতো।

একই ধরণের তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই ঘটনা যে এদের মধ্যে কোন দেশেই ব্যর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সংগঠন বদলে কোন র‍্যাডিকাল বিকল্প গড়ে তোলার জন্য কার্যকর কোন চেষ্টা হয়নি, তাই তার সাফল্যের প্রশ্ন ও ওঠেনি। অর্থাৎ এই সব দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অতিক্রম করার চেষ্টা হয়নি। বরং অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে বলা যায় সর্বত্রই বাজারী-করণের (অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার) দিকে আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে। পরিবর্তনের সব উদ্যোগ উল্টো পথে চলতে চেয়েছে। উপরন্তু পূর্ব ইউরোপে "সমাজতন্ত্রের" ব্যর্থতা এই প্রবণতা আরো জোরালো করে বাজারীকরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। সেখানকার ব্যর্থ পুঁজিবাদের সামাজিক মূল্য যতো বেশি হোক না কেন, সমাজতন্ত্রের দিকে কোন আকর্ষণ লক্ষিত হয়নি। লাতিন আমেরিকার নব গড়ে ওঠা "গণতন্ত্রগুলির" কোথাও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

CENTRAL LIBRARY

সংস্কারের প্রস্তাব ওঠেনি, "রপ্তানী বৃদ্ধিমুখীন বিকাশের" তাগিদ দেখা যায়নি। সেটা চিলির মতো চরম বৃদ্ধি অথবা আর্জেন্টিনার মতো সার্বিক অবক্ষয় কোনটাই দেখা যায়নি। বিপরীত পক্ষে এখানে গণতান্ত্রিকতার যেটুকু প্রসার ঘটেছে, তাকে নিপীড়নমূলক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি সংস্থা ও অন্যান্যদের চাপে) গ্রহণ করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার বানচাল করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে।

এই ধরনের সব অভিজ্ঞতার উল্লেখ্য ব্যতিক্রম হলো ইরান। সেখানে শাহ আপাদমস্তক সামরিক সাজে সজ্জিত সরকারকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা চালালেও সমাজ জীবনের গভীরে সক্রিয় সামাজিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মাধ্যমে তাকে ব্যর্থ করে শাহের শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে মৌলবাদী আয়েতুল্লা খোমেইনি, যিনি এই ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত সামাজিক আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে একটি শিয়াপন্থী ইসলামী তত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্টার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। খোমেইনীর সরকার একই সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের সমান ভাবে ও ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং সুন্নি শাসিত ইরাকের বিরুদ্ধে দশ বছর ধরে লড়াই চালিয়েছেন। ইরান ও ইরাকের জনজীবনে এই যুদ্ধের বিপুল বোঝা তাদের কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সে বিষয়ে খোমেইনীর বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। পেট্রল বিক্রির টাকায় দুই দেশ যুদ্ধের ব্যয় বহনে কার্পণ্য করেনি।

তাই বলা দরকার কেবল সমাজতন্ত্র নয়, বহু পুঁজিবাদী দেশ ও মিশ্র অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা সাম্প্রতিক কালে ব্যর্থ হয়েছে, যার অন্যান্য কারণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থানে যাওয়ার চরম অক্ষমতা। অবশ্য এটাই চিরকাল ঘটে থাকে। কোন প্রতিযোগিতাতেই সব প্রতিযোগী জিততে পারে না। অধিকাংশকেই হারতে হয়। এই হারজিৎ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া কিন্তু কাজ করে চলে ব্যবস্থা নির্বিশেষে। কে কার প্রতিদ্বন্দ্বী, তারা কোন ব্যবস্থার অধীন সেইসব বিষয়গুলি হয়তো চূড়ান্ত বিচারে কিছুটা অবদান রাখে, কিন্তু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র তার নিয়ামক উপাদান হতে পারে না। তাই অর্থ নৈতিক ব্যর্থতা ও "সমাজতন্ত্রের" হার স্বাভাবিকভাবেই বিচার করতে হবে পুঁজিবাদী বিশ্ব বাজারের পটভূমিতে পুঁজিবাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে। একটি ব্যবস্থার জায়গায় আরেকটি ব্যবস্থা চালু করা

হলেই একটি দেশের অর্থনীতি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এই বাজারী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বেশির ভাগ দেশকেই হার স্বীকার করতে হবে।

"সমাজতন্ত্র" থেকে সরে আসা, পূর্ব ইউরোপে বাজারীকরণের প্রসার এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতার বাজারের সঙ্গে তাদের উত্তরোত্তর সংযুক্তি ঘটে চলেছে এমন একটা সময়ে যখন তাদের নিজেদের পথে চলার ব্যর্থতা ও ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই তারা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরাট বিপদের কারণ, যার থেকে তাদের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা আরো বাড়তে এবং জনগণের রাজনৈতিক প্রত্যাশায় মোহভঙ্গের কারণ ঘটতে পারে। তেমনটি ঘটলে তার প্রত্যাঘাতের আশঙ্কাও থাকবে।

পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংকট স্বল্প মেয়াদি ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সংকটের ক্রমবর্ধমান গভীরতা ও বাজারীকরণের প্রাথমিক চাপ নানা পণ্যের অনটন বৃদ্ধি, বেকারত্ব, ব্যাপক মুদ্রা-স্ফীতি ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এই সব কারণ, বিশেষত শেষেরটি বিশেষভাবে আঘাত করবে নারী ও শিশুদের, যাদের উপর ইতিমধ্যেই যে অসম বোঝার চাপ পড়েছে সেটি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একই সঙ্গে পেরেস্ত্রৈকা ও অর্থনৈতিক অগ্র-গতির প্রচেষ্টা সুরু করার পরামর্শ গর্বাচেভকে দিয়ে আবেল আবেগায়ান ঠিক কাজ করেন নি। তার ফল হয়েছে অর্থনৈতিক (এবং রাজনৈতিক) বিপর্যয়, কারণ পুনর্গঠন করতে গেলেই অন্ততঃ সাময়িক ভাবে উন্নয়নের হার বৃদ্ধির বদলে তাকে কমিয়ে দেয়। আবার তার সঙ্গে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়াতে চাপ দেওয়া হয় তাহলে সব রকমের প্রতিকূলতাই কাজ করে।

পূর্ব ইউরোপেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করতে গেলে নানা আকারে ও মাত্রায় উত্তরণপর্বকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে। নিঃসন্দেহে পোল্যাণ্ডে, যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নে তার তীব্রতা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি। কারণ তাদের অর্থনীতিই ছিল তুলনায় দুর্বল এবং সম্প্রতি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। চাওসেস্কুর সব কিছু রপ্তানী করে ঋণ শোধ করার নীতিও রোমানিয়াকে প্রভূত দুর্বল করে দিয়েছে। সেই রপ্তানী বন্ধ করা গেলে কিম্বা কম করা হলে, বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে হয়তো কৃষিতে সমস্যার চাপ কমবে, কিন্তু শিল্প সমস্যার সমাধান তার মধ্যে নেই। পূর্ব জার্মানী যে সমস্যায় এখনই

CENTRAL LIBRARY

পড়েছে তার নাম হলো "আউসফেরকাউফ" বা পশ্চিম জার্মানীর কাছে নিঃশেষে সব কিছু বিক্রি করে দেওয়া। দলে দলে পশ্চিম জার্মাণরা আসছে পূর্ব জার্মানীর বাজারে সরকারী তর্তুকি দানে সস্তা ভোগ্যপণ্য কিনতে, যেখানে পশ্চিম জার্মানীর এক টাকার (মার্কের) বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব জার্মানীর দশ বা কুড়ি টাকা। অবশ্য পূর্ব জার্মানী দীর্ঘ দিন ধরেই পশ্চিম জার্মানীর বাজারে ঢোকার সুযোগ বাবদ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর নীরব সদস্যে পরিণত হয়েছিল। এখন অচিরে সরাসরি তার পক্ষে এই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সহজ হবে।

কিন্তু পূর্ব জার্মানীতে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে তার নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে কনফেডারেশন গড়ে উঠুক কিম্বা সংযুক্তি যাই হোক না কেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম জার্মানী, ইউরোপীয় গোষ্ঠী কিম্বা ইউরোপের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার দুর্বলতা তাকে আদৌ দর কষাকষির সুযোগ দেবে না। অন্যদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা এহেন দুর্বলতার জন্য হারায় নি বলে তাদের পক্ষে প্রতি-যোগিতামূলক দরকষাকষির ক্ষমতা বজায় রাখা বেশি সম্ভব হবে। তাই তাদের জনগণ কিম্বা তার অংশ বিশেষকে কিছুটা বেশি সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারবে। বস্তুতঃ উৎপাদনশীল সংযুক্তি ঘটাতে গেলে পূর্ব ইউরোপের সব জায়গা থেকে উৎপাদনশীল সম্পদ বিক্রি করে দিতে হবে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছে। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের কোন সম্পদ কেনার প্রশ্ন উঠলে তার ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য চড়া দর হেঁকে কেনার সামর্থ্য পূর্ব ইউরোপে বিশেষ কারো থাকবে না। হয়তো খুবই ছোট খাটো কিছু প্রতিষ্ঠান "সমবায়" নাম দিয়ে এইভাবে চালানো যেতে পারে কিন্তু কারবার হিসাবে তাদেরও বাজারী প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

পূর্ব ইউরোপের সামাজিক আন্দোলন বাজারীকরণ ও ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের জন্য যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে "পুঁজিবাদী" কিম্বা "সমাজতান্ত্রিক" যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সেটি চূড়ান্ত বিচারে এক ধরণের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের জায়গায় আরেক ধরণের মেরুকরণ ঘটাবে। কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে সেখানে যে ধরণের দুর্নীতি ও সুযোগ সুবিধার বিলিব্যবস্থা ঘটেছিল বহুলাংশে তাদের অবসান ঘটানো গেলেও একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বাজারীকরণ ও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন আরেক ধরণের আয় ও সামাজিক অবস্থানগত অর্থ নৈতিক

CENTRAL LIBRARY

ও রাজনৈতিক মেরুকরণ স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে যথাক্রমে নারী ও পুরুষ, শ্রেণী সমূহ, এথ্‌নিক গোষ্ঠী ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। এই পরিবর্তনের ভাঁটা ও জোয়ারের টানে একটি সংখ্যালঘু অংশ ক্রমেই মুখ্য হয়ে উঠবে আর সংখ্যা-গরিষ্ঠরা তলিয়ে যেতে থাকবে ক্রমাগত। এই মেরুকরণ এথ্‌নিক ও জাতীয়-ভিত্তিতে, এবং শেষে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ঘটে যাওয়া সম্ভব। তাই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথ্‌নিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিদের সম্পর্কে উত্তেজনা, বিরোধ ও নানা ধরণের আন্দোলন মাথাচাড়া দেওয়ার প্রভূত সম্ভবনা রয়েছে।

যে সমস্ত অঞ্চল ও জাতি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের বিচারে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে পশ্চিম ও উত্তরের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংযুক্তির জন্য তাদের অবস্থা অচিরে আরো ভালো হয়ে ওঠা সম্ভব। এই দেশে সুযোগসুবিধা বঞ্চিত সংখ্যালঘুরা এবং অন্যত্র সুযোগ সুবিধা বিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবস্থানে ক্রমেই বেশিমাত্রায় প্রান্তি-কীকরন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন খুব কম ক্ষেত্রেই বাস্তব হয়ে উঠতে পরে। খুব বেশি হলে পূর্ব ইউরোপ তথা সোভিয়েতের কোন কোন এলাকা আরেকটা দক্ষিণ ইউরোপে পরিণত হতে পারে, যদিও তার জন্য দক্ষিণ ইওরোপের সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। বর্তমান দক্ষিণ ইওরোপে এরই মধ্যে সেই আশংকা দেখা দিয়েছে। তবে পূর্ব ইউরোপের অনেক অঞ্চলে এবং সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রকৃত যে বিপদের সম্ভবনা ঘনিয়ে উঠেছে তা হলো লাতিন আমেরিকাকরণের ভীতি। এই ভয় পোল্যাণ্ডে এরই মধ্যে সত্য হয়ে উঠেছে। পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশে মুদ্রার অবলুপ্তায়ন দেখা দিয়েছে। তাদের অর্থব্যবস্থায় কোন সংস্কার করতে হলে কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই সংস্কারের জন্য সামাজিক মূল্য দিতে হবে সুনিশ্চিতভাবে, কিন্তু তার অর্থনৈতিক সাফল্য ঘটবে কিনা বলা যায় না।' অন্ততঃ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় তার যে উপর্যুপরি ব্যর্থতা দেখা গেছে সেটা মানতেই হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক আফ্রিকেয়করণের (আফ্রিকানাইজেশন) বিপদ কিম্বা অংশতঃ মধ্যপ্রাচ্যীকরণের (মিড-ইস্টারনাই-জেশন) আশংকা এবং রাজনৈতিক লেবাননীকরণের সম্ভবণা মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে "দ্বিতীয়" দুনিয়ায় ভাঙ্গন তার কোন কোন

সদস্যকে হয়তো "প্রথম" দুনিয়ায় (পুঁজিবাদী) যোগদানের সুযোগ দেবে, কিন্তু অধিকাংশের অদৃষ্টে রয়েছে আরো পিছিয়ে গিয়ে "তৃতীয়" দুনিয়ার (সেটাও পুঁজিবাদী) শরিকে পরিণত হওয়া।

বারো : সুতরাং আরেক ধরণের সমাজতন্ত্র কি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে, সেই প্রশ্ন আজ উঠতেই পারে। সেটি সত্য হলে কিভাবে আসবে, আর তার চেহারা কেমন হবে? নিজেদের যাঁরা সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেন তেমন কোন কোন মহলে বারেবারেই প্রশ্ন ওঠে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ কিম্বা দুনিয়ার অন্য কোন কোন দেশ কি আদৌ সমাজতন্ত্রী হয়েছে বা ছিল? যেহেতু তাঁদের উত্তরে সব সময়েই জোরালো ভাবে 'না' বলা হয়ে থাকে তাই তাঁদের বক্তব্য লক্ষ্য করা দরকার। প্রকৃত বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও সমালোচনা যে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের বিপ্লবে পর্যবসিত হয়েছে সেটাই প্রমাণ করে যে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে "সমাজতন্ত্র" ছিল না। সেগুলিকে "প্রকৃত সমাজতন্ত্রের" বিকৃতি কিম্বা তার প্রতারণা বলা উচিত, যেহেতু সেগুলি ছিল "স্তালিনবাদ"। এই যুক্তির মতাদর্শগত তাৎপর্য হলো এই সব ব্যর্থতা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যমাত্রাকে আদৌ ম্লান করেনা। তাই প্রকৃত সমাজতন্ত্রীদের এই ব্যর্থতা দেখে আত্মধিক্কার দেওয়ার, আত্মসমালোচনা করার যন্ত্রণাদায়ক মূল্যায়নের কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে প্রকৃত সমাজতন্ত্রীদের করা দরকার হবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের এমন সমালোচনায় উদ্যোগী হওয়া যাতে "মন্দ ওদের" থেকে "ভালো আমাদের" সহজেই পৃথক করা যায়। এই "তত্ত্বের" বাস্তব তাৎপর্য হলো অভিজ্ঞতা যা-ই বলুক না কেন, প্রকৃত সমাজতন্ত্র দুনিয়ায় এখনো আসেনি, সেটি আসবে কিম্বা আসতে চলেছে।

অবশ্য এই ধারণার প্রকৃত বাস্তবতা ও তাত্ত্বিক সঙ্গতি সারা দুনিয়ার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। যেমন প্রথমেই বলা দরকার এই যুক্তি এমন এক বক্তব্য উপস্থিত করেছে যেন কথাগুলি যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কিম্বা নিজের থেকেই আস্থাবান হয়ে উঠেছে তাদের আশ্বস্ত করার মতো। কিন্তু বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, সেটা যদি প্রকৃত সমাজতন্ত্র নাও হয়ে থাকে, তাহলে এই যুক্তিতে তাদের মন টলানো যাবে না। কারণ এযাবৎ বিদ্যমান সমাজতন্ত্র (সেটি আসলে যাই হোক) যারা এখন বাতিল করে দিয়েছে তাদের মানসিকতায় সম্ভাব্য "প্রকৃত" সমাজতন্ত্র প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। বাস্তবিক পক্ষে তাদের অনেকেই এখন বাজার নামের যাদুতে বিশ্বাস করতে আগ্রহী এবং অনেকেই দুঃখের কথা হলেও বলা দরকার,

চরম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দিকেও আকৃষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে যারা তাদের পুরানো সুযোগ সুবিধাগুলি হারাবে তারা নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "হারানো সুদিনের' জন্য, পুরানো (অ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করবে। এদের মধ্যেই যাদের পুরানো সুযোগ সুবিধার ভুক্তাবশেষ এখনো রয়ে গেছে এবং সেগুলি হারাবার আশংকা দেখা দিয়েছে তারা পুরোনো-দিনের স্মৃতিতে এমন এক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাইতে পারে, সেটা যদি পুরানো "কমিউনিস্ট শাসন" নাও হয়, তাহলে নতুন কোন "ফ্যাসিস্ত" ব্যবস্থাও হতে পারে। কেবল তারাই যারা আগেকার পার্টির কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিল; তারা নতুন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে পুরানো জমানার দেওয়া সুযোগ সুবিধা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করতে পারে। সোসাল ডেমো-ক্রেটিক যুক্তি সেইসব মানুষদের কাছে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনা যারা আগে কখনো নিজেরা বা অন্যরা কোন ধরণের "সমাজতন্ত্র" বা "কমিউনিজমের" অভিজ্ঞতালাভ করুক আদপে চায়নি কিম্বা সহ্য করতে পারেনি। সুতরাং পুরানো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাপ বা অন্যায়মুক্ত নতুন প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে, নাম তার গণতান্ত্রিক বা অন্য যা কিছু হোক না কেন, এই ধরণের চিন্তা ধার। অবাস্তব মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তির সাবজেক্টিভ উদ্দেশ্য যতো স্তালিনবিরোধী হোক না কেন, অবজেক্টিভ পরিণতির দিক থেকে এখানে "একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র" কিম্বা আরো ছোট কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্তালিনবাদী ধারণার অচল অবস্থা বজায় রেখে চলেছে। একদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্যা এবং তত্ত্বে ও প্রয়োগে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণের সমস্যা অস্বীকার করা ছাড়াও, এই যুক্তি সেই বাস্তবতার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ যে এক্ষেত্রেও সারা দুনিয়ার সঙ্গে তাকে এককভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হবে। অথচ এই অক্ষমতাই হলো স্তালিনবাদী সমাজতন্ত্র বা অন্য যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তার ব্যর্থতার মূল কারণ। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, মিশ্র অর্থনীতি অথবা ইসলামীয় রাষ্ট্রতান্ত্রিক অর্থনীতি, যে কোন নামের ব্যবস্থাই হোক না কেন, কোন দেশের মানুষ যে ব্যবস্থা নিজেরা পছন্দ করে নিক্ না কেন, জীবনের অতি বাস্তব ঘটনা হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলার সুযোগ বা সামর্থ্য কারো নেই। বিকল্প হিসাবে সহযোগিতা অবশ্যই খুব শ্রুতিসুখকর, তবে সেটা টিকে থাকতে পারবে যতোদিন তার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত সমাজতন্ত্রের (একমাত্র) বিকল্প ব্যাখ্যা হতে পারে "বিশ্ব" সমাজতন্ত্র। নিকট ভবিষ্যতে সেটি কায়েম হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, আর দূর ভবিষ্যতে তার অর্থ কি দাঁড়াবে সেটা ভাবাও কঠিন। তা ছাড়া বিগত হাজার বছরের মতো অনাগত কালেও জীবনের বাস্তব সত্য হিসাবে যদি প্রতিযোগিতার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকে তাহলে "বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে" "বিশ্ব পুঁজিবাদ" থেকে আলাদা করা যাবে কি ভাবে ?

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যদি অচল হয়, তাহলে সোসাল ডেমোক্রেসীর সুদিন আসা কি সম্ভব ? পূর্ব ও পশ্চিমের একদা "সমাজতন্ত্রীরা "যাদের মধ্যে এমন কি মিখাইল গর্বাচেভ্ও রয়েছেন, তাঁরা সোসাল ডেমোক্রেসীর নতুন মূল্যায়ন করে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, যেহেতু তাঁদের মনে হয়েছে বহু আকাঙ্খিত বস্তু "সমাজতন্ত্র" ও "গণতন্ত্র"কে সোসাল ডেমোক্রেসীর মধ্যেই মেলানো যেতে পারে। তাঁরা এবং গর্বাচেভ এখন বিশেষ আগ্রহে সুইডেন এবং মাঝে মাঝে অষ্ট্রিয়ার দিকে চেয়ে দেখছেন যে, পূর্ব ইউরোপ এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নেও তাদের মডেল হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা। "নিউ কমন ইউরোপীয়ন হোম" গঠনের স্থাপত্যের যে নকশা কল্পনা করা হয়েছে সেখানে অনেক সমাজতন্ত্রী ও ও সোসাল ডেমোক্র্যাটরা সচেষ্ট থাকবেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের না হলেও পূর্ব থেকে আসা সোসাল ডেমোক্রেটিক প্রভাব পশ্চিমেও সঞ্চারিত করতে। তখন সারা ইউরোপ হয়ে পড়বে বড়ো মাপের সুইডেনের মতো। যেমন গান্ধীকে একবার যখন প্রশ্ন করা হয় ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে তিনি কি মনে করেন, তখন তিনি জবাবে বলেন "সেটা তো বেশ ভালোই একটা কথা"। তবে দুর্ভাগ্যের কথা হলো এই ভালো কথা, ধারণাগুলি কঠিন বাস্তবতাকে হিসাবের মধ্যে বড়ো একটা ধরে না।

তাই বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যা মোটেই বাস্তব-সম্মত নয়, পূর্ব ইউরোপের সুইডেনীকরণ সম্ভব করার খুব একটা আশা দেখা যায় না। অন্য দিকে পূর্ব ইউরোপে কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক সোসাল ডেমোক্রেসী গড়ে তোলার জন্য অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থাপন, এমন কি তাদের চলতি কিছু কিছু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা কিছু পরিমাণে বজায় রাখার জন্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানকেও অনেক কিছু করার দায় মানতে হবে। পশ্চিম জার্মানীর সাহায্য কিম্বা একটা ইউরোপীয় মার্শাল সাহায্যদান পরিকল্পনা পূর্ব ইউরোপে সোসাল ডেমোক্রেসী প্রতিষ্ঠায় কতোটা কিম্বা আদৌ

CENTRAL LIBRARY

সাহায্য করবে কিনা, সেই বিষয়টি যথেষ্ট অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এই প্রচেষ্টা পূর্ব ইউরোপে আরো প্রগতিশীল সোসাল ডেমোক্রেসী (অর্থাৎ কম বা বেশি পরিমাণে সোসাল ডেমোক্রেসী কিম্বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র) কার্যকর করে পশ্চিম ইউরোপে রক্ষণশীল রাজনীতি ও দলের পরিমাণ কমাতে সফল হবে কিনা সেটাও সুনিশ্চিত নয়। ভালো ব্যবস্থায় লগ্নী (কিন্তু অলাভজনক সামাজিক লগ্নী নয়) পূর্ব ইউরোপে যেমন তেমনই পশ্চিমেও খুব সহজে মেরুকরণ ঘটাতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে "নতুন" সামাজিক আন্দোলন, পূর্ব ও পশ্চিমে, উভয় এলাকাতেই অগ্রগতি ঘটাতে এবং এই মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে পারে।

তাই "সমাজতন্ত্রীরা" নিজেদের "সমাজতান্ত্রিক" মতাদর্শে অবিচল থাকতে গেলে, জীবনের কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে "সমাজতন্ত্র" সম্পর্কে নতুন চিন্তা না করে পারে না। এখানে সেই প্রচেষ্টা দূরে থাক তার ভানটুকুও করা হয়নি। আর সেটা কেবল আমরা করলেই হবে না। বাস্তবসম্মত চিন্তা দাবি করে যে, এই ধরণের যে কোন সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিচার করতে বাধ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে হবে যেসব নিয়ম কানুনের অধীনে প্রতিযোগিতা ঘটে থাকে, সেখানেও কোন পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে কিনা। হয়তো প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী বদলের দরকার অনুভূত হবে। লিঙ্গগত, শ্রেণীগত, জাতীয়, এথনিক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ও অন্যান্য সমস্ত স্বার্থ গোষ্ঠী, পরিবার ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতিকে এখন নতুন ধরণের অংশগ্রহণকারী সামাজিক (আন্দোলনগত) অভিব্যক্তি অর্জন করতে হবে, পেতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার, পরস্পরের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের নিশ্চয়তা, এবং স্বার্থগত যে কোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশ্বাস, যে সব নিয়ম ও ধারণার অস্তিত্ব এযাবৎ দুনিয়ায় জানা ছিল না! বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় এই ধরণের কোন "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" বা অন্য কিছুর সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। বস্তুতঃ যা দেখা যাচ্ছে এবং অভিজ্ঞতা যে কথা বলে যে যা ঘটছে তা যদি ঘটতে থাকে এবং আরো খারাপের দিকে যায়, তাহলেই ভালো কিছু ঘটতে পারে। ঘটনাবলী আরো খারাপের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এতোই বেশি যে মানবপ্রজাতি এক সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং, কিম্বা সামরিক রাজনৈতিক অবস্থাগত সংকটের মুখে এসে দাঁড়াতে পারে যেখানে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংকটের চেহারা এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে মানুষের

CENTRAL LIBRARY

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব মনে হবে। তখন সেই প্রজাতিগত মৃত্যুর সম্ভাবনা মানুষকে নতুন করে বাঁচার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে যখন মানুষ চিন্তা করবে এখন সবাই মিলে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাই হলো একমাত্র পথ।

সাহায্য সূত্র :

(১) সামির আমিন, গিয়োভান্নি আরিঘি, আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক ও ইম্যানুয়েল ওয়ালেরস্টাইন : ট্রান্সফর্মিং দি রেভোলিউশন : সোশাল মুভমেণ্টস ইন ওয়ার্ল্ড সিস্টেম, নিউইয়র্ক, মান্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৯০।

(২) আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক : দি ইউরোপীয়ান চ্যালেঞ্জ : ফ্রম আটলান্টিক এ্যালায়েন্স টু প্যান ইউরোপীয়ান আঁতাত, স্পোক্‌স্‌ম্যান বুক্‌স্‌, ইংল্যাণ্ড, ১৯৮৩।

(৩) আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক ও মার্টা ফুয়েন্টেস : সোশাল মুভমেণ্টস ইন রিসেণ্ট ওয়ার্ল্ড হিস্টরি, ১৯৯০।

(৪) মার্টা ফুয়েন্টেস ও আন্দ্রে গুণ্ডের ফ্রাঙ্ক : টেন থিসিস অন সোশাল মুভমেণ্টস, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮।

CENTRAL LIBRARY

সময়ের সন্তাপ ও অস্তিত্বের বন্ধন ক্ষয়

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

॥ এক ॥

যা আজও চিন্তা করা হয়নি, যা আজও অকল্পনীয়, যা আজও সম্ভাব্যের সীমার মধ্যে আসবার জন্যে ব্যাকুল, তার জন্যেই তো মানুষের যত কিছু আয়োজন, উদ্যোগ। নিশ্চয়ই তা কোনো পুরোনো লুপ্তপ্রায় জীবনচর্য্যার, ও জীবনবোধের পুনঃচর্য্যার জন্যে নয়। কেননা মানব অস্তিত্বের নতুন জন্মের অহঙ্কারই তো মনুষ্যত্ব, চারিত্র, বিবেক, ব্যক্তিত্ব। সেই হিসেবে কোনো স্বজ্ঞাকে যৌক্তিক সীমানার মধ্যে যদি পৌঁছে দেয়ার দুঃসাহস দেখানো যায়, তাহলে তা হোক, আজ যাকে নিষেধে, প্রত্যাখানে, অবরোধে, অবিশ্বাসে, আত্মশ্লাঘা, অপমানে, ফিরিয়ে দিতে চাইছেন অনেকে, হোক না কেন তা সত্যের অগম্য রহস্যের উন্মোচনের উৎস মুখে ফিরে যাওয়া, আর সেই যাওয়াইতো প্রচল সিদ্ধান্ত গুলির বিপক্ষে যাওয়া, যা দুঃসাহসিক, অন্যভাবে বললে বলা চলে মতান্তর এবং সৎসাহসও।

আজ যে বিপুল ঢেউ উঠেছে পূর্ব ইউরোপ জুড়ে, সোভিয়েট ও রুশ অঙ্গ সাধারণতন্ত্রগুলির দেশে দেশে, সে কি শুধু জীবন ভোগ্য, কিছু উপকরণ, কিছু উন্নতমানের জীবন আহরণের জন্যে? বিশ্বজোড়া অগণ্য মানব ভাবনাকে এমন সংকীর্ণ সীমায় দেখতে চাইলে লজ্জা পাওয়া উচিত। যেমন আজকে অনেক কিছুকে এলোমেলো, সঙ্গতি হারানো, অমিত্রতা বলে ভাবা হচ্ছে, সেকি শুধুই কোন এক সামাজিক সূত্র শিথিল হয়েছে বলে? সমাজকে শৃঙ্খলা দেবার জন্যে যে অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, নাম তার যাই হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক বা অন্য কিছু, কিংবা পণ্য বিনিময় ও বিনিয়োগের যে ব্যবস্থাই কিংবা বাজার অর্থনীতি বা খোলা বাজারের প্রতিযোগিতামূলক খোলা দরজার নীতি বা অধিকতর গণতন্ত্র ও অধিকতম স্বাধীনতাধ্বনি, তারই জন্য? সেই কি শেষ কথা? আজকের দুনিয়াজোড়া নানান প্রশ্ন, অস্থিরতা, আলোড়ন, সমাজতন্ত্রের আয়ু নিয়ে, গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে, স্বাধীনতার সত্য মূল্য নিয়ে, এই কি হওয়া উচিত শেষতম প্রশ্ন? এর

CENTRAL LIBRARY

সমাধান যোগ্য কিছু পথ আবিষ্কার করলেই কি বিশ্বজোড়া মানব অস্তিত্বের সঙ্কটের সর্বশেষ সর্বযোগ্য উত্তরটি পাওয়া গেল !

সত্য যদি সাহসের কোনো দিগ্বিজয়ী পরিচয় হয় তাহলে বলতেই হবে, সমকালের শিকড়ে আছে সংস্কৃতির সঙ্কট। এই বন্ধন ক্ষয়ই মানব অস্তিত্বের বন্ধন ক্ষয়। বিশ্বভরা সমস্যার সমাধানের, একমাত্র অতিক্রমণের পন্থা।

॥ দুই ॥

ঝোড়ো যুগের মাঝেই আসে দিনবদলের পালা। বিশ্ব আজ এক কালসন্ধির দুর্যোগময় ঘন রাত্রি অতিক্রম করছে। আরও একবার বিশ্বের মানব অস্তিত্ব গভীর সংশয়ে অনুতাপে নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পার হবে কি না হবে সে অন্য কথা, প্রথম কথাটিই হল সত্য বোঝার জন্য চিন্তার স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। জীবন, সমাজ, শিক্ষা, আদর্শ, ন্যায়, যুক্তি, ব্যক্তিতা, সকল ক্ষেত্রেই এই বাণীটি ঐকান্তিকভাবেই অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য। এই প্রয়োজনেই কিছু প্রশ্ন আবশ্যিক উঠবেই।

যথা : সংস্কৃতি কী ? সংস্কৃতির অর্থ কী ? সংস্কৃতির কি কোনো সর্বান্তিবাদী সংজ্ঞা আছে ? নাকি সংস্কৃতি শুধুই এক স্বজ্ঞা ? রূপায়ণবাদ ? নাকি অগম্য সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে অন্বেষ চঞ্চলতা ? আরও আঁতের কথায় যদি যেতে হয় তাহলে বলব; সংস্কৃতির সত্যিকারের ধুয়োটা কি ?

আজও অবধি এই সারস্বত অনুসন্ধান একেবারে অপ্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। জিজ্ঞাসার ভুবন রয়েছে নির্বাকে। এমনতর গভীর উৎসুক প্রশ্নগুলি এক অতি প্রয়োজনিক উত্তর থেকে মানব অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের বেদনা বয়েই মরছে। কোবিদজনের আজও পর্যন্ত কেউই সংস্কৃতির স্বরূপ কি, অদ্বৈত অর্থে বিশ্লেষণ করতে সাহস পাননি। শব্দ ও ভাষার যোগে, সখ্যে, দৃপ্য করে তুলতে পারেননি কেউই প্রাতিভ ও সুবেদিতার প্রেক্ষণ কেন্দ্র থেকে, বোদ্ধার মননে, চিন্তন ক্রিয়ায় সংস্কৃতির ফলিত অবয়বটিকে। দুঃখের কথাই বলতে হবে, সভ্যতা কী, সভ্যতা নির্ণায়ক সর্বজন বোধ্য যোগ্য সংজ্ঞার্থে একটি মাপকাঠি কি আজও আমাদের অস্তিত্বের কাছে ছায়াবাদীতায় অপ্রতিভ হয়েই রয়েছে না কি ?

তবে স্বস্তির কথা, বুদ্ধির প্রান্তরে কোনো শ্রেয়স প্রয়াস যে হয়নি তা নয়। সংস্কৃতির একটি বৈধ জ্ঞান লাভের চেষ্টা আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অস্তিত্বের সমগ্র স্বরূপকে দৃশ্যস্থ করতে জীবনে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে প্রযত্ন

চলছে। অস্তিত্বের গভীরতম স্তর থেকে যখনই কোন বিষম দুঃসময় অনতিক্রম্য অমারাত্রি হয়ে নেমে আসে তখনই শুরু হয় প্রযত্ন আত্মঅন্বেষণ। যেমনটি হচ্ছে আজকের ইউরোপ, সোভিয়েট সহ সমূহ বিশ্বের দেশে দেশে।

॥ তিন ॥

সংস্কৃতির বহুমুখতা, ভিন্ন ভিন্ন বিবুধজনের মনন ক্রিয়ায় বহুরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কমল হীরের পাথর নির্গত জ্যোতিই হল কালচার। এটা তার প্রতীকী বিশ্লেষ। কেউ বলেছেন নতুন মানুষ তৈরী করাই সংস্কৃতি। কেউ বলেছেন ন্যায়, যুক্তি, ব্যক্তির অনন্যতন্ত্রতা, চিত্ত মুক্তি, সকল রকম জড়ত্ব, সংস্কার মুক্তি প্রথা ও শাসনমুক্ত জীবনই সংস্কৃতি। কেউ বলেছেন লাবণ্যময় জীবনবরণই সংস্কৃতি।

আবার কেউ বলেছেন, ব্যক্তিতার, প্রাতিস্বিক স্বতঃসিদ্ধ মুল্যবোধের সংগে সমাজ-ব্যূহত্বের ঐকপত্যের সার্থকায়নই সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেক্ষণ বিন্দুগুলিকে বেশী মূল্য দিতেন। কেননা যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ; সত্যান্বেষ, বিশ্বমানবতার প্রত্যয়, তাকে চিন্তার এক দার্শনিক শৃঙ্খলায় প্রশ্রয় দিয়েছিল। এ হল ইউরোপীয় রেঁণাশাসী দান।

এই দানের উত্তরাধিকার খণ্ডিত হল শ্রেণীবোধের সংকীর্ণ কোঠায়। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীরা শ্রেনী স্বৈরকর্তৃত্বকেই সর্বহারার সংস্কৃতি বলেই প্রকৃত মানব সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিলেন। কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ সংজ্ঞার্থেই হিংসাত্মক সমাজ ব্যবস্থা। তাই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সত্য হল ঘৃণা আর হিংসা। ঘৃণা আর হিংসা ছাড়া শ্রেণী সংস্কৃতি গৃহহীন হয়ে পড়ে। গোর্কি ঘৃণা পর্যন্ত গিয়েই তুষ্ট ছিলেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরওকিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, শুধু ঘৃণা নয়, শুধু উন্মোচন নয়, শুধু ব্যাখ্যা নয় প্রতিরোধ নয়, বিপ্লবী সাহিত্য সংস্কৃতির অনিবার্য ও অপরিহার্য্য অঙ্গ হল বিপ্লবী হিংসা। শ্রেণী শত্রুর শারীরিক হন্যতাও এর অন্তর্গত। নির্য্যাতন, নির্বাসন দণ্ড, অন্তরীণ, শ্রম শিবির ইত্যাদি, কারাদণ্ডকেও ম্লান করেছে।

সোভিয়েটে নিঃস্তালিনী যুগের আগের দশকগুলিতে সন্ত্রাস, প্রাণদণ্ড, গুপ্ত হত্যা, বিনা বিচারে বন্দী, চির কালীন নির্বাসন, দেশ জোড়া বন্দীশালা শ্রম শিবিরের জীবনে মৃত্যু, নিষ্ঠুর অত্যাচার, শুধু শরীরী নয়, মানসিক, মনস্তাত্বিক,

পীড়ন মানুষকে বিকৃত করে দিত। সর্বহারার শ্রেণী সংস্কৃতির সংগে এই নৈতিক নির্য্যাতন ও মানবাচরণ সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে বরিস পাস্তেরনাকের ডঃ জিভাগো সোলঝেনিৎ সিনের 'ওয়ানডে' গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ, ক্যানসার ওয়ার্ড, দি ফার্সট সার্কল এর স্মৃতি।

এই সবই সোভিয়েট সামাজিক শাসনের স্বরূপ উন্মোচনমূলক সাহসিক সাহিত্য। লাগামহীন বর্বরতা ও আইনের তামাসা, অসহনীয় যন্ত্রণা ক্লান্তি তিক্ততা রিক্ততার প্রত্নছবি।

॥ চার ॥

ইতিহাসে মানব স্বভাবের, মানব মনের, মানব প্রবৃত্তির অভিজ্ঞায় আরও কিছু সংস্কৃতি সংজ্ঞার সংবাদ পাওয়া যায়।

যেমন সকল শিল্পই গীতাভিমুখী, তেমনি সকল সংস্কৃতিই অস্তিত্বগামী। যেমন বলা যায়, বনে বনে পাতা ঝরে যায়। নিষ্পত্র বনে বসন্ত ফেরে। বনের গাছে, পাতায় সারা অরণ্য সবুজিকী হচ্ছে। বৃক্ষগুলি কিন্তু নিঃশ্চল। তারা স্থান পরিবর্ত্তন করছে না। অচঞ্চলতার অঙ্গে অঙ্গে চঞ্চলতার নৃত্যকলা, কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে।

এই সাজবদল আমাদের চোখের আলোর বাইরেই বয়ে যায়। এই যে চোখের দেখাকে ফাঁকি দিয়ে নিত্যকালের নবীনত্বের সম্ভাষণ, এর মধ্যে যে সত্য আছে, এ কথা তলস্তয়বাদীদের কথা। তারা বলেন, ইতিহাস কারোর হাতে তৈরী নয়। তুমি ইতিহাসের আসা যাওয়া দেখতে পাওনা। তুমি ইতিহাস তৈরী করতে পার না। তুমি শুধু দেখতে পাও একটি তৃণের বড় হওয়া, যেমন কাঙাল বসন্ত ফেরে বনে বনে।

বাইবেলের একটি বাক্যধৃত অর্থকে তলস্তয় বড় মান্য করতেন, তা হল, যাহারা দেহ হত্যা করে, আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, তাদের ভয় করোনা। ভয় করবে তাকেই যে দেহ ও অন্তরলোককে দুটোকেই হত্যা করে।

তলস্তয় বলতেন, আমাদের সমস্ত সাধন, সত্যের সাধন, যা দেহমনের সমস্ত বন্ধনকে ক্ষয় করবে। মুক্তি দেবে। জাসপার্স বলতেন আমাদের জীবন চর্য্যার লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধুই অস্তিত্ব রক্ষা নয়, সত্তাস্থিত সত্তার নিরন্তর উৎক্রমণ। এই উৎ-ক্রমণই সত্য। এই অবিরত অস্তিত্বের স্তরান্তরিত অতিক্রমণ, এ হল উৎকৃষ্ট সর্বোচ্চ জ্ঞানের লক্ষ্য। এই অতিক্রমণের ইতিহাসই হল দর্শন। নিত্যদর্শন, বিশুদ্ধ দর্শন।

তলস্তয়ের কাছে খ্রীষ্টধর্ম অতীন্দ্রিয়বাদ, শূন্যতার দর্শন ছিল না, ছিল সত্যকে বোঝবার একটি প্রয়াস যা সৎসাহস।

কিন্তু লেনিনই প্রথম তলস্তয়কে একদিকে রাশিয়ার দর্পণ বলে স্তুতি করে, শ্রেণী গত খণ্ডিত দৃষ্টি কোন থেকে তলস্তয়কে দু'ভাগে ভাগ করলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তলস্তয় বিভক্ত হলেন অংশত প্রগতিশীল, বৃহৎ অংশে প্রতিক্রিয়াশীল। এই প্রথম মানব অস্তিত্বের নিখিলময়তা ও অস্তিত্বের চিত্রময় প্রকাশ সংস্কৃতির বিভাজন রেখা শুরু হল। কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস যা কখনো করেননি। লুনাচার্স্কির সংগে লেনিনের একটি কথোপকথন যুক্ত লেখায় দেখা যায় লেনিন বলছেন, যে শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে, তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় ও গুণে মাত্রায় বড়ই অল্প, যেন তারা প্রতিক্রিয়ার খপ্পরে না পড়ে। যদিও আমি শিল্পের সমজদার মনে করিনে নিজেকে। কিন্তু লেনিনই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় ভেদ আনলেন এবং তিনিই তলস্তয়কে তাঁর রেণেসাঁশের উত্তরাধিকারের বিশ্বগত মানবতার জীবনাদর্শকে মাঝখানে একটা মোটা কালো দাগ টেনে দিয়ে প্রতিভজনের সামগ্রিক জীবন, চিন্তা, আদর্শকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। সমগ্রতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই যে জীবনের সমগ্র সত্যকে সত্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা তা তিনি দেখাতে পারেন নি। শ্রেণী, শ্রেণীর অস্তিত্ব, শ্রেণী সংঘর্ষ, শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের শেষে, শ্রেণীর সীমার বাইরে বহুদূর প্রসারিত মানব সংসার অগণ্য মানব অস্তিত্ব, যার জন্যে চাই বিশ্বভরা, বিশ্বজনীন মানবতা বোধের দৃষ্টি, শ্রেণী সত্যকে আত্মস্থ করেই যে বিরাজমান নিত্যকালের মনুষ্যত্ববোধ, সর্বোচ্চ মানব্য সে কথা লেনিনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

শ্রেণীর সংকীর্ণ কোঠায় ফেলে মানব জীবন, মানব অস্তিত্বকে বিচারের সর্বনেশে নেশায় সকল দেশেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ স্থপতিগণ ধিকৃত, অবহেলিত, বর্জিত হয়েছেন। তলস্তয় ডস্টয়ভস্কি, রঁমারঁল্যা, গ্যয়টে, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত মোটা কালো দাগে বিভক্ত হয়েছেন। আজও তারা কুণ্ঠিত হয়েই আছেন বিশ্বজন সমাজে।

এখেন দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির একটি অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা দেখতে পারি। মিথ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, সত্যের প্রতি আমাদের ঋণ ও দায়। মানুষের মর্য্যাদায় বিশ্বাস।

সুতরাং সত্য বোঝার জন্যে আমাদের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য।

॥ পাঁচ ॥

ইতিহাসকে বিভিন্ন কাল বিভাগে বিভক্ত করেছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানীরা। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক যুগে ভাগ করেছেন ইতিহাসের ধারাকে। তারই সংগে সাম্য রেখে আদিম সাম্যবাদী, সামন্ত, বুর্জোয়া, সমাজতান্ত্রিক, পরিণামে সাম্যবাদী ইত্যাদি নামে সমাজ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন, সমাজ বিজ্ঞানীরা। ইতিহাস হল মানব অস্তিত্বের অবিচলিত বিবর্ধনের এক প্রসারণ সাধ্য নিরন্তরতা। তাকে কোন কাল চিহ্ন দিয়ে সীমা নির্দ্ধারণ করা যেমন ঐতিহাসিক নয়, তেমনি নয়, বুদ্ধিগত।

ইতিহাসকে যেমন কোন কাল বন্ধনে বাঁধা যায় না, তেমনি মানব অস্তিত্বের নিরবধি উৎক্রমণের ইতিহাসকেও বাঁধা যায় না। তেমনি যায় না সংস্কৃতিকেও। সংস্কৃতি হল একটি আস্রবণ। মানব মনের নানান প্রেক্ষিতে ধৃত এমন একটি দলিল, যার মধ্যে এসে মিশে মিলিয়ে গেছে এমন অনন্ত ভাবরাশি, এমনি একটা প্রতিন্যাস যা পরিণামে একটি সত্যকেই প্রকাশ করে।

যেমন ধরা যাক একটি শিল্প নির্মিতির কথা। একটি শিল্প হাজার হাজার বছর পরেও তা শিল্পই থাকবে। কেন থাকবে? কোন গুণে? কোন সত্যে? কোন সুবেদিতায়? সে একটি সত্যের শক্তিতে থাকবে। কালের প্রাচীর তার কাছে ভেঙে পড়ে, সকল কাল বৈশিষ্ট্য অহঙ্কার হারায়, সকল রূপ রূপের অতীত হয়ে যায়, সকল চিহ্ন মিলিয়ে যায় ওই সত্যের আলোতে। এ সত্য লিখে রাখা যায় না। যার চির মহোজ্জ্বল মূর্তি লেখা হয়ে যায় বোদ্ধার মননে, চিন্তন ক্রিয়ায়। তাই শিল্পে দ্বিত্ব বলে কোন কিছু নেই। সংস্কৃতিতেও তাই।

শুনি নাকি সংস্কৃতি শব্দটি বৈদিক শব্দ। কেউ বলেন, এই শব্দটির মধ্যে মানব অস্তিত্বের কৃতি ও সম্বয় চেতনার সংযুক্তি আছে, যা বিশ্বজনীন। সংস্কৃতির গোড়ার কথা হল ব্যক্তি সত্তার সংগে বিশ্ব সত্তার গতিময় পুনর্ভবন। সংস্কৃতি একটি যৌগিক ফলাফল। কডওয়েলের ভাষায়, সমাজের মধ্যেকার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়া। সামাজিক স্বাধীনতায় পৌছবার এই একটিই মাত্র পথ। সংস্কৃতি একটি সামাজিক কার্য্যকলাপ।

॥ ছয় ॥

শ্রেণী নিগুঢ় চেতনা লেনিনকে সাহায্য করেছিল বিশ্বমানবজাতকে তার চরিত্রগত, স্বভাবগত, প্রবৃত্তিগত, আচরণগত সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। অথচ মানবজাতির বিকাশ সাধনের ক্রমবর্দ্ধিত প্রধান প্রবণতা,

স্বাভাবিক বৃত্তি হল সমশ্রেণী ভুক্ত হয়ে থাকা। যতই সামাজিক জাতীয় ও রাজনৈতিক, শ্রেণীগত পার্থক্য থাকুক না কেন। সুগভীর দ্বন্দ্ব ভেদ, যত তীব্রই হোক না কেন, মানবজাত যতই নানান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হোক না কেন, জাতি হিসেবে মানব অস্তিত্ব অনিবার্য্যভাবে ঐকপত্য ও অখণ্ডতার দিকে যাত্রা করেছে। বিশ্বপরিবেশ বিশ্বের গভীর অসুখগুলি যা এতই গভীর তা আজ আর কোনো একক দেশ, বা একগুচ্ছ দেশ দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। জাতি, শ্রেণী, রাষ্ট্রের ও সাধারণ সমগ্র বিশ্বমানুষের স্বার্থকে সার্থকায়ণের পথে নিয়ে যেতে হলে বিশ্বব্যাপী মানুষের সহায়তা ও সহযোগিতা একান্ত হয়ে উঠেছে। আজকের বিশ্বে শ্রেণী স্বার্থ আর বিশ্বমানব স্বার্থ সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের একটি কথা মনে পড়ছে। ব্রিটেনের শ্রমিকদের তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের শুধু ইংরেজ হিসেবে, একটা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন একটি জাতির মানুষ হিসেবে দেখতে চাইনে। আমি দেখতে চাই মানুষ হিসেবে, মানব জাতির মহাবিশ্ব সংসারের একজন মানুষ হিসেবে। তারা জানেন তাদের স্বার্থ কী। জানেন তারা মানবজাতি এক ও অভিন্ন।

এই বাক্যটিকে এইভাবে সাজাতে পারি, তার মানে, এই নয় যে সকলের স্বার্থ সমপর্য্যায়ে চলে গেল। বলা চলে শ্রেণী স্বার্থকে আত্মস্থ করলেই শ্রেণী ও শ্রেণীর বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিপুল বিশ্বজনের কল্যাণে ঘরের দুয়োর খোলা যায়। বলা চলে বিশ্ব মানুষের ভূমিকাই আজ বিশ্বের সমস্ত সংশয়, সন্তাপ নিবারণের নির্দ্ধারক শক্তি।

কেউ কেউ বলেন, মানব অস্তিত্বের ক্রমবিসারো, উন্নততর স্তরে অতিক্রমণের ইতিহাস হল একই অঙ্গে সংস্কৃতি ও দর্শন। আবার কেউ কেউ এই ভাবসত্যটিকে আরো বহুদূর প্রসারিত করে বলেছেন, মানুষের ভিতরকার মহত্বগুলি তার ব্যক্তিগত চরিত্র নয়, তা মানব অস্তিত্বের অগম্য রহস্য উদঘাটনের উৎস মুখে কিয়ে যাওয়া। সুউচ্চ এক অবস্থানে উৎক্রমণের ইতিহাসগুলি যেন ডাক দিয়ে বলছে, আমি একটি অস্তিত্বের অগ্রগমনের এই অবভাসে এসে পৌচেছি, আরও উন্নততর স্তরে স্তরান্তরিত হওয়ার অন্তহীন সম্ভাবনা রয়েছে, সামর্থ্য রয়েছে। আমি রেখে গেলাম তারই এক পথ রেখা। প্রণালীটা হয়তবা এক হবে না। সম্মুখের পথের দিক নির্ণয়ও হয়ত এক হবে না, কিন্তু লক্ষ্যের ধ্রুবনক্ষত্রটি ঠিকই এক থাকবে।

বরিস পাস্তেরনাকের একদা নির্বাসিত, দণ্ডপ্রাপ্ত, রাষ্ট্র বিরোধী উপন্যাসের

নায়ক ব্যক্তি ডঃ জিভাগো আশ্চর্য্যভাবে এই দৃপ্ত সত্যটিকেই আরও আশ্চর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করেছে। বিশ্বের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সে নিঃসংশয়ে দেখতে পাচ্ছে, মানব অস্তিত্ব শুদ্ধ সত্তার সঙ্গে সংযুক্তির জন্যে বিরাম বিহীন প্রতিযোগিতাময় বিক্রিয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু কখনো সংশয়হীন নয়।

সোলঝেনিৎসিন এক পত্রে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘকে জানিয়েছিলেন, যে, সত্যের পথ কেউ চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিতে পারে না, সত্যকে সত্যরূপে দেখবার জন্যে মৃত্যুর অন্ধকারে যেতেও তিনি রাজী। কারণ, শ্রেণীর নামে, মতাদর্শের নামে, তার সমস্ত সৃষ্টিকলা নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। মানুষ ও জীবন, যুক্তি ও ন্যায়, সত্য আর বিবেককে সেদিন চির নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। অন্য কোনো দেশে নয়, সমাজতন্ত্রের দেশে। যেখেনে সর্বাপেক্ষা প্রত্যাশিত ছিল ব্যক্তির মুক্তি, যুক্তিবাদিতা, মুক্তচিত্ততা, সঙ্কোচন মুক্ত মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সূর্যোজ্জ্বল উসারো আকাশ। সত্যের দিগ্বিজয়ী জয়যাত্রা। সেখেনেই হল সত্য কারাবন্দী। লেখকও গেলেন বন্দীশালায়। শেষে দেশত্যাগ।

সংস্কৃতির কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবী সত্যের প্রতি নিঃসংশয় আনুগত্য। কেননা সত্যের উপরে বড় কিছু নেই। সংস্কৃতির মুখ সর্বকালে সর্বসময়ে সত্যের অসীমে স্থাপিত।

॥ সাত ॥

সংস্কৃতির মূল্যায়নে কোন মাপদণ্ডটি ব্যবহার করা হবে? কোনটি ভবিষ্ণু কোনটি ক্ষয়িষ্ণু, কোনটি চিরায়ত, কোন পথে তার বিচার হবে? কে সে বিচারক? কী তার মাপদণ্ড? সৃজনক্ষমাকে কোন বিশ্লেষণাত্মক তৌলনে পরিমাপ করা হবে? সমাজতান্ত্রিক মতের সমর্থকগণ লেনিনের বিশ্বমানবজাতি ছিন্নভিন্ন করা শ্রেণী অস্ত্রকেই তুলে নিলেন। তার জন্য একটি যোগ্য দার্শনিক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়। যার নাম করণ করা হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। তৈরী হয়ে গেল, কিছু সূত্র ও নিয়মাবলী। যেন মানব মন, অনুভব, স্বপ্ন, স্বভাব, প্রবৃত্তি ছক কেটে তৈরী করা যায়। লেনিন সমাজতন্ত্র গঠনের কয়েকটি নিয়মতন্ত্র রচনা করেন। মার্কসের পক্ষে সম্ভব ছিল না সমাজতন্ত্র নির্মাণের রূপরেখাটি কী হবে লিখে রেখে যান। লেনিনীয় ছক হল: কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, সর্বহারার একনায়কত্ব, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা, সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

সাম্যতন্ত্রের স্বপ্নে পাওয়া সুখময়ী, শোভাময়ী এক সমাজ প্রতিমা গড়া হবে, বঙ্কিমের কমলাকান্তর সুবর্ণমণ্ডিত প্রতিমা হেন, তার অন্তবর্তীকালীন সারা ঐতিহাসিক কাল ধরে, যে সূত্র ও নিয়মাবলী নির্ভর সমাজ গঠিত হবে, সেই সমাজতন্ত্র নির্মাণকর্মকাণ্ডগুলির রূপময় প্রকাশই হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য। একমাত্র সেই সাহিত্য সংস্কৃতিই হবে সর্বহারা চরিত্রের। এর বাইরে যা কিছু সৃষ্টি,তা হবে রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী, সর্বহারার স্বার্থ বিরোধী। জ্ঞান চাইনে, বিদ্যে চাইনে, শিক্ষা চাইনে, চরিত্র চাইনে, বুদ্ধি, ন্যায়, যুক্তি, স্বাতন্ত্র্যতা, ব্যক্তিত্ব, অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিচ্ছু চাইনে, চাই শুধু সর্বহারার পক্ষে নির্জলা নকীবি সংস্কৃতি। শুরু হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোতে বাঁধা মাইনের সংস্কৃতি স্তালিন তাদের জন্যে একটি সুখকর নাম দিলেন, মানবাত্মার কারিগর।। মানবাত্মারা তখন তাঁর গোপন নিয়মে, কেউ শ্রম শিবিরে, পীড়ন, অমর্যাদা, আর মৃত্যুর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছেন। কেউ কেউ নির্বাসিত, কারাবন্দী। সৃষ্টির সকলগুলি নিষিদ্ধ।

সংস্কৃতি বিচারের এই যন্ত্রদৈত্যটি চীনেও সমভাবে জারী করা হয়েছিল। মনে পড়ে সাংস্কৃতিক বিষয়ে মাওসেতুং এর ইয়েনান বক্তৃতা মালা। সেও একটি ছক। সেও এই উপরি কাঠামোকে মান্য করে তৈরী। তখন বিপ্লব পূর্ব চীন ও বিপ্লবোত্তর চীনে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে, সংস্কৃতির স্থপতিরা কেউ শ্রম শিবিরে, অধ্যাপকরা বিতাড়িত, অপমানিত, লেখক শিল্পীগণ গ্রামাঞ্চলে দেহায়ন ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির পাঠ গ্রহণ করছেন। দেশী বিদেশী ঞ্রুপদী মানবমনের ও অভিজ্ঞতার মূল্যবান দলিলগুলি হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, এবং ভাবতে পারা দুষ্প্রসহ, সেক্সপীয়র থেকে ইবসেন, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের সর্বমান্য সাহিত্য সৃষ্টিগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মাত্র রাষ্ট্র নির্ঘোষিত কয়েকটি নাটক, যেমন, অন ঘা ডকস, হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল ও এই রকম কিছু নাটক অপেরাকেই সর্বোচ্চ সাহিত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। মানুষ, মনুষ্যত্ব ও মানব মনের মুক্ত চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের এমন সমূল নির্বাসন ভাবা যায়? সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চেউ, আমাদের দুর্ভাগ্যের দেশ ভারত তথা বাংলায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে, যে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাক শতবর্ষের কালপর্ব পূর্ণ হওয়ার পথে, বিপ্লব-ঝঞ্ঝা মুক্ত পরিবেশে কী প্রবল আলোড়নই না উঠেছিল। লুশুনের ভাষায় বলা যায় ড্রইং রুম বিপ্লব। প্রগতি বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে দিন রাত্রি মননগর্বী অপব্যয়তা। ১৯৩৪ সালের সোভিয়েট লেখক কংগ্রেসের গৃহীত সমাজ-

তান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ, ইউরোপের নিউ রাইটিং আন্দোলন ইত্যাদি এদেশে মার্কসবাদীদের হাতে এসে অতি আতিশয্যে যা হবার তাই হল। সাহিত্যে শুদ্ধিকরণ শুরু হল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে, প্রতিক্রিয়াপন্থী, সামন্ততন্ত্রের গোমস্তা, বুর্জোয়াদের বগংবদ, মুৎসুদ্দী ইত্যাদি সুশব্দবাদী আখ্যায় ভূষিত হলেন। আশ্চর্য্যভাবে রেহাই পেলেন, মাইকেল, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নামে টিকে রইল, শিল্পরসের নিরিখে পাশমার্ক না পাওয়া কয়েকটি উত্তেজিত নাটক, ও কাব্যত্ব বঞ্চিত কিছু কবিতা। সুখের কথা এই, আজও পর্য্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিচারে কোনটি প্রগতি কোনটি অসর্বহারা তা নির্ণয় করবার শক্তি, সামর্থ্য ও প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলা সংস্কৃতির বিচার আজও অসমাপ্তই আছে। শুধু তাই নয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য সংস্কৃতির বিচারের বানানো তত্ত্বটি বিশ্ব থেকেই হারিয়ে গেছে। কালের প্রান্তরে এমনি বারে বারে হারিয়ে গেছে কতনা বানানো তলবী তত্ত্বাদর্শ। মানুষের সত্তা তা অগ্রাহ্য করেছে।

॥ আট ॥

সংস্কৃতি সংজ্ঞার্থেই মানব দায় ও মানব ঋণ। সংস্কৃতির কোষ কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানব, অস্তিত্ব যার অনুতাপে, দগ্ধতায়, পীড়নে, বঞ্চনায়, মালিন্যে অমর্য্যাদায়, দারিদ্র্যে, রিক্ত, নিঃস্ব। প্রশ্ন এ নয়, কোন দেশ বা কোন জাত, কোন সম্প্রদায়, বা কোন শ্রেণীর। প্রশ্নটি হল বিশ্ব মানবজাতি সম্পর্কিত। প্রশ্নটি হল মানুষের সংগে মানুষের সহজ যোগের সম্বন্ধ। বিশ্বের কোন ভূ-প্রদেশে তার নিবাস, তাকে চিনি বা কি নাই চিনি প্রশ্নও তা নয়। প্রশ্ন হল মানব সম্পর্ক। বিশ্ব যার বাস গৃহ। আকাশ আর মাটির মাঝখানে সে দণ্ডায়মান। বিশ্বের সকল দিগন্ত তার বিশাল বিপুল দেহ। মানবতা, তার শুদ্ধতায় বিশ্ব পরিচয়। তার সহজাত আপন দান। বিশ্বের সকল প্রান্ত ঘিরে তার করুণা, তার প্রেম, তার স্নেহ, বেদনা পরিব্যপ্ত। সকল দেশ সকল কাল, যুগ, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এ বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রত্যুষ, প্রতিটি সন্ধ্যা তার অতল স্নেহের জলে স্নিগ্ধ। মানবতার বিকল্প মানবতাই, এবং একটি মহৎ সত্য যুদ্ধ। মানবতা একটি চিরায়মানা সত্য। এই সত্যের ওপর ভর দিয়েই চলছে সারা বিশ্ব সংসার। সংস্কৃতির সংজ্ঞা তাই সত্য। কী দারুণ সত্য।

সংস্কৃতির সত্যসংজ্ঞা স্বভাবতঃই নির্ভরশীল সংস্কৃতির রূপবানবাদের ওপর। সত্যের একটি আর্টের বহিরাবরণ প্রয়োজন হয়। নইলে শিল্প হয় না। আবার শিল্প, শিল্প বলেই অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, সত্য বিহনে। অঙ্গে অন্তরে যা রয়েছে দৃশ্যহীন সূত্রে বাঁধা, তা হল সত্য। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণের সংগে বিজড়িত হয়ে আছে, সংস্কৃতির সমালোচনা আত্ম সমালোচনা। এই সমালোচনা বা বিচার দৃষ্টি সংস্কৃতির সত্য মিথ্যা শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ণয় করছে। এই নির্ণয় রীতি, এবং এই নির্ণয় পদ্ধতির সংগে জড়িয়ে আছে, কাল চেতনা, মতাদর্শ, সমাজনীতি, সামাজিক ন্যায়, যুগযুক্তি, এবং সমালোচকের দায়বদ্ধতা। কমিটমেণ্ট।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, এই কমিটমেণ্টের অর্থ হল সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দ্দেশিত, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ। যাকে বলা হয় সংস্কৃতির মতাদর্শ। দায়বদ্ধতা এই মতাদর্শের কাছে। মতাদর্শ শব্দটির নির্দ্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই যতক্ষণ না সে নির্দ্দিষ্ট সময় ও কালের সেবাকারী নির্দ্দিষ্ট কিছু সূত্র ও নিয়মাবলীর সংঙ্গে নিবিড়ভাবে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। আর এ কথা আরও নিকটতম সত্য, ওই সূত্র ও নিয়মাবলী রাষ্ট্র ও সমাজের বিধি বাঁধন। যার শোভন নাম সমাজ গতি ভঙ্গীর প্রগতিশীল শৃঙ্খলাজ্ঞান। তার একটি অর্থ রাষ্ট্র স্বার্থ রক্ষা। তাহলে কমিটমেণ্ট কি রাষ্ট্রের, সমাজের, রাজনীতির কর্মসূচীর কাছে কমিটমেণ্ট? কমিটমেণ্ট মানে কি দলীয় নির্দ্দেশের শর্তমেনে চলা? রাজনৈতিক প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার, প্রগতি বা প্রতিক্রিয়ার ছক কাটা শাস্ত্র, তন্ত্র, গুরুবাক্য? রাজনৈতিক নেতা ও দলের আশীষ ধন্য হওয়া? একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের কাছে আত্মবিলোপ? রাজনৈতিক কর্মপ্রণালী ও কর্মক্রিয়ার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা বস্তু? গণ্ডী দেবতার পূজো? অর্থাৎ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, দুর্যোগ মুক্ত রাজনৈতিক দল নির্ভরতা ব্যক্তির স্বার্থ, উচ্চাশা, প্রতিষ্ঠা ও যশের সুনিশ্চিতি। দলীয় রাজনৈতিক কর্মপ্রচয় ও কর্মপদ্ধতি, কর্মলক্ষ্যের আনুগত্য পূরণে সৃজনশীল সাহিত্যিক শিল্পীরা নিজেদের মতাদর্শের সার্থকায়ণের কাজ করছেন মনে করলে, সত্য, সততা, ন্যায়, যুক্তি, ব্যক্তিত্ব, চিন্তার স্বাধীনতা ও শুভবোধ খণ্ড প্রখণ্ডিত হতে বাধ্য।

শিল্পী সাহিত্যিকের কাজ হওয়া উচিত, বিশ্ববেদনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সত্যের সখ্যে, ঐক্যে, সমস্ত অপমানিতের, শৃঙ্খলিতের ; সকল বঞ্চিতের বন্দীশালার দরজা খুলে দেওয়া। যে বেদনা, যে জ্বালা, যে দুঃখ সমাজের বিপুল অন্ধকারে নীরব অশ্রু ফেলছে, তাকে চোখের আলোয় পৌছে দেওয়া, ভাষা দেয়া। রাষ্ট্রের

ভ্রুকুঞ্চনটি, মতাদর্শের তর্জনী শাসন, দলের ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা, অসম্মান তখন শিল্পীর অহঙ্কার হয়ে ওঠে। কমিটমেণ্ট ও দায়বদ্ধতার সার্থক আক্ষরিক আদর্শতো এই। কমিটমেণ্ট ব্যাপক অর্থে ন্যায়নীতি নির্ভর মানবীয় অনুরাগে ভরা শুভ বিচার। সাহিত্য শিল্পে কমিটমেণ্ট মহত্তম সার্বজনীন, স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাকৃত দায়বদ্ধতা, যার প্রয়োজন বিশ্বে কোনদিন ফুরোবে না। কমিটমেণ্ট সামগ্রিক জীবন সত্যের অনুশীলন, সাহিত্য সাধনায় সর্বোত্তম সর্ত। রাস্কিন, রঁমারঁল্যা, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, গ্যয়টে, বার্ণাডশ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, লুশুন, প্রেমচন্দ, দলগত রাজনীতি অনপেক্ষিত জীবন সত্যের অংশীদার, রূপকার।

॥ নয় ॥

এই সত্যের এলাকায়, চিত্তমুক্তির প্রান্তরে, বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ায় বিশেষ এক সংস্কৃতি মানস, মানব ঋণ, মানব সত্যকে আবৃত করেই সংস্কৃতির অঙ্গন ভরে উঠেছিল। তাদের শ্রুত কীর্ত্তি সাহিত্যঅন্বিতা বিশ্বের দূরতম প্রান্ত অতিক্রম করে কালজয়ী হয়েছে। পুসকিন, টুর্গেনিভ, ডস্টয়ভস্কি, গোগল, তলস্তয় আজও বিশ্ব সাহিত্যে অপরাজিত বাণী হয়ে পূজো পেয়ে চলেছে। মানব সত্যের কোন অশেষ অধীতি চিরত্ব দিয়েছে তাদের? গোর্কিও বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ায় ও বিপ্লব অন্তের দুই কালের সত্যকে দেখেছিলেন মানব মনের নানান প্রেক্ষায়। তার সাহিত্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের নীতিতে মানুষই শেষ কথা হয়ে উঠেছে। মানুষ, মানুষ এই কথাটি নাকি তাকে পাগল করে দিত। তাঁর পেলাগয়া বারংবার আপন অস্তিত্বের সীমা আপনি অতিক্রম করে সত্যের প্রত্ন প্রতিমা হয়ে উঠেছে বিশ্ব ছাড়িয়ে। বালজাক আপন শ্রেণীর সীমাকে ছাড়িয়ে আপন সত্যের অনুগামী হয়েই বালজাক হয়ে উঠেছেন। এ কোন শিক্ষা, এ কোন মন্ত্র গুণে? সত্যের দিগ্বিজয়ী যাত্রায়। সত্যদৃষ্টি, বিশ্বদৃষ্টি হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন মানবতার অন্তহীন প্রসাদ পবনে। সে কি কোনো সমাজ সূত্র ও নিয়মাবলীর বরে না দয়া, কৃপায়, করুণায়? সামগ্রিক জীবন সত্যের সর্বোচ্চ সাধনায়। তার জন্যে প্রয়োজন বোধ করেননি রাষ্ট্র বা সমাজ মন্ত্রীদের আদেশ, হুকুম নির্দ্দেশের। সামগ্রিক জীবন সত্যের কাছে, ন্যায়পরায়ণতার কাছে, আপন চিত্তের স্বাধীন স্বচ্ছন্দলোকে ভাবের স্বেচ্ছাকৃত দায়মুক্ততার অপরাহত মহিমায় মানুষের সুখ দুঃখ, জাতি জীবনের পরিণাম চিন্তায় প্রেরণাবৃত হয়েছিলেন, কোনো দল, সম্প্রদায়, রাজনীতি, মতাদর্শ, কোনো তত্ত্বগত উপেদশ অনুজ্ঞার জন্যে অপেক্ষা করেননি।

সংবেদজ সুখেদী অনক্ষ প্রত্যয়ই ছিল তাদের অলঙ্কার। আকাশভরা হৃদয়ের ঔদার্য্য ও বিশালতা মানবীয় দায়িত্ব বোধে সহজবদ্ধ ছিল। সততাই ছিল তাদের স্বাধীনতার প্রথম ও সর্বশেষ সর্ত্ত। নিজেদের অন্তরে ছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা।

কিন্তু সেই একই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় স্বাধীনতার পূর্ণ প্রসাদে স্নিগ্ধ হলেন না কেন সত্যানুগত, যে সত্য সবার চেয়ে বড়, সেই ডাঃ জিভাগোরা লেখক, নট বাই ব্রেড এলোনের লেখক, ওয়ান ডে, দি ফার্স্ট সার্কল, গুলাগ দীপপুঞ্জ, ক্যানসার ওয়ার্ডের লেখক? মানবিক দায়বদ্ধতা, শিল্প সৃজনক্ষমা, জনচিত্তের সার্থক প্রতিনিধি কি ছিলেন না তারা? জনমনের বিবেক, ও যুক্তির রূপকার কি তারা ছিলেন না? তাদের কান্তকলায়, সাহিত্য মণ্ডনে ছিল না কি স্বদেশজনের, বেদনামাখা মৃত্যুর আঁধারের মধ্যে জীবনের অপরাজিতের বাক্যকলা, বাণীবন্দনা?

তবু কী কৌতুক। অপমান, নিষেধ, প্রত্যাখ্যান, শাসন, আক্রমণ, কারাবাস, নির্বাসন, সৃষ্টির বন্দীত্ব এদের ভাগ্যেই জুটেছে অবিরত। সুখের বিষয় এই, স্বাধীন চিত্ততার সখা ছিল আরও অনেক ন্যায় বুদ্ধির, মুক্ত চেতনা, স্বাধীনচেতা সৃজনকার, রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় তাদের কাছে ছিল তুচ্ছ।

এই পীড়িত, অবমানিত, দণ্ডিত মর্য্যাদা পুরুষ লেখক বরিস পাস্তেরনাক, সোলঝেনিৎসিন রাষ্ট্রের কাছে আপন স্বাধীন সত্তার মূল্যকে পদানত করতে চাননি। 'আইভান ডেনিসেভিচের জীবনে একদিন' রচনা এক শ্রম শিবির বন্দীর একটি দিনের গল্প! কী বর্বর সেই দিন, কী পাশবিক সেইদিন। প্রতিদিন একই দিন। শূণ্য আশা, শূণ্য প্রাণের রিক্ততা, নিষ্ঠুরতা ভরা দিনগুলি। তিক্ত সজল। কিন্তু সত্য, ও বাস্তবের প্রতিন্যাস। যে কোন শ্রমশিবিরবাদী তার মুখ দেখবেন আইভানের আয়নায়। যারা সেখেনে থাকেননি তারা আর্ত্তনাদ করে উঠবেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিশ্চয়ই নয় এই রক্তলিপি। নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, যুক্তিশূণ্য, নীতিবর্জিত স্বৈর কর্তত্বের বিশ্বাসী বাঁধা মাইনের সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, যার নির্ভরতা শুধু দলীয় সমর্থন, স্বৈরিতা নির্ভর সুবিন্যস্ত স্তালিন মিথ, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান, তাত্ত্বিক ও মূর্ত্তভাবে মুষ্টিগত ছিল সমাজতন্ত্রের।

দুর্যোগের ঘনঘটা দেখি পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে ঢাকা ডাঃ জিভাগোর জীবনে। উপন্যাসটি স্থাপিত হয়েছে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষণ বিন্দুতে। সময় গড়িয়ে এসেছে ১৯১৭-২০ সাল পর্য্যন্ত। ডাঃ জিভাগোর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের অবসানের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং সেখেনেই সমাপ্তি।

ডাঃ জিভাগো প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। প্রকৃত পক্ষে ১৯০৫-২০ সালের একদিকে যুদ্ধ ও অন্যদিকে বিপ্লব সমাগত কালের পটে রাখা হলেও উপন্যাসের সত্য গড়িয়ে এসেছে স্তালিনোত্তর কালে। যখন সমাজতন্ত্রের গভীর অসুখ গভীরভাবেই তীব্র হয়ে উঠেছে। স্তালিনের সমকাল, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অব্যবহিত কাল এর সময় সীমা উপন্যাসে রাখা হয়েছে। ডাঃ জিভাগোর পিতার প্রকৃত সন্ধান নেই। মাতা মৃত। জীবন প্রারম্ভে কাকা নিকোলাইয়ের আদর্শে মানুষ। হাঙ্গেরী ফ্রন্টে জার্মানদের সংগে যুদ্ধে তাকে ফ্রন্টে যেতে হয়। স্ত্রীপুত্র মস্কোয়। দূরদেশ থেকে আসা এক পরিবার বিচ্ছিন্ন লাবণ্যময়ী মেয়ে লারা দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেই কামারোভস্কি নামক অর্থবান মানুষের লুব্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে, শিক্ষকতা গ্রহণ করে। পাশা কে বিয়ে করে। সন্দেহ ও সংশয়ে লারাকে পরিত্যাগ করে ফ্রন্টে চলে যায় পাশা। জিভাগোকেও ফ্রন্টে যেতে হয়। শেষে ফ্রন্ট থেকে ফিরে মস্কোয় আবার ডাক্তারীতে ফিরে আসে। জীবন, সাহিত্য, সমাজ সচেতন জিভাগো। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলে তার চিন্তার সংগে ক্রমাগত অন্য চিন্তার সংঘাত ঘটছে। সোভিয়েট বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। পুরোনো জীবন ও নতুন পথের মধ্যে কোনো সেতু বাঁধা হল না। হাসপাতালের কর্মীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। জিভাগোকে বিপদজনক ভাবতে লাগলো। অনেকে তাকে মনে করত সে Not red enough. অর্থাৎ যথার্থ বিপ্লবী নয়। ফলে সে কাউকে খুসী করতে পারে না।

তার বন্ধুরা বদলে গেছে, বোঝার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নেই। নিঃসঙ্গ ভাবতে লাগল জিভাগো। বিপ্লবকালীন দেশ অর্থ নৈতিক সঙ্কটে জর্জর। মস্কো ছেড়ে চলল জিভাগো-পরিবার মাটির টানে। গ্রামে। জমির উপর নির্ভর করবে। রেড আর্মি যাকে পাচ্ছে তাকেই বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে নিয়ে যাচ্ছে। বা যুদ্ধের ফ্রন্টে। জিভাগোকেও বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া হল সাইবেরিয়ার ফ্রন্টে। পরিবারের সবাই ফ্রান্সে নির্বাসিত হল। লারার সংগে দেখা হল ফ্রন্টে। লারা এসেছে স্বামীকে খুঁজতে। স্বামী এখন বলশেভিক। সে এখন মানুষের কাছে ত্রাস। Strenlikov পাশার ছদ্ম নাম। কোন এক বলশেভিক কারণে তাকে হত্যা করা হবে। লারাকেও শাস্তি পেতে হবে। লারা পালিয়ে যায় বহু দূর দেশে। পাশা আত্মহত্যা করে। জিভাগো শ্রমশিবির থেকে পালিয়ে মস্কোয় আসে। তখন তার অবস্থা দৈন্যে দারিদ্র্যে জীর্ণ। বন্ধুদের একজন তাকে আবার ডাক্তারীতে ফিরে যেতে বলে। হাসপাতালে যোগ দিতে যাবার পথে মৃত্যু হয়।

জীবনের অকারণ দুর্যোগে জিভাগোর অভিজ্ঞতা হল, Marxism is not sufficiently master of itself to be a science. অর্থাৎ মার্কসবাদ তত্ত্ব হিসেবে অসম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ কোন বিজ্ঞান নয়। কারণ science is more balanced, অর্থাৎ বিজ্ঞান অনেক যুক্তিসম্মত। I do not like people who are indifferent to the truth. বলশেভিকরা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। তাই বলছে, যারা সত্য থেকে উদাসীন তাদের আমি চাইনে। এ ছাড়া সমস্ত বই জুড়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর বিপ্লবীদের নিষ্ঠুর পীড়ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, হত্যা, ও মৃত্যুর ছবি।

জিভাগো মাটির প্রেমে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঁচা হল না। জিভাগো নিজের চোখ দিয়ে দেখেছে নিজের বন্দী জীবন, বিপ্লবীদের অমানবিকতা, ক্রুরতা, হীনতা, চক্রান্ত, জবরদস্তি। যেমন দেখেছেন সোলঝেনিৎসিন নিজের জীবন দিয়ে, যারা বিপ্লবী নেতৃত্বে রয়েছে তারা বর্বর মনুষ্যত্বহীন। সভ্যমানুষের কোন আইন নেই। সর্বত্র জঙ্গলের আইন।

জিভাগো বলছে : যে মানুষ মুক্ত নয়, তারা তাদের বন্ধনগুলিকে সব সময় আদর্শায়িত করে, অর্থাৎ তাকেই তারা সত্য বলে ভাবে।

Alexander Block বলেছিলেন 'we the children of russians' terrible years', এখন দেখ কী বদলে যাচ্ছে। Children are Children and terrors are terrible. শিশুরা শিশুই আছে, কিন্তু সন্ত্রাস কী ভয়ঙ্কর। কী তফাৎ। বিপ্লব মানুষকে মর্য্যাদা দেয় নি, বিপ্লবীরা নিজেরা পরিবর্ত্তিত হয় নি, অন্যকেও করতে পারে নি। ব্যক্তি তার সত্য মূল্য ফিরে পায়নি। ব্যক্তি ও সমাজের আলিঙ্গনাবদ্ধ রূপই যে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ তাও রচিত হয়নি। যুদ্ধ ও বিপ্লব, জেনারেল ও যুদ্ধকারীরা ইতিহাসের চাকা, যন্ত্র বা উপায় বা পদার্থ বিশেষ। তারা এক চোখে দেখেন, দু'চোখে দেখেন না, এক পায়ে হাঁটেন দু'পায়ে হাঁটেননা, মন একমুখো, সংকীর্ণ. এক চোখো পথের পথিকের বিপ্লবের প্রবক্তা। তারা পুরোণো ব্যবস্থাকে কয়েকঘন্টা বা কয়েকদিনের মধ্যে ভেঙে দিতে পারেন। বছরের পর বছর লেগে থাকতে পারেন কিন্তু তারপর শতাব্দীকাল ধরে, সেই সংকীর্ণতা যা আলোড়ন তুলেছিল তাকেই পবিত্র ভেবে গণ্ডী দেবতার পূজোয় বসেন।

শ্রেণী চেতনায় সংকীর্ণতা, চিন্তা, জ্ঞান, দৃষ্টির প্রসারতাকে আচ্ছন্ন করে

CENTRAL LIBRARY

কেলেছে। মাটির বাঁশী থেকে যে সুর ওঠে, আনন্দ জাগে, তার কোনো খবরই তারা শুনতেই পায় না। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে, বিশ্ব হতে ছড়িয়ে পড়া যত আলো, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দীধিতি চোখ মেলে যাকে দেখতে হবে, একটি মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের মরণ এল, অচলায়তন হল মানুষ। রেণেসাঁশের উত্তরাধিকার ও ফরাসী বিপ্লবের অধীতি অন্ধকারে মুখ ঢাকলে। যুক্তিবাদ, ব্যক্তির প্রাতিস্বিক স্বতঃসিদ্ধ মূল্য, ব্যক্তিই যে সকল যুক্তি বিকাশের উৎস এ কথা সুদূরে হারালো। ব্যক্তির ও সমাজের সহজ যোগের সত্য নিঃশেষে শেষ হল।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব, বস্তুর অন্তরে যে বিভাজন ক্রিয়া নিত্যশীল, যে দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের নিয়ম তা অনতিক্রম্য অমীমাংস্য। কিন্তু মানুষ বস্তুর সন্তান হলেও সে মানুষ। বস্তুপিণ্ড নয়। বস্তু থেকে উত্থিত বস্তুর অধিক। সেখেনেই তার স্বাতন্ত্র্য, সত্য। সেখেনেই সে আপন সত্তায় স্বাধীন মানুষ। তাই মানুষের সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা সত্য বোঝার দ্বন্দ্ব। তা মীমাংস্য। তার পথ চিন্তনক্রিয়ার স্বাধীনতার মধ্যে। তাই সত্য বোঝার জন্য চাই স্বাধীনতা। সততাই স্বাধীনতার একমাত্র সর্ত্ত।

১৯৪৩ যুদ্ধের কাল। ডুডোরফ আর গর্ডনের বাক্যালাপ : যুদ্ধ যেন একটি প্রাণভরা হাওয়ার মতন এল। একটা মুক্তির বর, একটি শুদ্ধিকরণের ঝড়। যৌথ কর্মকাণ্ড একটা ভুল, একটা ব্যর্থতা। বলবানের বর্বরতাকে ব্যবহার করা হয়েছে, মানুষের মুক্তবুদ্ধি, বিচার, ভাবনাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যে। সেই সব কিছুকেই দেখতে শেখানো হচ্ছিল, সত্যি সত্যি যার অস্তিত্ব ছিল না। যা মানুষের চোখকে সত্য বলে জানিয়ে দিচ্ছিল, তাকে তারা বিপরীত করে দেখাচ্ছিল। নজিরবিহীন হয়রানি, ভীতি, নানা ধরণের আইন তৈরী, যা কোনদিনই কার্যকর করা হতোনা। যেসব জিনিস হতো তা ভোট বা মতপ্রকাশের নীতির ওপর নির্ভর করত না।

যদিও যুদ্ধ শেষে আশা করা গিয়েছিল মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তা হল না। তা হাওয়ায় হাওয়ায় তার ঐতিহাসিক অর্থ নিয়েই ঘুরে মরতে লাগল।

তবুও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সংসার হারা, সুখ, শান্তি, বাসস্থান হারা, দু'মুঠো খাওয়ার সমস্ত দুঃখের ওপরেও জিভাগো বলেছিল, সব কিছুই বদলাচ্ছে, বড় ইচ্ছে করে বাঁচতে। বাঁচা মানে লড়াই। আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া, আরও সঠিকতার নিকটবর্তী হওয়া ও অর্জন করা!

কিন্তু হল না বাঁচা। সব দুঃখ বেদনার শেষ হল জিভাগোর শেষ মরণে।

যে সামান্য অংশ দেখানো গেল, এই দিয়ে বুঝে নেওয়া অসম্ভব নয়, আজকের পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েট রাশিয়া, রুশ অঙ্গ সাধারণতন্ত্র গুলি কেন গণ রোষে, গণ বিদ্রোহে বিদীর্ণ হল। মানবতা তার মূল্য হারিয়েছিল। সত্য তার আপন কণ্ঠস্বর হারিয়েছিল। কিন্তু এ চলতে পারে না। মিথ্যের শক্তি সত্যের চেয়ে কখনো বড় হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের সমগ্র সত্তর বছর কাল হল মানুষের প্রতি অমর্য্যাদা, পীড়ন, হিংসা, বঞ্চনা, মিথ্যাচার, ভণ্ডামী, স্বার্থগন্ধী রাজনীতির নৃশংসতা। কিন্তু এ দীর্ঘকাল চলতে পারে না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হলেও, সে দিগ্বিজয়ী। চলেনিও। অনুতাপ ও আত্মসমীক্ষায় মানুষ এল সম্মুখ ভূমিকায়। সারা রুশ কেঁপে উঠল রোষে, ভৎর্সনায়, গর্জনে, ধিক্কারে, তিরস্কারে, ঘৃণায়, বিদ্রোহে, গণ অসন্তোষে।

'আজি অমারাত্রির দুর্গ তোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন'। রবীন্দ্রগীতির সংগে আজকের সমাজতন্ত্রের নামের বহুতল প্রাসাদের ধ্বসনামা কী অশ্চর্য্য মিল। যদি বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তা মনুষ্যত্বের, ব্যক্তিত্বের, চরিত্রের, সত্যের। এক কথায় বলা যায় সংস্কৃতির প্রান্তিক সংকট উপস্থিত।

সাম্যতত্ত্বের ও সমাজবাদের অভ্যন্তরে যেটুকু মানবীয় ভিত্তি ছিল, কালের সীমায় পালোয়ানের পেশীর মর্য্যাদা নিয়ে শতাব্দের প্রান্ত প্রহরে এসে দৃঢ় কঠিন সংস্কার শাস্ত্র মন্ত্রের গুরুগিরির আসন দখল করে নিল। জ্ঞানের চেয়ে সূত্র বড়, শিক্ষার চেয়ে নিয়ম বড়, জানার চেয়ে মান্ধাতাই বড়। মনুষ্যত্ব, সত্য, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের চেয়ে রাষ্ট্রের ও একতন্ত্রের স্বৈরীতার বিজয় ঘটল। সাম্যতত্ত্ব নিজেকেই যথেষ্ট বিজ্ঞানস্থিত ছিল না বলেই, দর্শন আর দর্শন রইল না। বিজ্ঞান বঞ্চিত হয়ে দর্শন গৃহহীন হয়ে পড়ল। গণতান্ত্রিকতা, সর্বহারার একনায়কত্ব, কমিউনিষ্ট পার্টির স্বৈরশক্তি, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শেষ বিচারে আমলা তোষণ কিছু নির্জীব সূত্র ও প্রাণহীন নিয়মাবলীর এলাকাধীন হয়ে পড়ায় সমাজতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠল। যুক্তি ও বুদ্ধির খোলা প্রান্তর কুয়াশার জঙ্গলে ভরে গেল। রইল শুধু বিশ্বাস। বিশ্বাসের প্রতি সংশয়হীন আস্থার নামই হল সংস্কার।

সংস্কৃতি, অর্থনীতি আর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে এক কালসন্ধি এগিয়ে এসেছে। সাম্যতত্ত্বের সোনার তরীখানি সমাজতন্ত্রের ঘাটে উত্তীর্ণ হবার আগেই দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। রবি ঠাকুরের গীতবাণীতে বলা যায়, 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।'

দীর্ঘদিন ধরে যে সব ঘটনাবলী সংবাদ সূত্রে আসছে,তথ্য থেকে সত্যে আসতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, পীড়িত, বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত, মালিন্যে, অপমানে, মূল্য-

হীনতায়, বিশ্লিষ্টতায়, সংশয়ে সন্তাপে যারা সমগ্র সত্যকে শক্তির মশাল করে গণ বিদ্রোহ, গণরোষকে পতাকার মতন উড়িয়ে দিয়েছেন তারা সত্যের প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন। কমিউনিস্ট শাসন, সমাজতন্ত্রের শাসন অশ্রদ্ধেয় হয়ে দেখা দিয়েছে। তার অবসান হোক, সর্বগ্রাসী কমিউনিস্ট একনায়কবাদ নির্বাসনে যাক, এই প্রশ্ন আজ উঠেছে। আজকের বিশ্বের সমস্যার সমাধান মার্কসবাদ লেনিনবাদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া ভুল। সাম্যবাদী তত্ত্বাদর্শে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব কিনা তাও সমাজ-বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখছেন। সমাজতন্ত্র আজ জনবিচ্ছিন্ন। বিশ্বের যুগ বদল হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি আর সমস্ত মানুষের হয়ে কাজ করতে পারছে না। সমাজ আরও জটিল হয়েছে। সমাজতন্ত্রই শেষ কথা এমন কথা বলা যাবে না। পৌরাণিক সমাজতন্ত্রের অনুর্বর ধারণা থেকে মুক্তি নেবার দিন এসেছে। নতুন ধারণাকে গ্রহ নকরবার বিচার করবার জন্যে চিত্তলোকের দরজা খুলে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্তনের তরঙ্গ সর্বত্র স্পর্শ করতে বাধ্য। কিউবা, চীন, আলবেনিয়া, ভিয়েটনাম সর্বত্র। মানুষ আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবেন।

১৯৭৮ সালেই বাধ্য হয়েই চীন সমাজতন্ত্রের সংস্কার শুরু করে যার নাম দেয়া হয়েছিল চার অধুনিকতা লেনিন প্রবর্ত্তিত চারটি সূত্র অনুযায়ী, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েটে আজ তা কার্য্যকরী নেই। চীন আরও গভীর সঙ্কটের মধ্যে চলে যেতে বাধ্য। সোভিয়েটে নানা ধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি গড়ে উঠেছে। কোনো কোনোটার অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রের পুরোণো ছক ভেঙ্গে যাচ্ছে। নতুন ছক গড়ে উঠতে বাধ্য। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ আর থাকছে না। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অন্য এক নতুন ধরণের সমাজনীতি গড়ে উঠতে চলেছে। সেটা পুঁজিবাদী কখনোই নয়। বিশ্ব আরও পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ তারা কেউই আর পুরোণো অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। শ্রেণী সংগ্রামও ভাবগত, গুণগত, রূপগত, অর্থগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রত্যেক কিছুর রূপান্তর ঘটে গেছে। বিশ্ব আজ আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। এখন আসছে সমাজতন্ত্র কালে নতুন ধরণের অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস। মূল সূত্র বাজার অর্থনীতি, প্রতিযোগিতার বাজার। খোলা দরজার নীতি। বিশ্ব আজ যুগসন্ধিতে উপস্থিত।

কেন এই ঘটনা ঘটছে? পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কস এঙ্গেলসের এমন কি লেনিন যে সূত্র ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করেছিলেন তা

আজকের বিশ্বে মেলেনি। তারা বলেছিলেন উন্নত পুঁজির দেশেই সাম্যবাদ আসবে। এরই ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কালের বাস্তবতায় তা অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়া দেশেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হলে বিপ্লব হতে পারে, এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। স্তালিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

ভুলটা ছিল সাম্যতাত্ত্বিক দার্শনিকতার সংগে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যর্থতা, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য হিসেবে সাম্যতত্ত্ব দর্শন হিসেবে সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। কল্পতত্ত্বের মধ্যেই সীমায়িত রয়ে গেছে।

তাই বারংবার ক্রুশ্চেভ থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কারের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

পূর্ব ইউরোপে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা সোভিয়েটের ইচ্ছেয় এবং সোভিয়েটের মডেলে, সে মডেল ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ তাও মানে নি।

আজ বিশ্ব বিপ্লবের প্রশ্ন অনুচ্চার্য্য। সেই বিপ্লবী কেন্দ্রও আজ নেই। সর্ব—হারার আন্তর্জাতিকতা ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটি সাধারণ দলিলের ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ একেবারেই অবাস্তব।

সোভিয়েট যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ নতুন রূপ নিচ্ছে, চীন তা অস্বীকার করছে, অস্বীকার করছে কিউবা। কিন্তু চীন যদিও মুক্তদ্বার, খোলা অর্থনীতির বাজার গ্রহণ করেছে, তা সত্বেও তাকে আরও মূল্য দিতে হবে।

মানুষের মুক্ত বুদ্ধি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিশ্ব মানতে বাধ্য। সব সময়েই অর্থনীতিই উপরিকাঠামো সংস্কৃতির ভুবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে তা নাও হতে পারে। সংস্কৃতির সুউচ্চ জ্ঞানের লক্ষ্য সমাজ জ্ঞান অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসে প্রভাব রাখতে পারে। তার অধুনা প্রমাণ সোভিয়েট, পূর্ব ইউরোপ। অবশ্যই মানবতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করতে হবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাম্যতত্ত্বের ভিত্তির অভ্যন্তরেই রয়েছে, এর অধঃপতন ও বিকৃতির কারণ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বড়ই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'যদি মানুষী লক্ষ্য বিকাশে অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে, তবে সেই শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে। অনেক নিষ্ঠুরতা পালন করে। কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব।'

সোভিয়েট, পূর্ব ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্বে কি পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী সকল

দেশ সম্পর্কেই এই সত্যশব্দ অপ্রতিরোধ্য। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া দেখে যেমন সংবিষ্ট হয়েছিলেন তেমনি তার অন্তরের বন্ধনগুলিকেও মানবতন্ত্রী দৃষ্টি দিয়ে ঠিকই দেখে ছিলেন। প্রশংসা ও সংশয় পাশাপাশি রেখে গেছেন।

'…মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ক্যাপিস্টদেরই মতো। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির পীড়নে এরা কোন বাধাই মানতে চায় না।'

এ হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সমস্যা। মনুষ্যত্বের সমস্যা, সংস্কৃতির সমস্যা। 'মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ।'

'ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়িত করতে কুণ্ঠিত হয় নি। জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয়, তবে সেটা খাঁচা মনুষ্যত্ব হানির পক্ষে এমন উপদ্রব আর নেই। ডিক্টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় ঘটছে।'

এই সত্য সত্তর বছর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি স্তরে আজ কী তীব্রভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে।

'সেখানে রাষ্ট্র নায়কেরা মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না…বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোন দ্বিধা নেই…।'

মনুষ্যত্বের, মানব অধিকারের, সত্য প্রকাশের অপরিহার্য স্বাধীনতা আজ পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েটে, চীনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। নইলে কোন মনুষ্যত্বের নিয়মে, মানবতার কোন মূল্যে নররক্তে ভাসিয়ে দেয়া যায় সমাজতান্ত্রিক চীনের মাটি, হাজার হাজার প্রাণের দাম কী মূল্যে কিনেছে চীনা সমাজতন্ত্র?

এই সংগে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটের সার্থক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তিবাদিতা ও মানবতন্ত্রতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সত্যের প্রতি অমল অনুরাগের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক।

মস্কোতে রবীন্দ্রনাথের শেষ অপ্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারের বিষয় প্রায় উনষাট বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্রের কৃপায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, রাষ্ট্র বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিল ইজভেস্তিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আপনারা এক মহান আদর্শের রূপায়ণের জন্যে লড়ছেন।

কাজেই আপনাদের চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে মহান হতে হবে। মমতা, বোঝাপড়া ও সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রেও মহান হতে হবে।'

'ঘৃণা, প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাস একদিন আপনাদের আদর্শের ক্ষতি করবে ও তাকে ধ্বংস করবে।'

'যা অর্জনের জন্য আপনারা অঙ্গীকারবদ্ধ তার গভীর প্রশংসা করছি। কাজেই আমি আশা করি ঐ কাজের চালিকাশক্তি হবে ভালবাসা ও বোঝাপড়ার পরিবেশ।'

রবীন্দ্রনাথ এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ যেদিন তিনি মস্কো ছেড়েছিলেন। খোলা পরিবেশে সম্প্রতি আজ তা প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ওই সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন ভাবধারার প্রকাশের, স্বাধীনতাপ্রকাশের, স্বাধীনতার স্বপক্ষে বলেছিলেন, চাপ দিয়ে যদি সমস্ত মতামতকে অভিন্ন করা হয়, তবে তা শুধু আগ্রহশূন্য হবে তাই নয়, তা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বন্ধ্যা জগতে পরিণত হবে।

যদি আপনাদের সম্মুখে এমন কোনো কর্তব্য থাকে যা সমগ্র মানবতাকে জড়িয়ে তবে বিভিন্ন মতামতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। নৈতিক বিশ্বাস ও বুদ্ধি-মত্তার অবাধ প্রয়োগের দরুণই মতামতের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়।

হিংসা, হিংসার ও অন্ধ মূঢ়তার জন্ম দেয়। সত্য বোঝার জন্য চিন্তা ভাবনার স্বাধীনতা অপরিহার্য। সন্ত্রাস অনিবার্য্যভাবেই সেই স্বাধীনতাকে হত্যা করে।

যাদের আদর্শের ইতিহাসগতভাবে ভিত্তি রয়েছে, তাদের আদর্শ, অন্যদের কাছে ভ্রমাত্মক মনে হলেও, বোঝার প্রয়োজন আছে বলে তিনি বলেছেন। জন-সাধারণের মধ্যে সহানুভূতির মনোভাব দিয়ে আস্থা ফেরাতে হবে, কেননা তারা মানবতার অঙ্গ।

আজ বিশ্বে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এক কালসন্ধিতে প্রবেশ করেছে। সংস্কৃতির সংকট গভীরতর হয়েছে। অথচ মুক্তির দরজা আজও খোলা হল না। সমাজ-তন্ত্রেও না।

তবে ভাবতে ভালো লাগছে, কি বিপুল মহা সমারোহে, কী বিচিত্র ও বৈচিত্র্যের আর বৈপরীত্যের নিত্য রক্তপাতে সত্য তার সর্বশেষ মূল্য জয়ে বিজয়ী হচ্ছে, এ কল্পনাও কম সুন্দর নয়!

CENTRAL LIBRARY

ইংরেজি সাহিত্য ও মার্কসবাদ

দীপেন্দু চক্রবর্তী

ইংরেজি সাহিত্যে, যেমন ইংরেজি রাজনীতিতে, মার্কসবাদের প্রভাব যে নগন্য তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। উনিশ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম মরিস, আর বিশ শতকের তৃতীয় দশকে অডেন-স্পেণ্ডার-ডে লুইস-ম্যাকনিস, এরকম কয়েকটি নমুনার উল্লেখ হাজারবার করলেও প্রমাণ হয় না যে মার্কসবাদ ইংরেজি সাহিত্যে তেমন বলার মত জায়গা দখল করতে পেরেছে। গত ষাটের দশক থেকে 'নিউ লেফট' বলে যে লেখকগোষ্ঠীর দেখা মিলেছে তাঁদের তালিকাভুক্ত করলেও ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ভরসা বৃদ্ধির তেমন সুযোগ নেই। সব মিলিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে মার্কসবাদের গুরুত্ব ঠিক ততটুকু যতটুকু ইংরেজি রাজনীতিতে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্ব।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : যে-দেশে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল পর্ব কাটিয়েছেন সেখানে মার্কসবাদের প্রভাব এমন অকিঞ্চিৎকর কেন? ডেভিড টমসন যখন সবিস্ময়ে মন্তব্য করেন—'…it remains one of the remarkable facts of English history that although Marx and Engels lived and worked in England throughout the formative decades of the labour movement they exercised virtually no influence at all on its development.' (England in the Nineteenth Century) তখন স্মরণে আসে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা : বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা, যা মার্কসকে প্রথমে আশাবাদী করে তুলেছিল। কিন্তু আজ যে-কথা সবার জানা, এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ও মার্কস-এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকার যোগফল যেমন হবার কথা ছিল তা হয় নি। চার্টিস্টদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও চার্টিস্ট আন্দোলন ধীরে ধীরে যে-পথটি ধরেছিল তা ছিল বুর্জোয়া উদারনৈতিক মীমাংসার পথ। এই ব্যর্থতা মার্কস-এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, কারণ তাঁদের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁদের প্রাপ্য গুরুত্ব দেন নি শ্রমিক নেতারা। এই ব্যর্থতা মূলত বৃটিশ শ্রমিক

আন্দোলনেরই। বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমশ নিছক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের পথে চালিত করে যে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন পরবর্তীকালে জোরদার হয়ে ওঠে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর এক দ্রুত চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং সেই অভিনব অঘটনটি মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই সনাক্ত করে গেছেন embourgeoisment বলে। নানান প্রবন্ধে এবং চিঠিপত্রে উভয়েই আক্ষেপ করেছেন বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত বুর্জোয়া মানসিকতার জন্য।

এঙ্গেলস লিখছেন (এপ্রিল ৮, ১৮৬৩) মার্কসকে—"All revolutionary energy has faded practically entirely away from the English proletariat and the English proletarian is declaring his complete agreement with the rule of the bourgeoisie." মার্কস উত্তরে একটা ক্ষীণ আশা ব্যক্ত করেছেন (এপ্রিল ৯, ১৮৬৩)—'How soon the English workers will free themselves from their apparent bourgeois infection one must wait to see.' ১৮৭৮, ১১ই ফেব্রুয়ারী, মার্কস তাঁর চিঠিতে লিখছেন—'The English working class had been gradually more and more deeply demoralised by the period of corruption since 1848 and had at last got to the point when they were nothing more than the toil of the great Liberal Party. i, e, henchmen of the Capitalists.'

এই ধরণের শ্রমিকশ্রেণী ও তার নেতৃবর্গ যে মার্কস নামক বিপজ্জনক ব্যক্তিকে সযত্নে পরিহার করবে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। হাইণ্ডম্যান, যিনি ইংলণ্ডে ১৮৮১ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করে খানিকটা আশার সঞ্চার করেছিলেন (যার শ্রেষ্ঠ ফসল উইলিয়াম মরিস), মার্কসের 'ক্যাপিটাল' থেকে নিজের লেখায় (England for All) মার্কসের নাম না করে তাঁর অসংখ্য বিবৃতি নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন, এবং মার্কসকে পরে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এই আচরণের আসল কারণ 'The English don't like to be taught by foreigners' এবং মার্কসের নাম 'was so much detested'। কারণটি কি একেবারে মনগড়া ? ইংরেজ জাতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো ইউরোপের নির্বাসিত বিপ্লবীদের তারা আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু কোনো বিদেশীকে তার বেশি প্রাধান্য দেবে না। আমেরিকা ফরাসী বন্ধুকে যে গুরুত্ব দিতে পেরেছিল ইংলণ্ড সে নজির কখনো রাখতে আগ্রহী হয় নি। দ্বীপবাসীর

আত্মকেন্দ্রিকতা ঔপনিবেশিক বিস্তারেও কোনো ঘা খায় নি। ১৮৮০ সালে ফরাসী সমাজবাদী নেতা ছুটে আসেন মার্কসের সঙ্গে পরামর্শ করতে। জার্মান নেতারা তো আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শুধু ইংরেজ শ্রমিক নেতারাই ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের আত্মরক্ষার তাগিদে। যদি ভাবতে অবাক লাগে যে মার্কস ইংলণ্ডে আমৃত্যু বসবাস করেও সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর প্রভাব ফেলতে পারেন নি, তবে আরো অবাক হবার বিষয় যে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি থাকতেও হাইগেট সিমেটারীতে মার্কসের একটি উপযুক্ত সমাধি ও মূর্তি নির্মাণ হয় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচেষ্টায় ১৯৫৬, ১৪ই মার্চে।

শ্রমিকশ্রেণীকে ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির অংশীদার করে বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে যে সংস্কারবাদের যাদুকাঠি প্রয়োগ করে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার ফলে অবশ্যই মার্কসবাদের প্রসারও সেখানে সেই পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু আপোষকামী মনোভাবের ফলে শ্রমিকশ্রেণী যেমন বুর্জোয়া হয়ে উঠেছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকেও খানিকটা বদলাতে হয়েছে তার-সাম্য রক্ষা করার জন্য ; যার ফলশ্রুতি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)। এর পিছনে কাজ করেছে নানান ধরণের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, যার মধ্যে অগ্রগণ্য হলো ফেবিয়ান সোশালিজম—লেবার পার্টির তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই পরিবেশে ইংরেজী সাহিত্যে মার্কসীয় প্রভাবের বদলে ভিন্নতর সমাজবাদী মনোভাবের অনুপ্রবেশই স্বাভাবিক ছিল, এবং সেটাই ঘটেছে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যটি ছিল কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

চার্টিস্ট আন্দোলনের একটা মস্ত অবদান চার্টিস্ট সাহিত্য। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, এমন কি উপন্যাস লেখা হয়েছে চার্টিস্ট মতাদর্শকে সামনে রেখে। শ্রেণী-সংগ্রামের এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ ইংরেজী সাহিত্যে আর কোথাও এমন আকার নেয় নি। এক্ষেত্রে স্মরণীয় হুইলারের কবিতা 'Freedom And the Charter'—যেখানে চার্টারকে স্বাগত জানানোর আগে দাবি করা হচ্ছে—

> Though bright are the beams of dear
> Though rapture her lips can impart,
> Yet brighter the glance of dear liberty,...

স্মরণীয় বেনজামিন স্কটের 'Song for the Millions' ; আর্নেস্ট জোন্সের 'We are Silent'—

CENTRAL LIBRARY

We are dead, and we are burried !
Revolution's soul is tame !
They are merry o'er our ashes,
And our tyrants rule the same !
But the Resurrection's coming
As the Resurrection came.

জোন্‌স ছিলেন চার্টিস্ট লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান। তাঁর 'The Song of the Low' শুধু সবচেয়ে জনপ্রিয় গানই ছিল না, এ যুগেও তার কাব্যিক আবেদন বাতিল হয়ে যায় নি। উল্লেখযোগ্য কবিতার মধ্যে আছে তাঁর সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতা। তিনি উপন্যাসও লিখেছেন (The Confessions of a King ; The Romance of a People) ; উপন্যাস লিখেছেন হুইলার (Sunshine and Shadow) এবং ক্রস্ট (The Secret)। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত এই বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে। পরবর্তীকালে চার্টিস্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্যও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। মার্ক সবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই সাহিত্য রচিত না হলেও স্বভাবে ও মেজাজে এই সাহিত্যকে মার্কসীয় বলার অসুবিধে নেই। তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে মার্কসীয় সাহিত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো এ যুগে উইলিয়াম মরিসের The Pilgrims of Hope, A Dream of John Ball, News from Nowhere।

E. P. Thompson-র William Morris : Romantic to Revolutionary (1955) গ্রন্থটি প্রকাশ হবার পর থেকে মরিসের গুরুত্ব আধুনিক মার্কসবাদীদের কাছে বৃদ্ধি পেয়েছে। News from Nowhere-কে বলা যেতে পারে প্রথম সুচিন্তিত সাম্যবাদী ইউটোপিয়া। বিংশ শতকে সাম্যবাদী ইংলণ্ডের যে ছবি মরিস এঁকেছেন তার আবেদন অবশ্য আজ বাস্তবের বিচারে নিঃশেষিত, কিন্তু এই সেই রচনা যেখানে মরিস শ্রমিকের alienation-কে তুলে ধরেছেন ঠিক সেই ভাবে যেভাবে মার্কস তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর প্রাথমিক রচনায়, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি অনেক বছর পর।

সাম্যবাদী সমাজে মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপ (the whole man) কেমন হতে পারে তার যে ইঙ্গিত মরিস রেখেছেন তা এক গভীর উপলব্ধির ফল। বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে মরিসের স্বপ্ন নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর সাহিত্য

কর্মে। 'The Pilgrims of Hope'-এ তিনজন ইংরেজকে পাই আমরা, তাঁদের একজন প্যারি কমিউনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা নিয়ে প্যারি থেকে লণ্ডনে ফিরে আসেন, এবং শুরু করে দেন একই সংগ্রাম স্বদেশের মাটিতে। তবে মরিস দেখিয়েছেন প্যারি কমিউনের আগেই এরকম সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে ইংলণ্ডে, যা নিতান্তই কাল্পনিক। আজ মরিসের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার এঙ্গেলস তাঁকে 'সেন্টিমেন্টাল সোসালিস্ট' বলেছেন। ই. পি. টমসন এবং অন্যান্যরা এখন এঙ্গেলসের এই মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও একথা অনস্বীকার্য যে মরিসের সততা সত্ত্বেও তিনি কর্মপদ্ধতিতে এমন প্রমাণ রাখেননি যাতে তাঁকে মার্কসীয় অর্থে 'বাস্তববাদী' বলা যায়। হাইণ্ডম্যানের দল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা যে সোসালিষ্ট লীগ তৈরি করেন তার বিকাশও যথাযথ ছিল না।

কিন্তু এমন কথা কি বলা যাবে যে মরিসের সাহিত্য সেইভাবে বিকশিত হয়েছিল যা পরবর্তী ইংরেজ বা অন্যভাষার মার্কসবাদী সাহিত্যিকের অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে? অন্যদিকে এমন মনে হওয়া কি অন্যায় যে মরিসের চিন্তাভাবনা তাঁর শিল্পগুণের চেয়ে অনেক বেশি মহৎ? মরিসের 'News from Nowhere'-এর চেয়ে স্যামুয়েল বাটলারের 'Erewhon' কি বেশি উপভোগ্য নয় সাহিত্য হিসেবে?

জনপ্রিয়তার বিচারে মরিসের মত মার্কসবাদীর চেয়ে বার্ণার্ড শ'র মত কাণ্ডজ্ঞে সমাজবাদীর সাফল্য অনেক বেশি, এবং তা শুধু বৃটেনের সংস্কারপন্থী রাজনীতির জন্যই নয়, বার্ণার্ড শ'র তুলনামূলক বেশি সাহিত্যগুণের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পরও, বার্ণার্ড শ'র জনপ্রিয়তা কমে নি, কমে নি এইচ. জি ওয়েলসের জনপ্রিয়তা। লেনিন শ'র লেখা মন দিয়ে পড়তেন, এ ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। গলসওয়ার্দির সুনাম এখন অন্তর্হিত হলেও তাঁর সময়ে তাঁর উপন্যাস ও নাটক নাড়া দিতে পেরেছিল। অথচ আমরা এখন ধরতে পারি, ওয়েলস্ গলসওয়ার্দির চিন্তা-ভাবনায় গোঁজামিল কতখানি, এবং তাঁদের শিল্পরীতির সীমাবদ্ধতাও কোথায়; কিন্তু মরিসের পাশাপাশি শ' বা ওয়েলসের উপভোগ্যতা বোধহয় কিঞ্চিৎ বেশি। John Goode অবশ্য 'William Morris and the Dream of Revolution' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বৈপ্লবিক সাহিত্যের তৎকালীন উপযুক্ত 'form' নির্মাণে মরিস ছিলেন একমাত্র সফল লেখক। তবে তিনি অন্য সোশালিস্ট লেখকদের সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY

মরিসের তুলনা করেন নি। একেবারে বিপরীতধর্মী চরমপন্থী সিদ্ধান্ত টেনেছেন জর্জ অরওয়েল: 'The real socialist writers, the propagandist writers, have always been dull, empty windbags'—এবং এঁদের মধ্যে যেমন শ' আছেন তেমনি উইলিয়াম মরিসও আছেন (The Road to Wigan Pier)।

বোধহয় একই অভিযোগ আনা যাবে না তিরিশের দশকের মার্কসবাদী কবিদের বিরুদ্ধে। অডেনগোষ্ঠী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে শক্তির পরিচয় রেখেছেন তা অরওয়েলীয় অভিযোগকে খণ্ডন করার পক্ষে যথেষ্ট। কাব্য-নাটকে অডেনের সৃজনশীলতা বৃটেনে মার্কসবাদী লেখকদের পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যদিও অরওয়েল প্রথমে অডেনকে 'gutless Kipling' বলে তাচ্ছিল্য করেছেন পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। মরিসের মার্কসবাদী মনোভাব যতটা গ্রহণযোগ্য তাঁর লেখনরীতি ততটা নয়, এটা যদি সত্য হয়, তবে এ-ও সত্য অডেন গোষ্ঠীর পাঠ্যগুণ যতটা ততটা তাঁদের মার্কসবাদী দায়বদ্ধতা ছিল না। পরবর্তী কালে তাঁরা সবাই উল্টো দিকে ছুটেছেন। অরওয়েল এই গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন— Pink Pansy Left।

অডেন আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ক্রমশ খৃষ্টীয় ধর্মের দিকে আত্ম-নিবেদন করেন। তিনি এমন কি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Spain' বাদ দেন তাঁর পরবর্তী সংকলন থেকে। স্পেণ্ডার 'God that failed'-এর দোহাই দিয়ে 'Encounter'-এর সম্পাদনায় যোগ দেন যার পশ্চাতে ছিল C.I.A.-এর সক্রিয় ভূমিকা। ম্যাকনিস গ্রহণ করেন রাজকীয় সম্মান, এবং ডে লুইস ১৯৬৮ সালে 'পোয়েট লরিয়েট' হন। একটু বিশ্লেষণ করলে অবশ্য বোঝা যায় অডেন গোষ্ঠীর বামপন্থা ফ্যাসীবিরোধী পরিবেশে এক অবধারিত আত্মরক্ষার উপায় মাত্র; মূল জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে তাদের আন্দোলনে সামিল হয়ে সাম্যবাদের পথ তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষমতা কোনোটাই তেমন ছিল না। এ কারণে তাঁদের নিয়ে তামাসাও কম হয় নি। তাঁদের বলা হয়েছে 'Cadillac Communists'। রয় ক্যামবেল ব্যঙ্গ করে যে গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন— 'Mac Spaunday' (Mac Neice, Spender, Auden, Day Lewis)— তাঁদের উচ্চবিত্ত পটভূমিকা ও রাজনৈতিক শৌখিনতার যোগাযোগ কারোর নজর এড়িয়ে যায় না। যদিও জর্জ ওয়াটসন (Politics and Literature in Moden Britain) বিশ্বাস করেন স্পেণ্ডারের 'Trial of a Judge' এবং

ডে লুইসের 'The Road these Times Must Take' ইত্যাদি রচনায় যে হিংসা-প্রীতি বেরিয়ে আসে তা মেকি নয়, বরং আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ফল। জর্জ অরওয়েলের সনাক্তকরণ আরো সঠিক মনে হয়। তিনি বলেছিলেন—'So much of leftwing thought is a kind of playing with fire by people who don't even know that fire is hot.'

বস্তুত শুধু ইংলণ্ডে নয়, ইউরোপের অন্যত্র, এমন কি ভারতেও, স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল ফ্যাসীবিরোধী শিবিরে তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী যাঁরা রাজনৈতিক মনোভাবে আদৌ বামপন্থী নন। পপুলার ফ্রন্ট নীতি বহাল থাকায় তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোটা যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি স্বাভাবিক ছিল তাঁদের সুযোগমত সশরীরে প্রস্থান। বৃটেনে, যেখানে তেমন একটা কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল না যাকে এড়ানো যায় না, যেখানে বুর্জোয়া সংস্কারপন্থায় স্বস্তি পেয়েছে শ্রমিক শ্রেণী ও নেতারা, সেখানে তিরিশের দশকে বৃটিশ লেখকদের তথাকথিত বামপন্থী অংশের কাছ থেকে অন্যরকম বিকাশ আশা করা ঠিক নয়। দুটি বিপরীত উদাহরণে শুধু ভিন্নমুখী দুটি প্রবণতাই এ যুগের সবচেয়ে বড় লক্ষণ—কডওয়েল ও অরওয়েল। দু'জনেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, দু'জনেই গদ্য লেখক ; কিন্তু কডওয়েলের মার্কসবাদে আস্থা ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে যুদ্ধের ফলে, অরওয়েলের সংশয়বাদ ক্রমশ গাঢ় হয়েছে একই ঘটনায়। অরওয়েলকে যদি বামপন্থী লেখক হিসেবে ধরা হয়, তবে তিনিই আধুনিক বৃটেনে মার্কসবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান। অরওয়েল সর্বদাই মার্কসবাদকে আক্রমণ করে গেছেন, কিন্তু তাঁর এই বিরোধিতাই তাঁর চিন্তাভাবনা, আবেগ, কল্পনাশক্তি, ভাষাকে তীক্ষ্ণতা দান করেছে। 'অ্যানিমাল ফার্ম ও ১৯৮৪' যদি সাম্যবাদ বিরোধী রূপক ও রূপকথা হিসেবে বড় মাপের সাহিত্য হয়ে থাকে তবে, 'রোড টু উইগান পিয়ার' জার্ণালিষ্টিক রিপোর্টিং-এর এক অসাধারণ উদাহরণ।

মজার ব্যাপার উইলিয়াম মরিসের স্বপ্ন (News from Nowhere) যদি এই শতকে মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে থাকে, অরওয়েলের দুঃস্বপ্নও অমূলক হয়ে গেছে ১৯৯০-এ—পূর্ব-ইউরোপ এমন কি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের পর। ইতিহাস বারবার বিপ্লবোত্তর সমাজ নিয়ে মানুষের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন উভয়ই বানচাল করে দিচ্ছে—এই অভিজ্ঞতা শুধু বৃটেনে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। তিরিশের দশকের পর ইংরেজি সাহিত্যে মার্কসবাদের এক নতুন অভিঘাত অনুভব করা গেল ষাটের দশকে 'নিউ লেফট' লেখকদের মধ্যে। পঞ্চাশের শেষদিকে হাঙ্গেরি আক্রমণের

CENTRAL LIBRARY

পর সোভিয়েত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ও নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যে জনমত গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যে তারই ঢেউ এসে লাগে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এই সময়ই রিচার্ড হোগার্টের 'The Uses of Literacy' এবং রেমণ্ড উইলিয়ামসের 'Culture and Society' অসবর্ণের নাটক 'Look Back in Anger' ও 'The Entertainer', ওয়েসকারের 'Roots' এবং 'I'm talking about Jerusalem' এক নতুন বামপন্থী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করে। 'নিউ লেফট' গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী সনাতন মার্কসবাদীর কাছে বেশ গোলমেলে ঠেকবে। তাঁরা বৃটিশ সমাজের বিবর্তনকে মেনে নিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান রূপান্তরের ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। ক্ষমতাদখলের শ্লোগানে তাঁরা আগ্রহী নন, কেননা সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাস্তব। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির 'Read to Socialism' তত্ত্বের প্রতি তাঁদের অনাস্থা যে কারণে তার মধ্যে নতুনত্ব থাকলেও প্রকৃত বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি নেই। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে তিরিশের মার্কসবাদী লেখক-দের মূল পার্থক্য হলো এঁরা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসেন নি, প্রধানত এসেছেন শ্রমিকশ্রেণী থেকে। হোগার্ট ও উইলিয়ামস তা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে এসেছেন, এবং তাঁদের ব্যক্তিগত উন্নতিই যেন প্রমাণ করে দেয় বর্তমান বৃটিশ ব্যবস্থায় এটাও সম্ভব। বস্তুত, বিশ্ববিদ্যালয় হলো 'নিউ লেফটে'র প্রস্তুতি-সদন এবং অ্যাকাডেমিক গবেষণা তাঁদের প্রধান কাজ। এর একটা সুফল হলো বৃটিশ ইতিহাসের (হিল এবং টমসনের লেখায়), এবং উনিশ শতকের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের নবমূল্যায়ণ (উইলিয়ামস ও টমসন)।

জর্জ ওয়াটসন এঁদের বিদ্রূপ করেছেন তাঁর 'The New Left' প্রবন্ধে (Politics and Literature in Modern Britain) —'The New Left Sage was an Established Revolutionary. A pillar was what he wanted to become, and in Britain at least he usually succeeded'. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের দেশেও এই গোষ্ঠীর প্রেরণায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ মার্কসবাদকে নিছক গবেষণা ও সেমিনারের বিষয় করে তুলেছেন। তবে এই প্রসঙ্গেই আমাদের বামপন্থী সাহিত্যের সঙ্গে বৃটিশ বামপন্থী সাহিত্যের তুলনা এসে পড়ে।

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর পড়লেও, বিপ্লবের চাইতে অর্থ নৈতিক লড়াইয়ের ওপর নির্ভরতা বাড়লেও, একথা অনস্বীকার্য বাংলা সাহিত্যে বামপন্থী চিন্তাধারা যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করতে পেরেছে [বৃটিশ

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যে তা হয় নি। এর প্রধান কারণ, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ আমাদের চেতনার কেন্দ্রে টেনে এনেছে মার্কসবাদকে, এবং এর পেছনে আছে কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গনা, নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা। বিপ্লব খণ্ড খণ্ড হয়ে ঘটলেও তার প্রভাব জনমানসে যতটা দেখা যাবে নির্বাচনী লড়াই-এ তা দেখা যায় না। বৃটিশ জনতা গত শতকের আন্দোলনের পর এত বেশি নির্বাচন-মুখী হয়ে উঠেছে যে 'বিপ্লব' কথাটাই সেখানে হাস্যকর হয়ে গেছে। আমরা 'বিপ্লব' শব্দটিকে 'এখনও' অতটা মূর্খের স্বপ্ন বলে মনে করি না। তাই বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় ধারাটি বৃটিশ সাহিত্যের মত এত কোণ-ঠাসা নয়। তাছাড়া এদেশে আপাতত যে নির্বাচনমুখী বামপন্থার অগ্রগতি চলছে তার সঙ্গেও বৃটিশ বামপন্থার তুলনা চলে না। বৃটেনে তিরিশের দশকে আন্তর্জাতিক ঘটনার ফলে বুদ্ধিজীবীদের বামপন্থী না হলে চলতো না। আমাদের নির্বাচন-জয়ী বামপন্থী দল গুলির ছত্রছায়ায় মার্কসবাদের প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে পত্র-পত্রিকার পাতায়— চল্লিশের দশক থেকেই। আমাদের কাছে মার্কসবাদ তাই নানা অর্থে অনেক লাভজনক, বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে যা আদৌ নয়।

মনে করা যাক, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে বৃটিশ সরকারের অংশীদার হয়েছে। তাতে কি মার্কসবাদের কৌলিন্য হঠাৎ বেড়ে যাবে না সেখানে? তাতে কি বৃটিশ সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব হঠাৎ বেড়ে যাবে না? যে-কোন মতাদর্শ আগে রাজনীতিতে জায়গা করতে পারলেই সাহিত্যেও তার প্রসার ঘটে। কিপলিঙের মত উপনিবেশবাদী লেখক তৈরি হয়েছিলেন ঔপনিবেশিকতা যখন রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে। যে-দেশেই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এমন কি আমেরিকাতেও এই ঘটনা দেখা গেছে। ম্যাকার্থিবাদের যুগে সেখানে কমিউনিস্ট বিতাড়নের মূলেও ছিল আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির বিপজ্জনক সম্ভাবনা, যা সরকারী মত অনুসারে সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ সরকারের কাছে কখনই এমন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে নি, না বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে, না জনপ্রিয়তায়। তাই সেখানে সেই পরিবেশ তৈরি হয় নি যেখানে মার্কসবাদের সংস্পর্শে সৃজনশীল সাহিত্যের এমন বিকাশ হতে পারে যাতে একজন সন ওকেসি, একজন ব্রেখ্‌ট, একজন পাবলো নেরুদা, বা একজন আঁদ্রে ম্যালরো জন্মাতে পারে।

আপাতত যতদিন না সেই পরিবর্তন আসছে বৃটিশ মার্কসবাদী লেখকদের Joe Corrie-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে হবে—

Working man, I have faith in you,
Tho' you're such a damned fool in my eyes,
I know, full well, how they've wasted you,
And clotted your brain with their lies.
I've heared the sleek persons preach to you,
I've studied the dope of the Press,
And tho' they have made such a mess of you,
I have faith in you, nevertheless,

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বদল

(এনলাইটেনমেন্ট থেকে ইলেকট্রনিকস)

দেবেশ রায়

আমাদের রাজনীতিতে টিভি যে এমন একটা জবরদস্ত ব্যাপার হয়ে উঠবে পাঁচ বছর আগেও তা ভাবা যায় নি। ১৯৮৯-এর লোকসভার ভোটের আগে সরকারি দল হিশেবে টিভিকে কংগ্রেস (ই) যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পেরেছিল। টিভি সরকারি সংস্থা, সুতরাং সরকারের কাজকর্ম ও দৈনন্দিন নানা ঘটনা দেখাবার সূত্রে টিভিকে কার্যত কংগ্রেস (ই)-রই প্রচার মাধ্যম যে করা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ, কংগ্রেস (ই) রাজীব গান্ধীকেই সেই দলের এক ও একমাত্র প্রতীক হিশেবে মেনে নিয়েছিল। টিভির যে-কোনো কর্মসূচিতেই দর্শনীয় কিছু থাকা দরকার—যাকে টিভির ভাষায় বলে, 'ভিস্যুয়াল'। দর্শনীয় সেই কিছু যদি হয় একজন মানুষ, বা মানুষের মুখ, তা হলে সেই 'ভিস্যুয়াল', সেই মানুষটি যার প্রতীক তার সঙ্গে মিশে যায়। টিভির বিজ্ঞাপনে এ-রকম ভাবেই আমরা চিনে ফেলি কোন মেয়েটি পণ্ডসের মুখ, কোন মেয়েটি লিরিল সাবানের বা কোন শিশুটি এম-আর-এফ টায়ারের। ঠিক তেমনি করেই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল কোন মুখটি কংগ্রেস (ই)-র।

কংগ্রেস (ই) এই সুযোগ সম্পর্কে সচেতন ছিল, সরকারের যে-বিভাগ টিভি চালায় তারাও ছিল, আর সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন স্বয়ং রাজীব গান্ধী। এতটাই সচেতন ছিলেন যে টিভিতে কোনো দলের নির্বাচনী প্রতীক দেখানো বে-আইনি বলে তিনি প্লেন থেকে নামার সময়, মিটিঙের মঞ্চে দাঁড়িয়ে, বা এমন কি গাড়ি চালিয়ে যেতে-যেতেও নিজের হাতটা নাড়াতেন, যতটা না হাত নাড়ানোর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, তার চাইতে বেশি হাতটাকে স্থির রাখতেন কংগ্রেস (ই)-র নির্বাচনী প্রতীকের কথা মনে করিয়ে দিতে। টিভির যে ক্যামেরাম্যানরা রাজীব গান্ধীর সঙ্গে থাকতেন তাঁরাও নিশ্চয়ই জানতেন রাজীব কী চাইছেন। ক্যামেরা সে কাজটা করে দিত।

তার সঙ্গে ছিল নেহরু শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের রিপোর্ট

বা দলিলচিত্র। সেগুলোতে কংগ্রেস (ই)-কে ও তার নেতা রাজীবকে গান্ধী-নেহরু ধারার উত্তরাধিকারী হিশেবে উপস্থিত করা হত। কেউ যে এ-রকম বক্তৃতা দিতেন, তা নয়। কিন্তু মঞ্চের ওপর গান্ধী, নেহরু, ইন্দিরা ও রাজীবের ছবি দিয়েই উত্তরাধিকারের সেই সংজ্ঞাটি রাখা হত।

এ ছাড়াও ছিল স্বাধীনতার জন্যে দৌড়—যাতে রাজীব আর সোনিয়া ট্র্যাকস্যুট পরে ইণ্ডিয়া গেটে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্যামেরা অনেকক্ষণ ধরে রাজীবকে অনুসরণ করেছে—তিনি কী ভাবে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন, তাঁকে চেনা যাচ্ছে না, আলাদা করা যাচ্ছে না, তিনি ভারতের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে মিশে আছেন। যদিও আসলে তখন তাঁকে ঘিরে ছিল তাঁরই স্পেশ্যাল প্রটেকশন গ্রুপ ও ক্যাটের লোকরা। কিন্তু তাঁদেরও ত সেই একই ট্র্যাকস্যুট। আমরা, দর্শকরা, কী করে তাঁদের আর আলাদা করা যাবে।

ওর সঙ্গে-সঙ্গে বেশ কিছু ক্লিপিং ছিল। তার কোনো-কোনোটা কোনো-কোনো বিজ্ঞাপন কোম্পানি তৈরি করিয়েছে, কোনো-কোনোটা টিভির নিজেরই। এ রকম ক্লিপিঙের মধ্যে দুটো খুব ভাল লাগত সবার। একটাতে ভীমসেন যোশী গান গেয়ে শুরু করতেন আর খেলাধুলো ও ফিল্মের বিখ্যাত সব ব্যক্তিরা এক লাইন করে গাইতেন—বোধহয় লতা শেষ করতেন। আর-একটাতে, মশাল নিয়ে সারা ভারতের বিচিত্র ভূপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে খেলাধুলোর বিখ্যাত নায়করা মশাল নিয়ে দৌড়তেন—ক্যামেরা খুব ধীরে চলে একটা আততি তৈরি করত।

মাত্র ত মাস পাঁচ সাত আগের কথা। এখনই মনে হচ্ছে যেন কত বছরের পুরনো এ সব ছবি। অথচ যখন দেখানো হত তখন এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। টিভির পর্দা যে দেখতে পাচ্ছে না সেও অন্য ঘর থেকে শুধু সঙ্গীত শুনে বা আওয়াজ শুনে দৃশ্যটা দেখে ফেলত। বিজ্ঞাপনের সঙ্গীত যে-রকম আমাদের চেনা হয়ে যায় আর সেই কারণেই বিজ্ঞাপনচিত্রনির্মাতারা যেমন সঙ্গীতের ওপর একটু বেশি জোর দেন-তেমনি রাজনৈতিক সংবাদকে যখন বিজ্ঞাপন হিশেবে ব্যবহার করতে হয়, তখন বিজ্ঞাপনের নিয়মেই সঙ্গীতের ওপর একটা ঝোঁক আসে।

সেই ঝোঁকটা সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে একটা অতিরিক্ত ঝোঁক। এশিয়াডের থিম মিউজিক তৈরি করেছিলেন স্বয়ং রবিশঙ্কর। কিন্তু এশিয়াড যে-ধরনের দৃশ্যমান ঘটনা, যে-ধরনের মিডিয়া ইভেণ্ট তাতে রবিশঙ্করের থিম মিউজিক জমানো গেল না। নেহরু শতবর্ষ উপলক্ষে খেলার

CENTRAL LIBRARY

আয়োজনে অনুষ্ঠানশেষের দিন সমাপ্তি সঙ্গীত গাইলেন শারণ প্রভাকর। তাঁর গানটা শুধু শোনানো হল না, গানটা তৈরি হতে দেখা গেল—কী করে শারণ প্রভাকর একটা কোনো উপায়ে ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে যাচ্ছেন, শেষে প্রায় পুরো নেহরু স্টেডিয়ামের ওপরে নিজেকে অস্থির করে শারণ সমাপ্তি সঙ্গীত গাইছিলেন। কারো ভাল লাগতে পারে, কারো ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া খেলাধুলোকে, তার পরিবেশকে, তার পাত্রপাত্রীদের যে 'দৃশ্য' করে তোলে তার সঙ্গতি রাখতে হলে সঙ্গীতকেও এক ধরনের 'দৃশ্য' হতে হয়। এমন-কি, 'সঙ্গীত'-এর মত শুদ্ধ স্বর-আশ্রয়ী একটা বিষয় দৃশ্যতা থেকে সরে যাওয়াই যার সংস্কার সঙ্গে যুক্ত—টিভিতে স্বরআশ্রয়ী থাকার চাইতেও দৃশ্য আশ্রয়ী হয়ে উঠতে বাধ্য। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দৃশ্যে শুদ্ধতা সঞ্চার করে, শুধু স্বরের নয়।

রাজীব গান্ধী দেশকে একুশ শতকে নিয়ে যাওয়ার যে-প্রতিশ্রুতি ঘোষনা করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। প্রায় পুরো দেশকেই এই মিডিয়ায় গেঁথে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। আর রাজীবের নেতৃত্বে ভারত সরকার এই মিডিয়াকে ব্যবহারযোগ্য করে দ্রুত বদলে ফেলেছিল তাদের প্রচারের কায়দা।

রাজীবের আমলেই উৎসবের রাজনীতি আমাদের কেন্দ্রীয় শাসনের একটা প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ইন্দো-সোভিয়েত উৎসব, ইন্দো-ফরাসি উৎসব, আপনা উৎসব, এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস, ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল, অসংখ্য ক্রিকেট খেলা ও তাছাড়া অসংখ্য ছোটখাট উৎসব টিভির পর্দাতে এই পুরো পাঁচ বছর (১৯৮৪-১৯৮৯) লেগে ছিল। এই সব উৎসবের অনেকগুলির আয়োজক ভারত সরকার স্বয়ং। কিন্তু যেগুলির আয়োজক ভারত সরকার নন, সেগুলি, বিশেষত ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি দেখানো সম্ভবই হত না যদি ভারত সরকারের একটি মন্ত্রকের অধীনে 'দূরদর্শন' সেগুলি না দেখাত। রাজীবের আমলেই প্রথম রাজনীতির প্রয়োজনে সংস্কৃতি এমন ব্যবহৃত হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্যেই। আর সেই মিডিয়ার প্রয়োজনেই সংস্কৃতির চেহারাটাও টিভি মিডিয়ার যোগ্য করে তোলা হয়েছিল।

১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনে 'দূরদর্শন'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান হয়ে ওঠে। তাই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে যে-ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের সরকার সেই নির্বাচনের

ফলে তৈরি হল, তাদের এখন অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হয়ে উঠেছে 'প্রসরে ভারতী' বিলকে আইনে পরিণত করা। নির্বাচনের সময় ভোটারদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেলে ও ভোটারদের রাজনৈতিক ইচ্ছার সমর্থন পেলে যে-কোনো শ্লোগানই কার্যকর হয়ে ওঠে। ১৯৭৭-এর জনতা সরকারের অপদার্থতার ফলেই পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী 'ইলেক্ট দি গভর্নমেণ্ট দ্যাট ওয়ার্কস' এই শ্লোগান বানিয়েছিলেন।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে টিভির প্রশ্নটির গুরুত্ব শুধু দেশের রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত নয়—এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বা রাজনীতির সংস্কৃতি।

'কালচারাল ক্রিটিক' কাগজের ১৯৮৭-৮৮-র শীত সংখ্যায় জোসেন স্থলট-সাস একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'রেগান যুগে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি।' তিনি তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বের উদাহরণ নিয়েছিলেন রেগানপর্বের দুটি ঘটনা থেকে—লিবিয়া আক্রমণ ও সারা আমেরিকা জোড়া হাতের বাঁধন। দুটোই মার্কিনি টিভিতে প্রধান কর্মসূচি হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

স্থলট-সাস বলেছেন—রেগানের লিবিয়া আক্রমণ মার্কিনি পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। নব্য রক্ষণশীল সামাজিক নীতির ফলে রেগান প্রশাসন একটু প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল, লিবিয়া আক্রমণ নিজের সামাজিক নেতৃত্ব দৃঢ় করার চেষ্টা। সুতরাং লিবিয়া আক্রমণকে দেখতে হবে আভ্যন্তরীণ নীতি হিশেবে। আর পররাষ্ট্রনীতি ঘটিত একটা ঘটনা যে আভ্যন্তরীণ নীতিতে রূপান্তরিত হল, তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ফলে।

স্থলট-সাসের এই ধরনের আলোচনা কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞতার ফল নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতির ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চোমস্কি মন্তব্য করেছিলেন, "১৪ এপ্রিলের আক্রমণ (লিবিয়া আক্রমণ) ইতিহাসে প্রথম সামরিক অভিযান যার সময় টেলিভিশনের প্রাইমটাইমের কথা মনে রেখে ঠিক করা হয়েছিল।"

কারণ, এই অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "রেগান" বলতে কী বোঝায় তা যতটা না গদ্দাফিকে বোঝানো, তার চাইতে বেশি বোঝানো মার্কিন নাগরিকদের। লিবিয়া আক্রমণের দৃশ্য টিভিতে দেখানোর পরই তাই দেখানো হয়েছিল "রেগান"-এর মারমুখী ভঙ্গি। আক্রমণের প্রথম খবরের পরই রেগানের মুখ পর্দায় এল। রেগান মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলছেন, "আমরা উচিত শিক্ষা দিতে

চেয়েছি," "আবার দেব," আর এই বক্তৃতার মাঝেমাঝেই দেখানো হচ্ছে লিবিয়ায় তখন সত্যি-সত্যি যে-আক্রমণ করা হচ্ছে, তার বাস্তব দৃশ্যের টুকরো। বিশদ সংবাদ নয়, ব্যাখ্যা নয়, বিশ্লেষণ নয়, প্রেসিডেন্ট মার্কিন জনসাধারণকে বোঝাচ্ছেন না—কেন এ-রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হল। উল্টো দিকে প্রেসিডেন্ট নিজেই এ-ঘটনার সঙ্গে দৃশ্যত এক হয়ে গেলেন, তাঁরই বক্তৃতার সঙ্গে মিলিয়ে, বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক সেই মুহূর্তের লিবিয়া-আক্রমণের ঘটনাগুলো দেখানো হচ্ছে। এ ত আর কোনো মতেই পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া, এমন-কি, তাৎক্ষণিক সম্পাদনার ব্যবস্থা ছাড়া, সম্ভব নয়।

মার্কিন টিভির এই কৌশল রাজীব গান্ধী প্রায় কার্বন কপি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনার ভূমিকা এক সময় প্রায় প্রতিদিন টিভিতে দেখানো হত। যেন, রেগানের কাছে লিবিয়া যে আভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যম হয়েছিল, রাজীবের কাছে শ্রীলঙ্কাও সে-রকম হয়ে উঠেছিল।

স্যলট-সোসে তাঁর উল্লিখিত নিবন্ধটিতে মন্তব্য করেছিলেন, পণ্যধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য যেমন লিবিয়া আক্রমণের প্রোগ্রাম ও 'হাওস এ্যাক্স আমেরিকা' প্রোগ্রামে পাওয়া যায়, তেমনি আবার এই দুটো ঘটনায় উক্ত আধুনিক সমাজের সাংস্কৃতিক আকাঙ্খার পরিবর্তনও ধরা পড়ে।

স্যলট-সোসে আরো একটু পরিষ্কার করে বলেছেন—মডার্নিটি ও মডার্নিজম, পোস্ট মডার্নিটি ও পোস্ট মডার্নিজমের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। তিনি একটু সূত্র দিয়েই বলতে চেয়েছেন—শিল্প বিপ্লবের ফলে যে-সমাজ সংগঠন তৈরি হয়েছে, যাকে হাই ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়ে থাকে, তাকে বলা যায় মডার্নিটি। এর কালসীমা আঠার শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর। এই সামাজিক-ঐতিহাসিক পর্বের সাংস্কৃতিক চেহারাকে তিনি বলতে চান মডার্নিজম। ঠিক এই সংজ্ঞা অনুযায়ী এই মডার্নিটির পর্বের অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের পর থেকে বিশ শতকের এই শেষ দশক পর্যন্ত এই তথাকথিত হাই ক্যাপিটালিজমের যে-রূপান্তর হয়েছে তাকে বলা যায় পোস্ট-মডার্নিটি ও তার সাংস্কৃতিক রূপকে পোস্ট মডার্নিজম।

আমি এখানে কথাগুলি ইংরেজিতেই রেখেছি কারণ সেই ভাষাতেই এই পর্বভাগ বোঝা সহজ। মনে রাখা দরকার সমাজবিজ্ঞানের এই পর্ববিভাজনটা করা হয়েছে হাই ক্যাপিটালিজম প্রসঙ্গেই অর্থাৎ আমরা আমাদের রাজনীতির ভাষায় যাকে বলি অগ্রসর পুঁজিবাদের দেশ। কিন্তু এই পর্ববিভাজনে পুরো

CENTRAL LIBRARY

প্রায় সোয়া দুশ বছরের মডার্নিটিকে দাঁড় করানো হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ-পচাত্তর বছরের পোস্ট মডার্নিটির সঙ্গে। আসলে, এই সমাজবিজ্ঞানীরা অগ্রসর পুঁজিবাদের দেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে তাকে ক্লাসিক্যাল পুঁজিবাদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করতে চাইছেন।

এই পার্থক্য খোঁজার প্রয়োজন তাঁরা দেখেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একটা নব্য রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক ধারার দাবিও বেশ স্পষ্ট হয়েছে বলে। মূল্যবোধের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্যে ১৯৮৮-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ইনস্টিটিউট ফর কালচারাল কনজারভেটিজম" সংস্কৃতিকে নির্বাচনের একটা ইস্যু করে তুলেছিল। এই মতের সমর্থক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। সবচেয়ে মজার কথা—এই মতের সমর্থকদের মধ্যে মার্কিনি নিরিখে ডান-বাম দুই পক্ষেরই লোক ছিলেন। এঁরা চাইছিলেন, পুঁজিবাদের আদি যুগে লিখিত ও মুদ্রিত সাহিত্যের মাধ্যমে যে-মূল্যবোধগুলি ইয়োরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার চর্চা আবার শুরু হোক। অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ধাক্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক দল চিন্তাবিদ চাইছেন ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেণ্টের শ্রেষ্ঠ ফল বলতে তাঁদের যা ধারনা তাকে রক্ষা করতে।

আমেরিকার এই নব্য রক্ষণশীলরা কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ানির্ভর সাংস্কৃতিক রাজনীতিরই বিরোধিতা করছিলেন, যদিও তাঁদের এ-বিরোধিতা ছিল শুধুই তাত্ত্বিক ও মোটেই পার্টিনির্ভর রাজনীতি—ভিত্তিক নয়।

আমাদের দেশের শেষ নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে এ-রকম একটা প্রাধান্য পেয়েছিল তারও পেছনে কিন্তু ছিল একটি সদর্থে রক্ষণশীল রাজনৈতিক চিন্তা। সেই চিন্তা থেকেই জনতা পার্টি, বি. জে. পি. কমিউনিস্ট পার্টি ও সি. পি. আই. (এম) প্রত্যেক দলই ঘোষণা করেছিলেন যে আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। রাজীব গান্ধী যেভাবে এই মিডিয়াকে ব্যবহার করছিলেন, তাতে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচলিত ব্যবহৃত ও অভ্যস্ত অভ্যাসগুলি সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছিল। জনসভা, পথসভা, বৈঠক মিটিং, হাট মিটিং, মহল্লা মিটিং—এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই স্বদেশী যুগ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন এগিয়েছে ও স্বাধীনতার পর আট-আটটা সাধারণ নির্বাচনও সম্পন্ন হয়েছে। মিটিং মিছিল জনসমাবেশ এটাই আমাদের রাজনীতিকে আন্দোলনের চেহারা দেয়। এমন কি নির্বাচনও একটা

আন্দোলন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের মানুষ এতেই অভ্যস্ত ও আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মী হতে হলেই আগে বক্তৃতা দেয়া শিখতে হয়, তারপর কাগজে লেখাও শিখতে হয়। দাদাভাই নৌরজি থেকে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক। তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের প্রয়োজনে সাংবাদিকতার বিশেষ রীতি তৈরি করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একজন চমৎকার বক্তা। প্রত্যেকের ঢং ছিল আলাদা; কিন্তু নিজের নিজের ঢঙে প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট। কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সাংবাদিক ও বক্তা না-হলে নেতা হওয়া যেত না—এ কথা পশ্চিমবঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোঙার পর্যন্ত সত্য।

রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের রাজনীতিতে যে গুরুত্ব পাচ্ছিল, তাতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রচার ও আন্দোলনের এই ঐতিহ্যটাই মার খাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। বোধহয় রাজীবও এ বিষয়ে সাবধান ছিলেন। তাই তিনি ভোটাধিকার পাওয়ার বয়সের সীমা একুশ থেকে কমিয়ে আঠারতে নামালেন। এই পাঁচ কোটি নতুন ভোটারের ঐ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বরং তারা এই ইলেক্ট্রনিক যুগেরই সন্তান।

আমাদের দেশে এনলাইটেনমেণ্ট ঘটে নি, আমাদের দেশে হাই ক্যাপিটালিজমও ঘটে নি। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ঘটেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতরই আমাদের দেশে নানা ধরনের বামপন্থী আন্দোলন-নেহরু পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে নকশালদের পরিচালনায় বিপ্লবী আন্দোলন ঘটেছে আর তার প্রত্যেকটিই আমাদের দেশীয় ভূখণ্ডের কোনো-না-কোনো অংশে এখনো সত্য।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গত দশ বছরে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার মত বড় শহরে ব্যক্তিগত ভিসিআর বা পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও ক্যাসেটের দোকান দেখে আমাদের মনে হতে পারে এগুলো বোধহয় মহানগরের জীবনেরই অংশ। কিন্তু দূর মফস্বলেও এখন বারোয়ারি ভিডিও দেখানো, ভিডিও পার্লার, এগুলো ব্যাপক ভাবে চলছে। ফেলে-রাখা গারাজে, বাজারে চালবিক্রির টিনের শেডে, কোনো বাড়ির বাইরের দিকের একটা আলগা ঘরে, কোনো দোকানের পেছন দিকে মালপত্রের বাক্স রাখার জন্যে তৈরি শেডে, সরকারি জমিতে তৈরি ক্লাবে বা লাইব্রেরিতে ভিডিও ক্যাসেট

টিকিট বিক্রি করে দেখানো হয়। দেখলেই বোঝা যায়, ভিডিও ক্যাসেট দেখার ব্যবস্থা এসে গেছে অথচ দেখানোর মত পরিস্থিতি তৈরি হয় নি। কিন্তু দর্শকরা এতই অস্থির যে তারা কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতেও রাজি নয়। কোনো রকমে একটা জায়গায় গায়ে গা লাগিয়ে, ঘামতে-ঘামতে, কখনো কখনো মাথার ওপর বৃষ্টির ফোঁটাও পড়ে—তারা ভিডিও ফিল্ম দেখতে চায়। আর ব্যবসায়ীরাও তৈরিই ছিলেন—এ ব্যবসাতে কোনো পৌনঃপুনিক খরচ নেই, একটা ভিসিআর, টিভি আর ফিল্ম থাকলেই বারবার দেখানো চলে। দর্শকরা ছবির গুণ নিয়ে মাথা ঘামান না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্যাগত সাংস্কৃতিক চেষ্টা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংস্কৃতিক চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য আমাদের দেশের পার্থক্যের চাইতে কয়েক হাজার গুণ বেশি। কিন্তু পার্থক্যটা সেখানে যেমন সত্য, এখানেও তেমনি সত্য। যদিও আমাদের দেশে এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেনতা তৈরি হয় নি। আমাদের দেশে সে-সচেতনতা শুধু রাজনৈতিক ইস্যু হিশেবে এসেছে। যেন টিভিকে স্বাধীনতা দিলেই এই পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়া যাবে।

পাশ্চাত্যে যাকে মর্ডার্নিটি বলা হচ্ছে অর্থাৎ হাই ক্যাপিটালিজমের সাংস্কৃতিক রূপ, সেই মর্ডার্নিটিতে সাংস্কৃতিক প্রয়াসগুলিকে সমাজের সঙ্গে একীকরণের একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকত। সেই একীকরণ থেকে সমাজের নেতা তৈরি হত—সমাজের সুপার ইগো। সেই নেতা তৈরি হওয়ার পথে নানা প্রতিযোগিতা দেখা যেত। সেই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকেই নিজের স্বতন্ত্র বক্তব্য নিয়ে হাজির হত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ধরনের চেষ্টা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। কিন্তু ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পপ্-সংস্কৃতিতে বা জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে মা-বাবার ভূমিকাকেই আদর্শ করে তোলা হত ও তারই নানা রূপান্তর দেখানো হত। টারজানও একটা পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া তৈরি করত। আমাদের দেশেও প্রধানত ৫০ সাল থেকে বম্বে ফিল্ম যে পপ্ কালচার তৈরি করেছে তার কাহিনীর একটা সামাজিক-পারিবারিক আদল থাকত। রাজকাপুর এই সময় যে-ভবঘুরের চরিত্রটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল তারও একটা ঘর ও পরিবার ছিল, বা, সে একটা ঘর ও পরিবার তৈরি করতে চায়। মারামারি-কাটাকাটি যতই থাক দুটো জিনিশ এ-ধরনের হিন্দি ফিল্মে থাকতই। প্রচুর গান—সেই গানে নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের একটা রোম্যান্টিক সত্যকে বাস্তব সত্যের চাইতে প্রধান করে তোলা হত। শেষে ভিলেনের পরাজয় ও

সত্যের জয়। অমিতাভ বচ্চন হিন্দি ফিল্মের পপ্, কালচারে এই সামাজিক পারিবারিক আদলের মধ্যেই তার শারীরিক দৈর্ঘ ও কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য দিয়ে একটু নতুনত্ব এনেছিলেন। 'শাহানশা' থেকে তাঁর পরবর্তী ফিল্মগুলোতে অমিতাভ যে কিছুতেই তাঁর দর্শকদের খুশি করতে পারছেন না, তার প্রধান কারণ ইতিমধ্যে তাঁর দর্শকরাই বদলে গেছেন। তাঁরা পুরনো গল্পের আদলের মধ্যে আর খুশি থাকতে পারছেন না। তাই অমিতাভকে নানা রকম চেষ্টা করতে হচ্ছে— 'শাহানশা'তে তাঁর ছদ্ম অভিনয়, তাঁর শেষ ফিল্মে তিনি কণ্ঠস্বর বদলে ছিলেন কিন্তু তাতে দর্শক টানতে না পেরে আবার ডাবিং করে পুরনো কণ্ঠস্বরে ফিরে গেলেন।

কিসে কী হচ্ছে তা অমিতাভ বুঝতে পারছেন না। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর ফিল্মকে বড় পর্দায় তিনচার ঘণ্টা ধরে আটকে থাকতে দিচ্ছে না—তাকে মাপে ছোট হতে হবে, তাতে রোম্যান্টিক কল্পনা তৈরির অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে।

কারণ গানে-কথায় পুরো ফিল্মের যে সুযোগ, ভিডিও ফিল্মের সে-সুযোগ নেই। ভিডিও ফিল্ম যেন আধুনিক সমস্ত কলাকৌশল ব্যবহার করে সাবেক কালের সাইলেণ্ট ফিল্ম। সেখানে এ্যাকশন আর সক্রিয়তার একটা নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। সেই এ্যাকশন্ বা সক্রিয়তার চলচ্চিত্রটুকুই দর্শক দেখছেন ও তা থেকে অর্থ বের করে নিচ্ছেন বা নিচ্ছেন না। কারণ ঐ এ্যাকশনের বাইরে অন্য কোনো অর্থে তাঁর আগ্রহ নেই। এমন কি ঐ এ্যাকশনের ধারাবাহিকতা বা কাহিনীর শৃঙ্খলাও তাঁর বিবেচ্য নয়। 'করমচাঁদ' বা এই ধরনের টিভি ফিল্ম তৈরি হয়ে ওঠে অনেক বেশি কাট, অনেক বেশি টুকরো ছবি ব্যবহার করে ও গল্পটাকে কথা থেকে কাজে সরিয়ে এনে।

কোন সাংস্কৃতিক খিদে মেটানোর জন্যে এই সব ছোট-ছোট ফিল্ম দেখার জন্যে শহরে গ্রামে-গঞ্জে-অত্যন্ত খারাপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় এমন ভিড় হয়? এক পরাশ্রয়ী অহংপ্রিয়তার তৃপ্তি। রাজকাপুর থেকে অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত হিরোদের নিয়ে যখন দর্শক মাতামাতি করে, তখন সেই হিরোদের সামাজিক-পারিবারিক আদর্শটাকেও সে অনুকরণ করতে চায়। তাই এই সব ফিল্মের এক-একটা গান তখনই হিট হয় যখন সে গান সবাই মিলে গায়। বা, এই সব ফিল্মের কোনো 'সম্বোধন' (গুরু, বা, দোস্ত) সামাজিক সম্বোধন হয়ে ওঠে। বা, এমন-কি, এই সব ফিল্মের কোনো-কোনো সংলাপও আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হয়। মা-বাবা ছেলেমেয়ের নাম রাখেন ফিল্মের গল্প থেকে নাম নিয়ে।

কিন্তু ভিডিও ফিল্মের এ-রকম কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। ভিডিও ফিল্ম একমাত্র হিট হয় তখন যখন বিভিন্ন দর্শক ব্যক্তিগতভাবে একটা ফিল্ম দেখে। ভিডিও ফিল্মের কোনো গান হিট হয় না—কারণ গানটাও দর্শকের ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্যে শোনা হয়। ভিডিও ফিল্মে কোনো হিরো নেই—কারণ, হিরোর চেহারা বা ব্যক্তিত্বে দর্শকের আকর্ষণ নেই, দর্শকের আকর্ষণ হিরোর কাজে, এ্যাকশনে। সেই এ্যাকশন এতই স্বাধীন যে, এ্যাকশনের কোনো কর্তা না থাকলেও চলে।

১৯৭৬ সালে ডেনিয়েল বেল তাঁর একটি বইতে লিখেছিলেন—সাংস্কৃতিক আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার ফলেই এমন ঘটছে যে মার্কিন সমাজে যুক্তি দিয়ে কোনো ঘটনাকে বিচার করা হচ্ছে না বা সামাজিক রাজনৈতিক কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে না। তাঁর মতে, দর্শক বা ভোক্তা এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দ্বারা প্রোচিত হচ্ছে এমন সব এ্যাকশনে যা আগে তারা কল্পনাও করতে পারত না। তেমনি তারা এমন সব অভিজ্ঞতা পেতে চাইছে, পুরনো ঐতিহ্যাগত ফিল্মে বা বইয়ে যে-অভিজ্ঞতা তারা কোনোভাবেই পাবে না। বেল-এর মতে—আধুনিক সমাজে ইচ্ছে ও তৃপ্তির মধ্যে এক সামঞ্জস্য ছিল, ড্রাগ ও রক কালচারের সংস্কৃতি যখন গণসংস্কৃতি হয়ে ওঠে তখন সেই সামঞ্জস্যটাই ধ্বংস হয়ে যায়।

বেল মার্কিন সমাজ সম্পর্কেই কথাগুলি বলেছিলেন। তার কথা সবাই ঠিকও মনে করেন না। আমাদের দেশেও ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের সংস্কৃতির ওপর যে-আধিপত্য বিস্তার করছে তার প্রধান কারণ খুঁজতে হবে আমাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের মধ্যে। পুঁজি আজ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা সকলেই জানি সারা ভারতে কয়েকটি মাত্র ব্যবসায়িক সংগঠন আছে যারা আমাদের ওয়ার্ল্ডকাপ দেখাতে পারে, ক্রিকেট খেলা দেখাতে পারে, এমন কি ওয়ার্ল্ড-দিস-উইকের মত একটি অনুষ্ঠান দেখাতে পারে। ছোটখাট সিরিয়ালের কথা না-হয় বাদই দিলাম। এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কোন অনুষ্ঠান দেখাবে কিংবা দেখাবে না, তা নিশ্চয়ই নির্ভর করবে এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তার দর্শকের রুচি কী ভাবে তৈরি করে তুলতে চায় তার ওপর। এই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই পণ্যবিক্রেতা। যাঁরা টিভি দেখেন, তাঁরা সবাই সব পণ্য কেনেন না। বাইরের থেকে মনেও হতে পারে, উইম্বলডন টেনিস বা ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস কী করে একজন ভারতীয় দর্শকের বাজারের লিস্টকে প্রভাবিত করবে? প্রতিষ্ঠান চায় সাবেকি মা-বাবা

নির্ভর সামাজিক পারিবারিক আদল ভেঙে দিয়ে দর্শককে স্বাধীন ইচ্ছার নিয়ন্তা করে তুলতে। তার ইচ্ছায় কোনো বাধা থাকা চলবে না। সরকার বা রাষ্ট্র অন্যদিকে চায় সামাজিক পারিবারিক আদলে ঐতিহ্যের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। তাই এই পুঁজি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিরোধও আছে। আমাদের দেশেও সে বিরোধটা এক রকম ভাবে চিনে নেয়া যায়। গত দশ বছরে টিভিতে টায়ারের বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য বেড়েছে অনেক বেশি। আমাদের দেশে আর ক জন টিভি দর্শক গাড়ির মালিক? কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যেই মোটর গাড়ি শিল্পের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্ক গাড়ি কেনার টাকা ধার দিচ্ছে। ফলে টাকার বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি সেই প্রতিক্রিয়ার একটি চেহারা। অপর দিকে, এই গত দশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি পূরণের বাজেটে ক্রমেই বেশি-বেশি হাবুডুবু খাচ্ছে।

কিন্তু ওটা মাত্র একটা উদাহরণই, তার বেশি কিছু নয়। আধুনিক কালে 'ক্যাপিটাল' বা 'পুঁজি' কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন নয়। পুঁজি সব সময়ই খাটানো হচ্ছে, পুঁজি সব সময়ই চলছে, ঘুরছে। পুঁজির মূল্য সব সময় বদলাচ্ছে। সেই নিয়ত আবর্তন ও নিয়ত ঘূর্ণনের কোনো স্থায়ী কেন্দ্র থাকতে পারে না। তাই পুঁজির আবর্তনে ও ঘূর্ণনে সমাজের ঐতিহ্যাগত মূল্যবোধ আর স্থির থাকতে পারছে না। আধুনিক সমাজের সাংস্কৃতিক রূপগুলিও তাই আর স্থির থাকতে পারছে না।

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে আমাদের দেশে বি.জে.পি. থেকে কমিউনিস্টরা পর্যন্ত টিভির ওপর সরকারি কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেছে ও টিভিকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছে। এটা সদর্থক রক্ষণশীলতা—রাজনীতিকে টিভি-নির্ভরতা থেকে সরিয়ে আনার সাধু চেষ্টা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-নির্বাচনে বুশ রাষ্ট্রপতি হলেন সেই নির্বাচনে সদর্থক রক্ষণশীলতা দেখা গেছে। তাঁরা দাবি করেছেন ইস্কুল-কলেজে সাহিত্য পড়াতে হবে, দর্শন পড়াতে হবে, ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেণ্টের সঙ্গে এখনকার যুবকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। রোনাল্ড রেগান রাষ্ট্রপতি হিশেবে 'ন্যাশনাল এনডাওমেণ্ট ফর দি হিউম্যানিটিজ'-এর প্রধান পদে উইলিয়াম বেনেটকে নিয়োগ করেন। ১৯৮৪তে বেনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবশাস্ত্রচর্চার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তার নাম দেন, "টু রিক্লেম এ লিগেসি", ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার।

কিন্তু নব্য রক্ষণশীল এই চিন্তা ও চেষ্টায় কী আমাদের দেশে, কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব সময়ই রাষ্ট্রকে ও সরকারকে আমাদের সামাজিক নেতৃত্বের প্রধান উৎস বলে ধরে নেয়া হয়েছে। মার্কিন দেশে বা এখানে কোথাওই পুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্রের

বিরোধকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। তাই ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বদলানো সম্ভব বলে এই দুই দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা মনে করছেন। আমাদের দেশে প্রধানত ভাবা হচ্ছে টিভিকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা না-করার ভালমন্দ নিয়ে। এ ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। রাজীব টিভিতে নিজেকে দেখাতে পছন্দ করতেন, ভিপি করেন না। তাতে ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের যে সাংস্কৃতিক সংকটের সামনে এনে ফেলেছে তা মিটবে না। পুঁজির সমর্থন ছাড়া ভারতীয় টিভি কি এক দিনও চলবে? আর, যদি তাই হয়, তাহলে ভারতীয় টিভিকে সরকারি অধীনতা থেকে মুক্তি দেবার অর্থ ত দাঁড়ায় তাকে পুঁজির গভীরতর অধীনতার দিকে ঠেলে দেয়া। প্রসার ভারতী বিলের উদ্দেশ্য কী? তা কি টিভি জনিত সাংস্কৃতিক সংকট মেটানোর কোনো আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নাকি তার ফলে টিভি সংস্কারমুক্ত হবে ও সেই সাংস্কৃতিক সংকটকে গভীরতর করবে? পরন্তু, আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা এত বেশি যে তাদের কাছে পণ্য ধনতন্ত্র দ্রুততম পৌঁছতে পারে একমাত্র টিভি বা ভিসিআরের মধ্য দিয়ে। ইয়োরোপে পণ্য ধনতন্ত্র নিজের জিনিশ বিক্রি করার জন্যে জনসাধারণকে সাক্ষর করে তুলেছিল। এখন ত ভারতীয় পুঁজিও আর শুধুই ভারতীয় নয়, সব পুঁজিই আন্তর্জাতিক পুঁজি। সেই পুঁজির ভারতীয় সক্রিয়তার ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতবাসীকে সাক্ষর করে তোলার জন্যে অপেক্ষা করার মত সময় পুঁজির আর নেই। সুতরাং সাক্ষরতার কর্মসূচির বদলে ইলেকট্রনিক কর্মসূচি অনেক বেশি সাহায্য করবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন টিভি আরো বেশি সাহায্য করবে।

আমাদের দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা টিভি দিয়ে রাষ্ট্র ও পুঁজির দ্বন্দ্ব এখনো প্রকাশ্য হয়ে পড়ে নি। কিন্তু মনে হয়, আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যেই তা ফেটে বেরবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রাথমিক বিস্ফোরণের সুযোগ পুঁজি ও রাষ্ট্র সমানভাবে নিয়েছিল। পুঁজি যেমন টাকা ঢেলে ভারতীয় টিভিকে খুব কম সময়ের মধ্যে লায়েক করে তুলেছে, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিশেবে রাজীব গান্ধী সেই নতুন লায়েক মাধ্যমকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করেছেন। দূরদর্শনের নাম তাই হয়ে গেল রাজীবদর্শন। রাজীব টিভিকে একটা রাজনৈতিক বিষয় করে তুলেছেন। পরবর্তী সরকার রাজনৈতিক ভাবে তার সমাধান করছেন। কিন্তু রাজীব টিভিকে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও করে তুলেছিলেন—পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে। নতুন সরকার কি সে-বিষয়ে কিছু ভাবছেন? জানি না।

গ্লাসনস্তের কালচার

বাসব সরকার

কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বকীয় যেসব বৈশিষ্ট্য অন্যদের সঙ্গে আপাতগ্রাহ্য নানা মিল সত্বেও তার স্বাতন্ত্র্যের মর্মবস্তুটিকে প্রকট করে তোলে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে তাকেই বলা হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ইতিহাসে, ভূগোলে সেই দেশ বা সমাজের অবস্থান যেখানে এবং যেমনই হোক না কেন, তার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা বিশেষ গড়ন থাকবেই। শিল্পোন্নত পশ্চিম দুনিয়ায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গা গড়ার কাজ বাকি দুনিয়ার চেয়ে অনেক আগে শুরু হয়েছিল। তুলনায় তৃতীয় দুনিয়ার সেই পর্ব বিগত তিন বা চার দশক ধরে চলেছে। সুতরাং রাজনৈতিক বিচারে উন্নত পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে বিকাশমান তৃতীয় দুনিয়ার সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু উন্নত দেশগুলিও যেহেতু শিল্পায়নের পর্বে নানা ভাবে, নানা সময়ে পৌঁছেছে তাই তাদের নিজেদের মধ্যেও আপেক্ষিক তারতম্য রয়ে গেছে। যেমন শিল্প বিপ্লব ও বুর্জোয়া বিকাশের ধারা সারা দুনিয়ার মধ্যে বৃটেনে সবার আগে সুরু হয়েছিল বলে ইউরোপের অন্যসব দেশের জীবনচর্যার সঙ্গে বৃটেনের মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। তার সমাজ ও সংস্কৃতিতে, বিশ্বাস ও আচার-আচরণে দেখেশুনে ধীরে চলার নীতি, একটা আপোষ প্রবণতা, সংস্কার-মুখীনতা সহজাত জীবনবোধের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। চলতি কথায় তাকেই বলা হয় ইংরাজদের মানসিক 'রক্ষণশীলতা'।

অন্যদিকে ফরাসী, জার্মান, সুইস, ইতালীয় কিম্বা স্পেনীয়দের ইংরাজদের সঙ্গে কয়েক শ' বছরের লেনদেনের বহুতর সম্পর্কে এবং একই পশ্চিমী সভ্যতার শরিক হিসাবে নানা মিল থাকা সত্বেও এই মানসিক 'রক্ষণশীলতা' তাদের উপর কোন বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে নি। কারণ এই সব দেশের জাতীয় বিকাশের ধারা এমন কিছু ঘটনা কিম্বা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এমন এক বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে যে বিশ শতকের শেষ দশকেও তাদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যাচ্ছেনা। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা থেকেই বিষয়টি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। পণ্ডিতরা মনে করেন ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের সমাজ জীবনে যে মূল ভেদরেখাটি প্রকট করে তুলে-

ছিল, দু'শ বছর পরে আজো একটা historic dissensus রূপে তার জের চলেছে। ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানে তার জবরদস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৭৮৯ সালের পারীর সাঁ কুলোৎ ও অভিজাতদের যে সব বংশ-ধরদের হদিশ ১৯৮৯ সালে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া যায়, এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে কোন কাজ করতে তারা সরাসরি অস্বীকৃত হয়েছে। তার অর্থ মোটেই এই নয়, যে সেই সাঁ কুলোৎদের বর্তমান প্রজন্ম এখন সুযোগ পেলে থার্মি-ডরের বদলা নিতে বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলবে কিম্বা তখনকার অভিজাতদের বর্তমান উত্তর পুরুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় মরীয়া হয়ে পথে নামবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে, বিপ্লব ফরাসী সমাজের মর্মমূলে এমন এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, দুশো বছরের অগণিত পরিবর্তনেও তার নিরাময় ঘটে নি। অথচ ইংল্যাণ্ডে সতেরো শতকের বিপ্লবে যে জনগণ রাজা প্রথম চার্লসের মাথা কেটেছিল, দেড়শ বছর পরে তাদের সেই কীর্তি ফরাসী সাঁ কুলোৎদের একই কাজের প্রেরণা দিলেও, পরবর্তী প্রজন্মের ইংরাজরা তেমন ভূমিকা গ্রহণ করার আর কোন তাগিদ খুঁজে পায় নি।

ইতিহাসের এইসব সুপরিচিত ঘটনা উল্লেখ করা হলো শুধু এই জন্য যে জাতির চেতনা ও চিন্তার এমন কিছু উপাদান থাকে যা তাদের যুগের পর যুগ বস্তুগত পরিবেশে বিপুল পরিবর্তনের জন্য নানা প্রবণতার দিকে আকৃষ্ট করলেও মূল কয়েকটি জায়গায় অপরিবর্তিত থেকে যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির তত্ত্ববিদরা মোটামুটি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যেত সোভিয়েত ও চীন উভয়েই মার্কসবাদ গ্রহণ করলেও, চীনে তার যে বিশেষ পরিশীলিত রূপ দেখা গেছে সোভিয়েতে তেমনটি ঘটেনি। তখন Sinification of Marxism কথাটি বিশেষভাবে চালু হয়েছিল। যত-দূর মনে পড়ে অধ্যাপক জোসেফ নীড্‌হাম চীনসভ্যতা নিয়ে যে বিরাট গবেষণা গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই এই মত প্রকাশ করা হতো। ষাটের দশকের শেষ থেকে চীনে প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব অবশ্য এই ধারণা দীর্ঘদিন বজায় রাখতে দেয় নি। তৎসত্ত্বেও তত্ত্বে ও বাস্তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা পণ্ডিতরা উল্লেখ করে থাকেন। আরেকটা সাম্প্রতিক উদাহরণ এই বক্তব্যের সপক্ষে দেওয়া যেতে পারে।

ইউরোপে সুইজারল্যাণ্ডের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দেশ বলে তার নাম বার বার উচ্চারিত হয়। অথচ এই দেশেও জাতীয় আইন

CENTRAL LIBRARY

সভার নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকার মাত্র দু'দশক আগে স্বীকার করা হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলিতে, যাদের সুইস যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বলা হয়, নারীর ভোটাধিকার সর্বত্রস্বীকৃত হয় নি। এই বছরের গোড়ায় তেমনই কয়েকটি ক্যান্টনে সরকারীভাবে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আইনের খসড়া পেশ করা হলে, পুরুষ-প্রধান আইনসভা তাদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় কিম্বা চিরায়ত বিশ্বাসের বশে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। সুইস সমাজে এই male domination আজো রয়ে গেছে। আধুনিকতা, একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্কতা তাদের রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনোভাবে বদল ঘটাতে পারে নি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির এটি হলো এক বিশেষ রূপ। সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থগুলিতে নানা দেশের মানুষের জাতীয় চরিত্র নিয়ে যে সব কাহিনী শুনিয়েছেন, সেই সব দেশের মানুষদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তারই কমবেশি ছাপ পড়েছে। আলি সাহেবের গ্রন্থাবলীর পাঠকরা নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্যকরেছেন।

সমাজতন্ত্রের বিশেষতঃ সোভিয়েতদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে এইপেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের বাজারে আলোচনা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে এই জন্য যে ১৯৮৬ সাল থেকে লব্ধ সমাপ্ত আঠাশতম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের ধারণা নিয়ে এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার চলেছে সেখানে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি দূর করার নামে "বেবি উইথ্ দি বাথ ওয়াটার" সবটাই ফেলে দেবার প্রশ্ন উঠেছে। বস্তুত বিশ শতকে সমাজতন্ত্র নামে একটা মতাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামে একটা সমাজ কেন গড়ে উঠেছিল সোভিয়েতের মতো অনগ্রসর দেশে সেই প্রশ্নই বারবার ফিরে আসছে। সোভিয়েতের বহুজাতিক দেশের বাসিন্দারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ও বজায় রাখার পক্ষে অচল ও অক্ষম, এই সব তত্ত্ব কথায় সেটাই প্রকাশ পায়। সরাসরি সোভিয়েতে বহু লেখক, সাংবাদিক, টীকাকার ও পণ্ডিতরা এই ব্যবস্থার সমগ্র জীবনকালকে 'অপচিত সত্তর বছর' নামে ধিক্কৃত করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন। একটা দেশের মানুষ নিছক আবেগে, উত্তেজনায়, তাৎক্ষণিক প্রেরণায় তার নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিটুকু নিজেই বাতিল করে দেবে, সেটা সহজে বিশ্বাস-যোগ্য নয়। কিন্তু যদি তাই ঘটে এবং বর্তমান জমানা নিজের ঐতিহ্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যদি তেমনই কোন মতলবে কাজ করতে উদ্যত হয়, তাহলে বিষয়টি নির্মোহ দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রথমেই বলা যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতা প্রভৃতি যে সব ধারণাগুলি বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রায় সহজাত উপাদান রূপে দীর্ঘকাল বিবর্তিত হয়েছে এবং যার

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের ধারণা, বিপ্লব-পূর্ব রুশ সমাজে সেগুলি হয় ছিল না, নয়তো অপরিণত অবস্থায় ছিল। সুতরাং অক্টোবর মহাবিপ্লবের সাফল্য পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করার দিকে অগ্রসর হলেও, অপরিণত পুঁজিবাদের অপরিণত গণতান্ত্রিক উপাদান গুলি সেই অবস্থায় সামাজিক জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের স্থায়ী অংশে পরিণত হতে পারেনি। সেই দুর্বল ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাকাপোক্ত কাঠামো কোনদিন তেমনভাবে দাঁড়াতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় সুদীর্ঘকাল বাস করার জন্য এবং ইউরোপীয় রাজনীতির মূল ধারা থেকে জারতন্ত্র দেশের মানুষকে কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য, গণতান্ত্রিক চেতনা ও তার অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ঘাটতি রুশ সমাজে রয়েই গেছে। শিল্পায়ন ব্যাপক হলে, সার্বিক শিক্ষার বিকাশ কিছুটা ঘটলে সমাজ মানসে যে স্বাধিকার বোধ জন্মায় প্রাক্ বিপ্লব রুশ দেশে তার তেমন কোন বিশেষ সুযোগ ছিল না।

তৃতীয়তঃ পণ্ডিতরা মনে করেন রুশদেশের বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করার বুর্জোয়া মানসিকতা ও তাগিদ কার্যতঃ অনুপস্থিত ছিল। অনুন্নত, দরিদ্র রুশী জনগণ তাদের দুর্দশাকে ভাগ্য-বিড়ম্বনা বলে মেনে নিতো কিম্বা অবস্থা দুঃসহ মনে হলে যৌথ প্রতিকারের পথ খুঁজতে চেষ্টা করতো। ফলে রুশী সমাজে এক ধরনের Collective consciousness বদ্ধমূল হয়েছিল। অর্থনৈতিক জীবনচর্যার এই বাস্তবতা যে তার সমাজ চেতনাকে প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

চতুর্থতঃ গণতান্ত্রিকতার পরিচিত ধারণা সমাজে ব্যক্তির নিজস্ব, সর্বোপরি ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জন্মলগ্ন থেকেই নিজেকে অমোঘ, অপরিবর্তনীয় বলে দাবী করে এমন একটা মানসিক পরিমণ্ডল গড়েছে যে, চলতি ব্যবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণী যে বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে একদা নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল, রুশ দেশে তথা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতে সেই ধরণের উদ্যোগ নেওয়ার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না। বলা যায় বিপ্লবে সত্তর বছর অপচিত হওয়ার প্রতিকারে যে সব মত ও তত্ত্বচিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের সংস্কার করার নামে তারা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়।

উন্নত জীবন মানের জন্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় অর্থনীতির ক্ষমতা অনুসারে পাওয়ার জন্য এবং এই লক্ষ্যগুলি সার্থক করার জন্য বর্তমান সোভিয়েত প্রজন্ম যদি তাদের সমাজ ব্যবস্থার গুণাগুণ ও উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাকে বাতিল করতে চায় তাহলে.অন্ততঃ একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে সেদেশের একদলীয় ব্যবস্থা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকার হারিয়েছে। কিন্তু তারই সঙ্গে এই প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক হয় যে, অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে তত্ত্বগত ভাবে সমস্ত মানুষের সমাজে যা কিছু লভ্য পাওয়ার অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও সকলের জীবন সমান উন্নত কিম্বা সম মানের হয়নি কেন, তাহলে বুঝতে হয় গলদটা অন্য কোথাও রয়েছে। বাজারী অর্থনীতি, প্রতিযোগিতাকে নিঃসন্দেহে শিরোধার্য করা যাবে যদি দেখা যায় যে সার্বিক কল্যাণ সাধনের দিকেই তার গতিমুখ রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপীয় যে দেশে সোস্যাল ডেমোক্রেসী বেশ দীর্ঘকাল জাঁকিয়ে রয়েছে, সেখানে ডেমোক্রেসীর কোন ভাষা বিদ্যমান? তা কি প্রকৃত অর্থেই সোস্যাল? অন্ততঃ পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশ সোস্যাল ডেমোক্রেসীর লালন-পালনকারী হলেও সেখানে শোনা যায় না যে, সোস্যাল ডেমোক্রেসীর কোন বিকল্প নেই।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায় তাই লক্ষ্য করা দরকার রুশ বা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশে জনজীবনে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কারণ সমাজতন্ত্র এযাবৎ যা ছিল তা যদি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে, তাহলে অন্যদের পক্ষে তাকে নিন্দা না করার কিছু নেই। গোর্বাচেভ জমানায় সমাজতন্ত্রকে সরাসরি "নবায়ন" ও "দ্বিতীয় বিপ্লব" সাপেক্ষ বলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে একেবারে বাতিল করে দেওয়ার যে মনোভাব প্রকাশ করেছে, সেখানে আর বলার মতো কিছুই নেই। সমাজতন্ত্র যেমন জোর করে আনা যায় না, তার বিকাশের একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল থাকে, তেমনই সমাজতন্ত্রের বিকাশধারা ও পদ্ধতির মধ্যে এমন কোন উপাদান আছে যা change resistant অন্ততঃ তার গড়ে ওঠা কাঠামো থেকে এই ব্যবস্থা বহুদূরে সরে যেতে পারে না। ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক ব্যবস্থা, বাজারী অর্থনীতি হলো পুঁজিবাদের সহজাত। তাকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মিশেল দিয়ে সমাজতন্ত্রের change resistant বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থেকে যাবেই। সমাজতন্ত্রে বাজারী অর্থনীতি আর ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক ব্যবস্থায় বাজারী অর্থনীতি, দুটো একই জিনিস বলে মেনে নেওয়ায় অসুবিধা আছে।

রুশ সমাজের বিকাশ ধারায় বাজারী অর্থনীতির পশ্চিম ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য-গুলি প্রাক্-বিপ্লব কালে গড়ে উঠলেও তার বয়স বেশি নয়। বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বাজারী অর্থনীতি, প্রতিযোগিতা ও তাদের রাজনৈতিক অনুষঙ্গ দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় যে ভাবে গড়ে উঠেছে রুশ দেশে সেই সুযোগ ছিল না। অথচ পুঁজিবাদের দুর্বলতম ঘাঁটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধাক্কা এসে লাগে সবার আগে। সেই অবস্থায় নিপীড়িত মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তার গণতান্ত্রিকতা, মূল্যবোধের গড়ন যে কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী হবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গোর্বাচেভ থেকে সুরু করে তাঁর অনুগামীরা সবাই যে মাপকাঠিতে সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন করছেন, তার আদল গড়ে উঠেছে পশ্চিম দুনিয়ার বুর্জোয়া দেশে। একটা ভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা জীবনচর্যার রাজনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে তারই বিষম প্রতি-পক্ষ আরেকটি সমাজব্যবস্থার গুণাগুণের বস্তুনিষ্ঠ কোন মূল্যায়ণ কি সম্ভব ?

অথচ পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের জোয়ারে সেটাই ঘটে চলেছে সমাজতন্ত্রে। সমাজতন্ত্র কি এবং কি নিয়ে, গোর্বাচেভ সেটা নিয়েও পরোক্ষে প্রশ্ন তুলেছেন। গণতন্ত্র কি আর কি নিয়ে সেই প্রশ্ন একদা উঠেছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কৈশোরে ও যৌবনে। যদি ধরে নেওয়া যায় তার একটা মোটামুটি মীমাংসা ঘটে গেছে পশ্চিম দুনিয়ায় তাহলে একথা কি বলা যাবে freedom and democracy for the ninety nine percent পশ্চিম দুনিয়ার কোথাও প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, বৃটেন ও ফ্রান্সে, মার্কিন দেশে কি সমজাতীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রয়েছে ? যদি তা না থাকে, যদি গণতন্ত্রের দেশ ও কালগত কিম্বা বিকাশের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকে তাহলে কোন গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে সোভিয়েত ব্যবস্থা বিচার্য ? নিউ ইয়র্কের হারলেম, শিকাগো, ডেট্রয়টের শহরতলী যে গণতন্ত্রের কথা বলে সেটাই কি সমাজতন্ত্রের ভূত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের মাপকাঠি হবে ? গোর্বাচেভ ও তাঁর অনুগামী দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ।

কয়েক মাস আগে মার্কিন র‍্যাডিকাল উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ মন্তব্য করেছেন আজ উনিশ শতকের পুঁজিবাদ অচল, দুনিয়ার কোথাও তার ছিটে-ফোঁটাও নেই। আজকের পুঁজিবাদেও একটা command system কাজ করে, সেখানেও পরোক্ষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দরকার হয়। সমাজতন্ত্রকে বিচার করতে হলে সেকথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। হুকুমটা কার, কোন শ্রেণীপোষিত

ব্যক্তির, কোন একনায়কের, কোন শ্রেণীশোষণহীন ব্যবস্থার রাষ্ট্রনেতার অথবা কোন শ্রেণীর, সেই দিকটা খেয়াল না করলে সমগ্র ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ভ্রান্ত, এক পেশে হয়ে পড়তে বাধ্য।

সোভিয়েতে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র ছিলনা। এ নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। একটা স্বৈরতন্ত্রী দেশে বিপ্লবোত্তর কালে যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে লেনিন চেয়েছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষমতার লড়াই যে ভাবে চলে তাতে ট্রট্স্কি, বুখারিন থেকে সুরু করে অন্যরা সবাই ক্ষমতা দখল ও কায়েম রাখতে জোট বেঁধেছেন, ভেঙ্গেছেন। স্তালিন কৌশলে নানা গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিয়েছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কোন দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে এর চেয়ে ভিন্নতর কোন কাজ সফল নেতারা করেন বলে শোনা যায় না। কেবল তফাৎ এই স্তালিন দলের মধ্যে ক্ষমতা নিজের মনোমতো মানুষদের নিয়ে নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তারপর শত্রু নির্মূল করতে তার অপব্যবহার করেছেন। সেটাই হলো রুশ সমাজের স্বৈরতন্ত্রী ঐতিহ্যের এক চরম প্রকাশ যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলেও বদলায় নি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে liquidate করার tradition দুনিয়ার অন্য দেশেও ছিল এবং আছে। সেটা নিছক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। চীনের যে ইতিহাস জানা আছে সেখানে ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে liquidate করার ঐতিহ্য না থাকায় তেমনটি ঘটে নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সতেরো শতকের প্রথম বিপ্লবের নায়ক ক্রমওয়েল, ফরাসী বিপ্লবের নায়কদের জীবনে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজয়ের পর ভিন্নতর কোন ভাগ্য বিতাড়িত নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষমান ছিল কি? আধুনিক গণতন্ত্রে অবশ্য liquidation এর মাত্রা বদলেছে। দৈহিক ভাবে না করে সেখানে রাজনৈতিকভাবে liquidation করা হয়। প্রতিপক্ষকে গোর্বাচেভ রক্ষণশীল আখ্যা দেওয়ার ঢালোয়া ব্যবস্থা করে সেই গণতান্ত্রিক পথ নিয়েছেন।

আরো একটি কথা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের প্রথম পর্বে কতো মানুষের রক্তের বিনিময়ে আজকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মার্জিত রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব কি সমাজতন্ত্রের শৈশব ও কৈশোরের মূল্যায়নের সময় করা হয়? সমাজতন্ত্র একটা নজিরবিহীন ব্যবস্থা বলে, রুশ সমাজের স্বৈরতন্ত্রী পটভূমিও চরম প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপের যে মূল্য দিতে হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা দিতে না হলেই ভালো হতো। ব্যক্তি

CENTRAL LIBRARY

মানুষ স্তালিনের স্বভাব ও প্রবৃত্তিও নিশ্চয়ই সেই মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র রুশ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসানুগ বিচার না করলে তার সম্পর্কে যে কোন মূল্যায়নই একপেশে হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রের সত্তর বছর অপচিত হয়েছে কিম্বা হয়নি সে বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত গোর্বাচেভের নীতি ও বিশ্লেষণ অনুসারে তাই করা সম্ভব নয়।

ক্ষমতার একটা প্রবণতাই হলো কেন্দ্রীভবন। কোন দেশ বা সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, কিম্বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অপরিমেয় ক্ষমতার এছাড়া ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা হয় না। সোভিয়েতে স্তালিন থেকে গোর্বাচেভ পর্ব পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নেই। আটাশতম পার্টি কংগ্রেসে গোর্বাচেভ যে পলিট ব্যুরো গঠন করিয়েছেন, সরকারের গড়ন যেমন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানেও সমস্ত ক্ষমতার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কেবল গোর্বাচেভের হাতেই থাকবে। পেরেস্ত্রৈকা কিম্বা গ্লাসনস্ত সেই প্রবণতার কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটায় নি। সেই চরিত্র পূর্ব ও পশ্চিম নির্বিশেষে সর্বত্রই দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও অপব্যবহারের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অপদার্থতা নিয়ে শোরগোল তোলা শুধু অর্থহীন নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করা হলে খুব দোষাবহ হবে না। বস্তুতঃ তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে আশমান জমীন ফারাক সব সমাজ ব্যবস্থায়, সব মহাদেশেই দেখা যাবে। জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তার রূপ ও পদ্ধতির চূড়ান্ত সীমা রচনা করে। তাই জাতীয় জীবনের ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ ভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন আলোচনা করা সম্ভব হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের চেয়ে কাম্য কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেই বিচারের ফয়সালা কি এইভাবে হবে যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চেয়ে শ্রেয়। পুঁজিবাদের বাজারী অর্থনীতিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো অবশ্যই থাকে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কোন বুর্জোয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ্‌রাও দাবি করেন না। সমাজতন্ত্র অন্ততঃ মোটামুটি ব্যাপকার্থে আর্থ-সামাজিক জীবনে গণতন্ত্র আনতে সক্ষম। সেখানে তারতম্য যদি কিছু থাকে, ধরা যাক্ আছে, তবু সেটি সংশোধনযোগ্য। এই শ্রেয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক মূল্য "বিদ্যমান সমাজতন্ত্রে" দিতে হয়েছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ঘাটতি সহ্য করে। কিন্তু যেখানে

রাজনৈতিক গণতন্ত্রই কেবল আছে, যেমন আমাদের দেশে, সেখানে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এখনও কষ্টকল্পনা হয়ে রয়েছে।

মার্কস থেকে লেনিন এমন কি স্তালিন থেকে চেরনেনকো পর্যন্ত সবাই সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু আরো সমৃদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাঁরা কেউ দাবি করেন নি সমাজতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। স্তালিন সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই ডাক দিতে পেরেছিলেন ধুলাবলুন্ঠিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে কমিউনিস্টদের। সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটি জেনেও তিনি এই ডাক দিয়েছিলেন। অবশ্য সেটি কতোটা ছিল কপটচারী স্তালিনের ক্ষমতা গ্রাস করার মানসিকতা আর কতোটাই বা আন্তরিক সাড়া তা নিয়ে মত বিরোধের অবকাশ রয়েছে। বিপ্লব সংগঠিত করার দিন থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত স্তালিন গণতন্ত্র বিরোধিতা করেন নি। বলা বাহুল্য এই গণতন্ত্র পশ্চিম দুনিয়ার গণতন্ত্রের থেকে মূলে তফাৎ। স্তালিনের স্বৈরাচারকে বিন্দুমাত্র আড়াল করার চেষ্টা না করেও বলা যায় "স্তালিনীয় ব্যবস্থাকে" যথেষ্ট ধিক্কার জানিয়েও স্বীকার করতে হবে আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্র কায়েম করার উপর বেশি জোর দিয়ে তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবমূল্যায়ন ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। স্তালিনের কাছে প্রথমটি মুখ্য আর দ্বিতীয়টি গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গোর্বাচেভ রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই কায়েম করতে চান, পশ্চিম দুনিয়ায় যেমনটি আছে। তার জন্য দরকার হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সব রকমের প্রতিকূল শক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশেও আপত্তি নেই। এই বক্তব্যের নির্যাস হলো সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের কাছে বাছাই করার প্রশ্ন একটাই। তার শ্রেয় ও প্রেয়বোধকে কোন মাপকাঠিতে বিচার করা হবে। ব্যক্তিত্বের অহঙ্কারে উজ্জীবিত মানুষ যদি রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিরঙ্কুশ রাখার সপক্ষেই মত দেয়, তাহলে অবশ্যই সমাজতন্ত্রের "অপচিত সত্তর বছরের" কথা মানতে হবে। আর সেখানে সংশয়, প্রশ্ন থাকলে অপেক্ষা করতে হবে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। গোর্বাচেভীয় এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিশ খাবে না। একের স্বরাট অন্যের পক্ষে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার দ্বন্দ্ব আধুনিক সমাজ জীবনকে বিশেষভাবে সমস্যাসঙ্কুল করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণায় চিরায়ত কিছু ধারণা ও মূল্যবোধ যুক্ত থাকলেও, সমাজ বিকাশের ধারায় যখন ব্যবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে তখন ইতিহাস, ভূগোল, এথনিক বিচার বিবেচনা ছাড়াও সমাজ পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অন্ততঃ কিছুটা বদলায়। সোভিয়েতে সেই ব্যবস্থার আয়োজন চলে ছিল। কিন্তু প্রতিকূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা বিপ্লবের উত্তরাধিকারকে আঁতুড় ঘরে মারতে চেষ্টা করে ছিল, সেটা সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশকেও ব্যাহত করে। গোর্বাচেভের গ্লাসনস্ত অনেক কথা খোলাখুলি বললেও এইদিকে বিস্ময়কর ভাবে নীরব। বরং স্তালিন ও সমাজতান্ত্রিকতা এক সূত্রে জড়িয়ে, স্তালিন পর্বের কিছুটা নিবার্য এবং কিছুটা অনিবার্য অনাচার, অত্যাচারকে একাকার করে এমন এক ভয়ঙ্কর চিত্র রচনা করেছে যেন মনে হয় সমাজতন্ত্রই আসলে দুঃসহ। পরিবর্তন, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, মানুষের অধিকার শব্দগুলিকেও এমন ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে যেন সমাজতন্ত্রে এদের কথা কোনদিন কেউ ভাবে নি অথবা বলে নি। বুর্জোয়া ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা একটা absolute idea, তার কোন আপেক্ষিক অবস্থান, চরিত্র নেই এই ধরণের একটা মত গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দুনিয়ার কোন দেশে কোন কালে কোন ধারণা বা তত্ত্বই absolute নয়। সমাজতন্ত্রও নয়। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে সমাজতন্ত্রের ধারণা আপেক্ষিক হলেও সেটা বদলাবে না। সমাজতন্ত্র কালানুগ থাকবার জন্য বদলাবে তার রূপ, রীতি ও প্রকরণ। কিন্তু সেটা সমাজতন্ত্র বাতিলকরে এক ধরণের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠন করে বেঁচে থাকবে, সেটা মানা যায় না। কারণ সেটা প্রাক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রকমফের মাত্র। পুঁজিবাদের সহনীয় রূপ প্রতিষ্ঠার আয়োজন মাত্র। সমাজতন্ত্রে ভুল, ভ্রান্তি ঘটেছে বলে পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়া যাবে না।

ব্যক্তির, কোন একনায়কের, কোন শ্রেণীশোষণহীন ব্যবস্থার রাষ্ট্রনেতার অথবা কোন শ্রেণীর, সেই দিকটা খেয়াল না করলে সমগ্র ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ভ্রান্ত, এক পেশে হয়ে পড়তে বাধ্য।

সোভিয়েতে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র ছিলনা। এ নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। একটা স্বৈরতন্ত্রী দেশে বিপ্লবোত্তর কালে যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে লেনিন চেয়েছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষমতার লড়াই যে ভাবে চলে তাতে ট্রট্স্কি, বুখারিন থেকে সুরু করে অন্যরা সবাই ক্ষমতা দখল ও কায়েম রাখতে জোট বেঁধেছেন, ভেঙ্গেছেন। স্তালিন কৌশলে নানা গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিয়েছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কোন দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে এর চেয়ে ভিন্নতর কোন কাজ সফল নেতারা করেন বলে শোনা যায় না। কেবল তফাৎ এই স্তালিন দলের মধ্যে ক্ষমতা নিজের মনোমতো মানুষদের নিয়ে নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তারপর শত্রু নির্মূল করতে তার অপব্যবহার করেছেন। সেটাই হলো রুশ সমাজের স্বৈরতন্ত্রী ঐতিহ্যের এক চরম প্রকাশ যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলেও বদলায় নি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে liquidate করার tradition দুনিয়ার অন্য দেশেও ছিল এবং আছে। সেটা নিছক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। চীনের যে ইতিহাস জানা আছে সেখানে ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে liquidate করার ঐতিহ্য না থাকায় তেমনটি ঘটে নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সতেরো শতকের প্রথম বিপ্লবের নায়ক ক্রমওয়েল, ফরাসী বিপ্লবের নায়কদের জীবনে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজয়ের পর ভিন্নতর কোন ভাগ্য বিতাড়িত নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষমান ছিল কি? আধুনিক গণতন্ত্রে অবশ্য liquidation এর মাত্রা বদলেছে। দৈহিক ভাবে না করে সেখানে রাজনৈতিকভাবে liquidation করা হয়। প্রতিপক্ষকে গোঁড়া রক্ষণশীল আখ্যা দেওয়ার চালোয়া ব্যবস্থা করে সেই গণতান্ত্রিক পথ নিয়েছেন।

আরো একটি কথা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের প্রথম পর্বে কতো মানুষের রক্তের বিনিময়ে আজকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মার্জিত রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব কি সমাজতন্ত্রের শৈশব ও কৈশোরের মূল্যায়নের সময় করা হয়? সমাজতন্ত্র একটা নজিরবিহীন ব্যবস্থা বলে, রুশ সমাজের স্বৈরতন্ত্রী পটভূমিও চরম প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপের যে মূল্য দিতে হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা দিতে না হলেই ভালো হতো। ব্যক্তি

CENTRAL LIBRARY

মানুষ স্তালিনের স্বভাব ও প্রবৃত্তিও নিশ্চয়ই সেই মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র রুশ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসানুগ বিচার না করলে তার সম্পর্কে যে কোন মূল্যায়নই একপেশে হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রের সত্তর বছর অপচিত হয়েছে কিম্বা হয়নি সে বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত গোর্বাচেভের নীতি ও বিশ্লেষণ অনুসারে তাই করা সম্ভব নয়।

ক্ষমতার একটা প্রবণতাই হলো কেন্দ্রীভবন। কোন দেশ বা সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, কিম্বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অপরিমেয় ক্ষমতার এছাড়া ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা হয় না। সোভিয়েতে স্তালিন থেকে গোর্বাচেভ পর্ব পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নেই। আটাশতম পার্টি কংগ্রেসে গোর্বাচেভ যে পলিট ব্যুরো গঠন করিয়েছেন, সরকারের গড়ন যেমন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানেও সমস্ত ক্ষমতার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কেবল গোর্বাচেভের হাতেই থাকবে। পেরেস্ত্রৈকা কিম্বা গ্লাসনস্ত সেই প্রবণতার কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটায় নি। সেই চরিত্র পূর্ব ও পশ্চিম নির্বিশেষে সর্বত্রই দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও অপব্যবহারের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অপদার্থতা নিয়ে শোরগোল তোলা শুধু অর্থহীন নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করা হলে খুব দোষাবহ হবে না। বস্তুতঃ তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে আশমান জমীন ফারাক সব সমাজ ব্যবস্থায়, সব মহাদেশেই দেখা যাবে। জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তার রূপ ও পদ্ধতির চূড়ান্ত সীমা রচনা করে। তাই জাতীয় জীবনের ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ ভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন আলোচনা করা সম্ভব হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের চেয়ে কাম্য কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেই বিচারের কষ্টিপাথর কি এইভাবে হবে যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চেয়ে শ্রেয়। পুঁজিবাদের বাজারী অর্থনীতিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো অবশ্যই থাকে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কোন বুর্জোয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ্‌রাও দাবি করেন না। সমাজতন্ত্র অন্ততঃ মোটামুটি ব্যাপকার্থে আর্থ সামাজিক জীবনে গণতন্ত্র আনতে সক্ষম। সেখানে তারতম্য যদি কিছু থাকে, ধরা যাক্ আছে, তবু সেটি সংশোধনযোগ্য। এই শ্রেয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক মূল্য "বিদ্যমান সমাজতন্ত্রে" দিতে হয়েছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ঘাটতি সহ্য করে। কিন্তু যেখানে

রাজনৈতিক গণতন্ত্রই কেবল আছে, যেমন আমাদের দেশে, সেখানে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এখনও কষ্টকল্পনা হয়ে রয়েছে।

মার্কস থেকে লেনিন এমন কি স্তালিন থেকে চেরনেনকো পর্যন্ত সবাই সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু আরো সমৃদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাঁরা কেউ দাবি করেন নি সমাজতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। স্তালিন সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই ডাক দিতে পেরেছিলেন ধুলাবলুণ্ঠিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে কমিউনিস্টদের। সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটি জেনেও তিনি এই ডাক দিয়েছিলেন। অবশ্য সেটি কতোটা ছিল কপটচারী স্তালিনের ক্ষমতা গ্রাস করার মানসিকতা আর কতোটাই বা আন্তরিক সাড়া তা নিয়ে মত বিরোধের অবকাশ রয়েছে। বিপ্লব সংগঠিত করার দিন থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত স্তালিন গণতন্ত্র বিরোধিতা করেন নি। বলা বাহুল্য এই গণতন্ত্র পশ্চিম দুনিয়ার গণতন্ত্রের থেকে মূলে তফাৎ। স্তালিনের স্বৈরাচারকে বিন্দুমাত্র আড়াল করার চেষ্টা না করেও বলা যায় "স্তালিনীয় ব্যবস্থাকে" যথেষ্ট ধিক্কার জানিয়েও স্বীকার করতে হবে আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্র কায়েম করার উপর বেশি জোর দিয়ে তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবমূল্যায়ন ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। স্তালিনের কাছে প্রথমটি মুখ্য আর দ্বিতীয়টি গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গোর্বাচেভ রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই কায়েম করতে চান, পশ্চিম দুনিয়ায় যেমনটি আছে। তার জন্য দরকার হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সব রকমের প্রতিকূল শক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশেও আপত্তি নেই। এই বক্তব্যের নির্যাস হলো সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের কাছে বাছাই করার প্রশ্ন একটাই। তার শ্রেয় ও প্রেয়বোধকে কোন মাপকাঠিতে বিচার করা হবে। ব্যক্তিত্বের অহঙ্কারে উজ্জীবিত মানুষ যদি রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিরঙ্কুশ রাখার সপক্ষেই মত দেয়, তাহলে অবশ্যই সমাজতন্ত্রের "অপচিত সত্তর বছরের" কথা মানতে হবে। আর সেখানে সংশয়, প্রশ্ন থাকলে অপেক্ষা করতে হবে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। গোর্বাচেভীয় এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিশ খাবে না। একের স্বরাট অন্যের পক্ষে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার দ্বন্দ্ব আধুনিক সমাজ জীবনকে বিশেষভাবে সমস্যাসঙ্কুল করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণার চিরায়ত কিছু ধারণা ও মূল্যবোধ যুক্ত থাকলেও, সমাজ বিকাশের ধারায় যখন ব্যবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে তখন ইতিহাস, ভূগোল, এথনিক বিচার বিবেচনা ছাড়াও সমাজ পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অন্ততঃ কিছুটা বদলায়। সোভিয়েতে সেই ব্যবস্থার আয়োজন চলে ছিল। কিন্তু প্রতিকূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা বিপ্লবের উত্তরাধিকারকে আঁতুড় ঘরে মারতে চেষ্টা করে ছিল, সেটা সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশকেও ব্যাহত করে। গোর্বাচেভের গ্লাসনস্ত অনেক কথা খোলাখুলি বললেও এইদিকে বিস্ময়কর ভাবে নীরব। বরং স্তালিন ও সমাজতান্ত্রিকতা এক সূত্রে জড়িয়ে, স্তালিন পর্বের কিছুটা নিবার্য এবং কিছুটা অনিবার্য অনাচার, অত্যাচারকে একাকার করে এমন এক ভয়ঙ্কর চিত্র রচনা করেছে যেন মনে হয় সমাজতন্ত্রই আসলে দুঃসহ। পরিবর্তন, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, মানুষের অধিকার শব্দগুলিকেও এমন ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে যেন সমাজতন্ত্রে এদের কথা কোনদিন কেউ ভাবে নি অথবা বলে নি। বুর্জোয়া ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা একটা absolute idea, তার কোন আপেক্ষিক অবস্থান, চরিত্র নেই এই ধরণের একটা মত গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দুনিয়ার কোন দেশে কোন কালে কোন ধারণা বা তত্ত্বই absolute নয়। সমাজতন্ত্রও নয়। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে সমাজতন্ত্রের ধারণা আপেক্ষিক হলেও সেটা বদলাবে না। সমাজতন্ত্র কালানুগ থাকবার জন্য বদলাবে তার রূপ, রীতি ও প্রকরণ। কিন্তু সেটা সমাজতন্ত্র বাতিলকরে এক ধরণের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠন করে বেঁচে থাকবে, সেটা মানা যায় না। কারণ সেটা প্রাক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রকমফের মাত্র। পুঁজিবাদের সহনীয় রূপ প্রতিষ্ঠার আয়োজন মাত্র। সমাজতন্ত্রে ভুল, ভ্রান্তি ঘটেছে বলে পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়া যাবে না।

CENTRAL LIBRARY

চারণ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

বিষয়সূচী

আধুনিকতম মানুষ বিদ্যাসাগর : ডঃ সুকুমার সেন

বিদ্যাসাগর : চরিত্রে, চেতনায় ও কৃতিত্বে : ডঃ আহমদ শরীফ

বিদ্যাসাগর : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের সংকেত, সমাজমানস ও বিদ্যাসাগর : ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র : ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র

ধর্ম ও দর্শন : অস্বীকারে অঙ্গীকারে বিদ্যাসাগর : মনোরঞ্জন বিশ্বাস

সমসাময়িকের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর : ডঃ অলোক রায়

বিদ্যাসাগর : শিক্ষাভাবনা ও সংস্কার : ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বিদ্যাসাগরের পত্রাবলীতে বিদ্যাসাগর : শিবাশিস দত্ত

বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা : বাসব সরকার

বিদ্যাসাগর জীবনপঞ্জী : সংকলন : ডঃ রেখা চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ :

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী :

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রচনার তালিকা : সংকলন : ডঃ রেখা চক্রবর্তী,
নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্যামলীনাথ বঙ্গভাষা সাহিত্য ও
সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা

With Best Compliments of :

Vijay Shree Ltd.

SHIBPUR ★ HOWRAH

A

WELL

WISHER

CENTRAL LIBRARY

'What's the one name that fits all wheels?

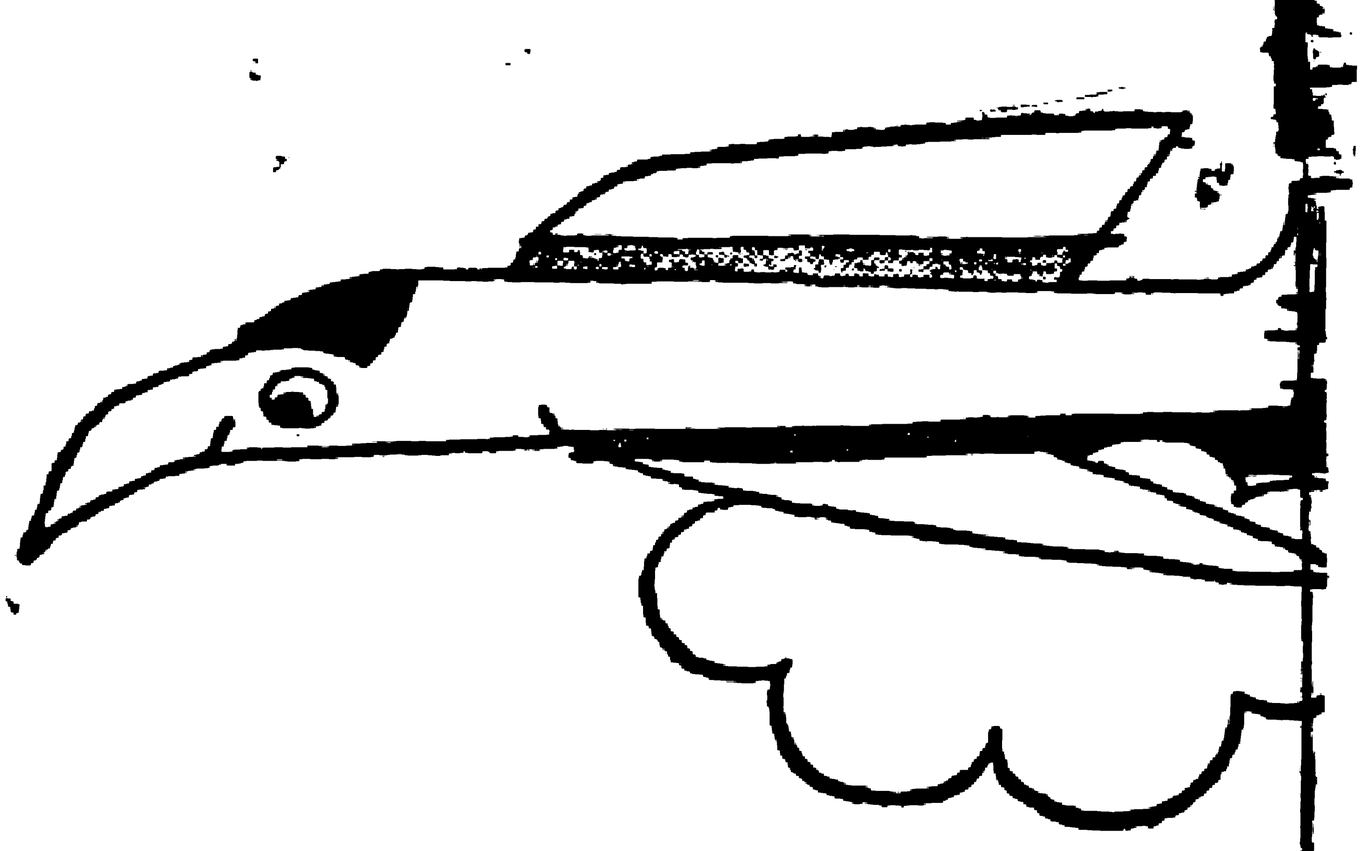

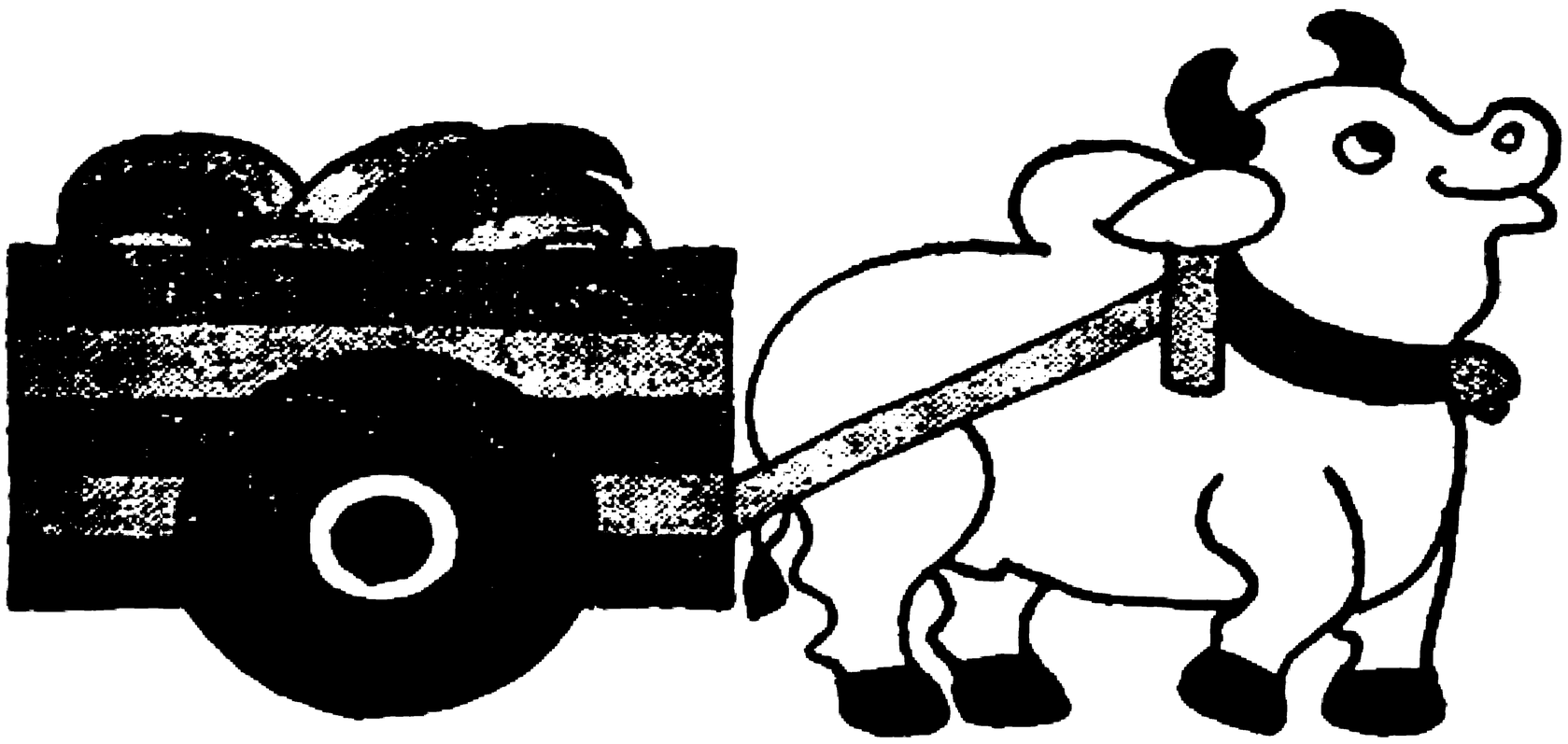

DUNLOP

DTC-01.3M3

CENTRAL LIBRARY

With Best Compliments of :

FAX : (91) (83) 287141
GRAM : PILECONS
TEL : 27-8348
27-6043
27-6980

PILE FOUNDATION CONSTRUCTIONS CO (I) PVT. LTD.

(P.F.C.C. GROUP OF COMPANIES)

Engineers, Consultants & Contractors

30, CHITTARANJAN AVENUE
Calcutta-700 012

S p e c i a l i s:t i n :-

R.C.C. Piles-Precast or Cast-in-Situ Driven or Bored,
Machine Foundations, Docks and Harbours, Jetties &
Wharfs, Soil Investigation-Field & Laboratory.

CENTRAL LIBRARY

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্টমানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ, এম টি, ইন্টার ন্যাশানাল। এসকটস। মিৎসুবিশি ট্রাকটরস্।

খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।

গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।

ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

: জেলা অফিস :

২৪-পরগণা (দক্ষিণ) : ১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮

" (উত্তর) : ডাকবাংলো মোড় বারাসাত

হুগলী : সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, পুরশুড়া/চুঁচুড়া

বর্ধমান : সদর ঘাট জি, টি, রোড, মেমারি, বর্ধমান ১, বি, সি, রোড,

বাঁকুড়া : লালবাজার, বাঁকুড়া, ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর

মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট) : সুভাষনগর, মেদিনীপুর

মেদিনীপুর (ইষ্ট) : পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া

বীরভূম : সিউড়ী

মালদা : মনস্কামনা রোড, মালদা

মুর্শিদাবাদ : ১৬, শহীদ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, বহরমপুর

জলপাইগুড়ি : 'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি

দার্জিলিং : বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি মাটিগাড়া

কুচবিহার : এন, এন, রোড, কোচবিহার/ দিনহাটা

পুরুলিয়া : নীলকুঠী ভাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া

নদীয়া : ১/১ এম, এম, ঘোষ ষ্ট্রীট, নদীয়া

With Best Compliments of :

Universal Marketing Corporation

-: Authorised Dealers :-

USHA TELEHOIST LIMITED

AND

K. G. KHOSLA COMPRESSORS LIMITED

-: Stockists :-

ASHOK LEYLAND SPARES

Address : Head Office :

2, KHETRA DAS LANE

Calcutta-700 012

Phone No. : 27-3221, 26-5356 & 26-9066

-: B r a n c h e s :-

RANIGUNJ ★ CUTTACK ★ JEYPORE ★ BARBIL

BRAJRAJNAGAR ★ JAMSHEDPUR ★ RAMGARH

★ PAKUR ★

With the Compliments of :

TATA STEEL

CENTRAL LIBRARY

With Best Compliments from :

M|S. CALCUTTA LAMINATING INDUSTRIES

30, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-700 012

PHONE : 279614, 262013, 269608, 269611
TELEX : O21—4009 CCED IN

: *With Best Compliments of :*

For Courtesy, Speed & Effiiciency
Come to

Hari Charan Service Station

Bharat Petroleum Corporation Dealers

B. T. ROAD * TALPUKUR
BARRACKPORE (24 Parganas)

Phone : BKP. 294 Resi : 226

MARUTI AUTHORISED SERVICE STATION

CENTRAL LIBRARY

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তের লেখা তিনটি অনন্য সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী ও মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ

কিলিমাঞ্জারোর দেশে—একপাশে কিনিয়া আধুনিক করনে সমাজ চেতনায় অবলুপ্ত রিফট উপত্যকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে বন্য প্রাণীর অভিন্নতা, আর একপাশে দক্ষিণ তাঞ্জানিয়া সনাতনী গ্রামবাসী প্রাণ প্রাচুর্যে আঁকড়ে রাখছে তাদের লোকাচার ও মূল্যবোধকে। এই দুই দেশের সঙ্গে অতীত নিয়ে বেঁচে আছে বিশাল দ্বীপ মাদাগাসি। প্রকৃত-পরিবেশ ও মানব সভ্যতার সন্ধিক্ষণকে জীবন্ত করে তুলেছে এই তথ্যপূর্ণ রচনাটি। দাম—২০ টাকা।

অতলান্তিক আফ্রিকা—দক্ষিণে নীল অতলান্তিক ও উত্তরে সোনালী সাহারার মাঝখানে বন্য শ্যামলতায় ঘেরা ঘানা, সেনেগাল, নিউগিনি প্রভৃতি দেশগুলি যেখানে হাতির দাঁতের কাঠের বা পেতলের কারুকৃতির মতই সেটসী মাছি আর গৃহযুদ্ধের জগৎজোড়া খ্যাতি, যেখানে পশ্চিম আফ্রিকার খ্যাতির বিড়ম্বনায় তার সম্বলিত জনজীবনকে নিয়ে কিভাবে চলছে তারই এক বাস্তব বিবরণ। দাম—২৫ টাকা।

সাহারা—এই ভ্রমণ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে উত্তর আফ্রিকার পাঁচটি দেশ—দেশগুলোর ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশই হল সাহারা মরুভূমি। উপকূল আর মরুভূমি চাষী আর তুয়ারেগ, হল আর বালি। এই নিয়েই 'সাহারা'। এক নতুন ভঙ্গিতে লেখা এই ভ্রমণ কাহিনী অন্য দুটি ভ্রমণ কাহিনীর মতই জনপ্রিয় হবে। দাম—৪০ টাকা

আরবানাইজেশন, মাইগ্রেশন অ্যাণ্ড রুরাল চেঞ্জ—এ স্টাডি অফ ওরেস্ট বেঙ্গল—শহর ও পল্লী অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নের সমস্যার পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই আলোচনাতে ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত ও তার সহযোগীরা একটি মূল্যবান সংযোজন করেছেন। ৫২৩ পাতার এই বইটি বিশেষভাবে বাঁধাই। দাম—৩০০ টাকা।

আমরা বই ছাপি না, বিষয় ছাপি।

এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ☐ কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

'চারণ' প্রথম সংখ্যা প্রসঙ্গে

[এক-একটি পত্রিকা যবে একটিমাত্র মনীষার মূল্যায়নে সমস্ত সংখ্যাটি সমর্পণ করে তখন বাণিজ্যিক দিকে না হোক, সংখ্যাটির সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক মূল্য বেড়ে যায়। অনেক রকম পদ্য, দু-একটি রঙহীন গদ্য এসব দিয়ে পত্রের পৃষ্ঠা ভরাবার চেয়ে নিশ্চয় অধিক কাম্য হতে পারে একজন প্রতিভার পরিচিতি। তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত "চারণ" পত্রের আবির্ভাবেই তার নিদর্শন মেলে : 'বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা হয়তো খুব কম হয়নি। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালজয়ী মনীষীর কৃতিত্ব পরিমাপের মানদণ্ডও বদলে যায়। ...মহৎ ব্যক্তিত্ব বিভিন্নকালে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিতও হয়ে থাকেন। এসব কারণে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও কৃতিত্বের নব মূল্যায়নে'চারণের প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।' সম্পাদকীয় নিবেদন-এর সঙ্গে সংগতি রেখেই এখানে উনিশ শতকের সেই মহত্তম বোধি আর কর্মের বিচিত্র দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে ; 'চরিত্র চেতনায় ও কৃতিত্বে' বা ধর্ম ও দর্শন : অস্বীকারে অঙ্গীকারে বিদ্যাসাগর' তাঁর 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা' ইত্যাকার বিষয়ে সেই পুণ্যনাম পূর্বপুরুষের পথেই অর্থাৎ সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণ নিয়েই আলোচনাকরেছেন সুকুমার সেন আহমদ শরীফ অরবিন্দ পোদ্দার সুরেশচন্দ্র মৈত্র বাসব সরকার প্রমুখ। তৎসহ রয়েছে গ্রন্থাবলী, বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনার তালিকাও। একটি সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক বাঙ্ময়িকের শুভযাত্রায় ঈশ্বর নাম স্মরণের মতোই প্রথম সংখ্যাটি। মাঝে কিছুদিন একটি 'প্রগতিবাদী' পত্রে জনৈক অবশেষ তড় যে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অদ্ভুত আবিষ্কারে মত্ত হয়েছিলেন তার কথাও মনে পড়তে পারে। মনে হতে পারে, আধুনিকতা অর্থে সর্বথা সংশয়িত অশ্রদ্ধা নয়।]]

—আনন্দ বাজার পত্রিকা : 'টুকরো খবর'—৪/৩/৯০

CENTRAL LIBRARY

চারণ

১ম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

চারণ

বর্তমান সংখ্যা

সমকাল : সংস্কৃতির সঙ্কট

চারণ

পরবর্তী সংখ্যা

রামকৃষ্ণ : যুগ ও আন্দোলন

WENDER
200